বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৪

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৯৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
রাধাবল্লভ মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬ ।

উ ৎ স র্গ

শ্রীমতী মায়া বসুকে

সূচীপত্র

এক বিচিত্র নবজন্ম....

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর, সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড বেদান্ত-মঠে ৫৪ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন—অথচ বয়স হয়েছিল ৯১ !! রহস্যময় কাণ্ড বৈকি ! কিন্তু আমি কোনো রহস্যকাহিনী লিখতে বসিনি (জীবন-রহস্যের কথা অবশ্য লিখছি), সুতরাং শুরুতেই গ্রন্থিমোচন করে নেওয়া ভাল।

এখন থেকে ৯৫ বছর পেছিয়ে যাব। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি। নিউইয়র্ক শহরের ৫৪ ওয়েস্ট স্ট্রিটের একটি ড্রইংরুমে পনর-কুড়ি জন নারী-পুরুষ সমবেত হয়েছেন। তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন, একজনের আগমনের জন্য। অপেক্ষমাণদের মধ্যে দুই ফ্যাশানদুরস্ত আমেরিকান মহিলা আছেন, তাঁরা সহোদরা, দিদির বয়স ৪৩, বোনের ৩৭। ঘরটির সব চেয়ার ভর্তি ছিল বলে এঁরা মেঝেতে বসেছেন, একেবারে সামনের সারিতে। এঁরা পার্থিব ব্যাপারে যথেষ্টই জড়িত, তবে অপার্থিব ব্যাপার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যসম্মত কৌতূহল জাগিয়ে রাখেন মনে। বোন ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে একটু বেশি উৎসুক। তিনি ইতিমধ্যে মোহিনীমোহন চ্যাটার্জির অনুবাদ-করা গীতা পড়েছেন, 'লর্ড কৃষ্ণা' সম্বন্ধে আগ্রহ আছে। তদনুযায়ী এসেছেন ভারতীয় লোকটির বক্তৃতা শুনতে। লোকটি এখনো আসছেন না কেন ? নির্ধারিত সময়ের পরে কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেছে। ভারতীয়দের কি সবই ঢিলে-ঢালা ? হয়ত বৃথাই এলুম, কি শুনব ঠিক নেই, লর্ড কৃষ্ণা'র কথা বলবে কি—

ভাবতে-ভাবতে মহিলা মুখ নীচু করেছেন, গাউনের প্রান্তে ময়লা লেগেছে বোধহয়, ঝেড়ে পরিষ্কার করছেন, হঠাৎ শ্ শ্ শ্—

মহিলা মুখ তুলে তাকালেন। তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। কে-এ-এ-?

স্বয়ং কৃষ্ণ !

হাঁ, তিনিই !

তিনি কথা বললেন—তাঁর প্রথম বাক্য সত্য। তিনি আরও বললেন—দ্বিতীয় বাক্য সত্য। আরও বললেন—তৃতীয় বাক্য সত্য। তিনি বলে চললেন। সাত বছর ধরে তাঁর কথা ঐ মহিলা শুনে চললেন। যা শুনলেন সব সত্য।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ, বয়স ৩২ কিন্তু প্রজ্ঞায় চিরন্তন। তাঁকে দর্শনমাত্রে তাঁর থেকে ৫ বছরের বড় জোসেফিন ম্যাকলাউডের নবজন্ম হয়েছিল। তিনি দ্বিজত্ব লাভ করেছিলেন। ঐ ১৮৯৫, ২৯ জানুয়ারি থেকেই মিস ম্যাকলাউড তাঁর বয়স গণনা করতেন অতঃপর।

গতির রথে গোটা পরিবার....

স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে মিস ম্যাকলাউড কী ছিলেন ?

স্বামীজী তাঁকে প্রথম দর্শনে প্যারিসের ফ্যাশান-মাফিক পোশাক পরিহিতা এক আধুনিকা আমেরিকান নারী রূপেই দেখেছিলেন। বাহ্যত তিনি তাই। কিন্তু অন্তর্জীবনে ছিল তীব্র শক্তি-দ্যুতির উদ্ভাস। সে নারী তখনি চরিত্রে অসামান্যা।

মিসেস ফ্রান্সেস লেগেটকে ধন্যবাদ—তাঁর অতীব চমৎকার গ্রন্থ "লেট অ্যাণ্ড সুন"-এর (১৯৪০) জন্য। ঐ গ্রন্থমধ্যে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেকার মিস ম্যাকলাউড, এবং তাঁদের পরিবারের অন্য মানুষদের সুন্দর কথাচিত্র দিয়েছেন। ফ্রান্সেস লেগেট মিস ম্যাকলাউডের বোনঝি। ইনি ফ্রান্সিস এইচ লেগেট ও বেসী (বা বেটী) লেগেটের একমাত্র কন্যা। এঁর বিয়ে হয়েছিল ইংলণ্ডের সুপরিচিত রাজনৈতিক ডেভিড মার্জেসনের সঙ্গে। [ভাই-কাউন্ট মার্জেসন, ১৮৯০-১৯৪০ ; চীফ গভর্নমেণ্ট হুইপ ১৯৩১-১৯৪০, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে উইনস্টন চার্চিলের মন্ত্রীসভায় যুদ্ধমন্ত্রী, ১৯৪০-৪২]। এঁদের ১৯১৬ সালের সেই বিয়ের ছেদ ঘটে ২৫ বছর পরে। ফ্রান্সেস লেগেট আবার তাঁর আমেরিকান জীবনে ফিরে গিয়ে ঐ বইটি লেখেন নিজের পরিবারের মানুষদের সম্বন্ধে, যাঁদের অনেকেই স্বামীজীর কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

জোসেফিন ম্যাকলাউড (১৮৫৮-১৯৪৯), এবং তাঁর দিদি বেসী ম্যাকলাউড (১৮৫২-১৯৩১)—জন ডেভিড ম্যাকলাউড ও মেরী অ্যানী ম্যাকলাউডের কন্যা। ডেভিড ও অ্যানীর অস্থির জীবন ; জীবনের নানা পর্যায়ে নানা স্থানে তাঁরা ঘুরেছেন। এঁদের পাঁচটি সন্তান বিভিন্ন জায়গায় জন্মেছেন, এবং তাঁদের নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে। বেসীর নাম হয়েছিল ইংলণ্ডের রাণীর নামে, এবং জোসেফিনের নাম নেপোলিয়ান-পত্নী সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের নামে।

অত্যন্ত গতিশীল এই ম্যাকলাউড পরিবার—প্রেরণায় ও কর্মে। এঁদের জীবনধর্ম 'ম্যাকলাউড স্পিরিট' নামে চিহ্নিত।

"ওর অর্থ—যে-কোনো অবস্থাতেই উৎফুল্ল থাকা ; যা-কিছু আসে তাকেই বরণ করা ; অবাঞ্ছিত আকস্মিককে অধিকতর স্ফূর্তির, ঠিকভাবে বলতে গেলে, শুভলাভের কারণে রূপান্তরিত করা ; সর্বোপরি, সমাদরের মনোভাবকে রক্ষা করা।"

সেই সঙ্গে ছিল এই পরিবারের মানুষদের বেপরোয়া ঝুঁকি নেবার সাহস। যেমন, মিস ম্যাকলাউডের বড় ভাই টেলরের কথা ধরা যাক। এই 'অত্যন্ত গর্বিত, অত্যন্ত সুদর্শন' ব্যক্তি, মাত্র ১৬ বছর বয়সে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অংশ নিতে গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিছুকাল যুদ্ধবন্দী ছিলেন। জেল থেকে পালিয়ে তিনি আর্জেণ্টিনায় হাজির হন। সেখানে ১৪ বছর বয়সের এক সুন্দরী ধনী বালিকাকে বিয়ে করে ফেলেন। তাতে মেয়েটির ভাইরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, এবং মেয়েটি একদিন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণকালে গর্ভস্থ সন্তানসহ নিহত

হয়। টেলর ভগ্নহৃদয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কিছু দিনের মধ্যে আবার অ্যাডভেঞ্চার ও রৌপ্যখনি উভয়ের সন্ধানে আরিজোনে হাজির হন। সঙ্গে টেনে নিয়ে যান অত্যন্ত প্রিয় ছোটভাই ডোনাল্ডকে। ডোনাল্ডও খুন হন। টেলর দু' বছর ধরে আততায়ীদের সন্ধানে পাগলের মতো ছুটে বেড়ান। তারপর বহু বছর তাঁর কোনো সন্ধান ছিল না। শেষ খবর পাওয়া গেল—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে—টেলর ক্যালিফোর্নিয়ায় এক মিসেস ব্লজেটের বাড়িতে মৃত্যুশয্যায়।

মিস ম্যাকলাউড ছুটে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন—"অলৌকিক কাণ্ড! মুমূর্ষুর শিয়রে একটি বিরাট পোস্টার—বিবেকানন্দের !!" গৃহকর্ত্রী মিসেস ব্লজেটকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমার ভাইয়ের মাথার দিকে ও কার ছবি? বৃদ্ধা পরম মর্যাদার সঙ্গে বললেন, "এই পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, সে উনি!"

"আপনি ওঁর বিষয়ে কিছু জানেন?"

মিসেস ব্লজেট জানালেন, "১৮৯৩ সালে আমি চিকাগো ধর্ম মহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। যখন ওই তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমেরিকার ভাই ও বোনেরা', তৎক্ষণাৎ সাত হাজার লোক খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে অভিনন্দন জানাল, এমন একটা কিছুকে, যা তাদের কাছে অজ্ঞাতপূর্ব। বক্তৃতা শেষ হলে দেখলাম, দলে দলে মেয়ে বেঞ্চি টপকে ছুটছে তার কাছে যাবার জন্য। তখন আমি মনে মনে বলেছিলাম, বাছা, যদি তুমি এই আক্রমণ সামলাতে পারো তাহলে বলব, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।"

টেলর মারা গেলেন। মিস ম্যাকলাউড লিখলেন, "আমার ভাইয়ের শান্তিতে মৃত্যু হয়েছে। কোনো নড়াচড়া নয়—এক সময়ে কেবল হৃৎস্পন্দন থেমে গেল।"

বেটী ও জোসেফিন স্বভাবে ও জীবনযাত্রায় পৃথক হলেও ম্যাকলাউড-স্পিরিটকে নিজস্ব-ভাবে প্রকাশ করেছেন। "দু'জনের মধ্যেই ছিল একই প্রকার চরিত্রগত অস্থিরতা। সেই সঙ্গে পিতার কাছ থেকে পাওয়া অসাধারণের জন্য প্রবল আগ্রহ। এঁদের পিতার গর্বিত মনের কাছে কোনো কিছুই যথেষ্ট ভালো নয়। তাঁর সন্তানদের মধ্যেও তিনি একই মানসিকতা চাইতেন।"

বেটী দু'বার বিয়ে করেছেন, এবং দু'টিই চমকপ্রদ। ১৮৭৬ সালে তাঁর প্রথম বিয়ে, ২৪ বছর বয়সে—তাঁর থেকে ৩০ বছর বয়োজ্যেষ্ঠ বিপত্নীক ব্যবসায়ী উইলিয়ম স্টার্জেসের সঙ্গে। এই বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর পিতার সানন্দ সমর্থন ছিল না বলে তাঁকে বিবাহপূর্বে প্যারিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তিনি বৃহৎ পৃথিবীকে দেখে নিয়ে ভাবতে পারেন—ঐ প্রৌঢ়ের সঙ্গে বিবাহ বাঞ্ছিত কি না! বেটী প্যারিস দেখলেন। অপূর্ব। পৃথিবী কি বৃহৎ! সেই বৃহৎ পৃথিবীর কাছে বেটী হৃদয় হারালেন। এবং তিনি উইলিয়ম স্টার্জেসকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে আরও অনড় হলেন, কারণ স্টার্জেসই ঐ

পৃথিবীতে বেটীর প্রবেশাধিকার দিতে পারবেন। প্যারিসে গিয়েই বেটী জানতে পেরেছিলেন, সৌন্দর্যে, সুখে, লীলায়িত স্বাচ্ছন্দ্যে পৃথিবী কোন্ অপরিমেয় রূপ ধারণ করতে পারে। ঐ পৃথিবীর স্বপ্ন বেটী বাল্যাবধি দেখেছেন। না, বেটীর পক্ষে আর আমেরিকায় তাঁর প্রেসবিটেরিয়ন পিতার অর্ধালোকিত কক্ষে দিন কাটানো সম্ভব নয়।

নারী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে, বেটী অবশ্য সেভাবে স্টার্জেসকে ভালবাসতে পারেন নি। তিনি আসলে ভালবেসেছিলেন জীবনকে—স্টার্জেস সেই জীবনের পথে তাঁর সহযাত্রী। স্টার্জেসের মধ্যে ছিল প্রবল প্রাণাবেগ এবং কল্পনাশক্তি। আর ছিল জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস।

স্টার্জেস তখন ব্যাঙ্কের ব্যবসা করেন। সৎ ব্যবসায়ী বলে খ্যাতির জন্য সে ব্যবসায়ে তিনি সফল। কিন্তু দুর্বিপাক ঘটেই—ব্যাংক ফেল করল। সমস্ত অঞ্চলের আর্থিক সর্বনাশ হয়ে গেল যেন। চতুর্দিকে বিক্ষোভ, সেইসঙ্গে কুটিল সন্দেহ। স্টার্জেসকে পরামর্শ দেওয়া হলো ঘরের বাইরে না যেতে, যাকে-তাকে দরজা না খুলতে।

এমনই এক রাত্রে, স্টার্জেসের দ্বারে করাঘাত। সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও স্টার্জেস দরজা খুললেন—দেখেন, ৬ ফুট লম্বা, তদনুপাতে চওড়া, দৈত্যাকার এক যুবক। সে বোঝাপড়া করতে এসেছে। স্টার্জেস তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন।

ভিতরে টেবিলের দুপাশে তাঁরা মুখোমুখি বসলেন। যুবক টেবিলে হাত রেখে, দু'হাতের পাশে রাখল দুটি বৃহৎ রিভলভার।

গর্জে উঠে সে বলল—এখনি আমার জমা দেওয়া ১৬০০ ডলার ফেরত চাই।

আরও চেঁচিয়ে উঠল—ঐ আমার যথাসর্বস্ব। গায়ের রক্ত জল করে ও-টাকা জমিয়েছি। তাছাড়া তোমার ব্যাংক ফেলের ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

স্টার্জেস বললেন—ঠিক। তুমি খোলা কথা বলেছ। টাকা ফেরত চাওয়ার জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না। ফেরত দিতে পারলে খুশি হতাম—কিন্তু—

যুবক চকিতে দুই হাতে দুই রিভলবার তুলে স্টার্জেসের কপালে তাক করেছে।—তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। আমার কানাকড়িও নেই। তার প্রতিফল নাও—

রিভলবারের চাবি খোলার ক্লিক্ শব্দ—যুবকের চোখে হিংস্র আগুনের শিখা—ট্রিগারে আঙুল—

অবিচলিত শান্ত কণ্ঠে স্টার্জেস বললেন—আমি যাকে খুঁজছিলাম সে তুমিই। রাতের পর রাত যন্ত্রণায় কেটেছে—আত্মহত্যা করতে গিয়েছি, সাহস পাইনি। এখন সে কাজটা তুমি সেরে দাও।

যুবকটি টেবিলে রিভলবার নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল। স্টার্জেস

তাকে ব্যবসার সঙ্গী করে নিলেন।

স্টার্জেস জোসেফিনকেও আশ্রয় দিলেন। বেটী এবং জো (জোসেফিন) পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলেন পৃথিবীর পথে-পথে। তাঁরা জানতেন না—তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য কী। শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও। লাঞ্চের সময়ে বেটীকে তাঁর স্বামীর প্রশ্ন—"আগামীকাল কি জো এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়তে পারবে—এই বাড়ি ভাড়া দিয়ে?" "নিশ্চয়, নয় কেন?" পরদিনই তাঁরা ভেসে পড়লেন—৬ সপ্তাহের জন্য। ৬ সপ্তাহ ৬ বছরে দাঁড়াল—রইলেন ইংলন্ডে, কন্টিনেন্টে।

স্টার্জেস, বেটীর মধ্যে প্রেমিকা নারীকে না পেলেও অনুগতা পত্নীকে পেয়েছিলেন। অ্যালবার্টা ও হলিস্টার এঁদের সন্তান। স্বামীর প্রতি বেটীর কৃতজ্ঞ আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় স্টার্জেসের জীবনের শেষ অংশে, যখন অকস্মাৎ তাঁর ব্যবসায়ে আবার বিপর্যয় ঘটে, যার পরিণতি হৃদয়ভঙ্গ ও মৃত্যুতে। সেইসময়ে বেটী স্বামীকে শক্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এবং মর্যাদার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন ভয়ঙ্কর কালো নিয়তির বিরুদ্ধে।

বন্ধনহীনা সে....

এইসব কালে জো-র চেহারাটা কী?

স্টার্জেসদের সঙ্গে জো ১৮৮২ সালে প্যারিসে গেছেন।

১৮৮২ সালের প্যারিস। কী ছবি! মোপাসাঁ, জোলা। অপেরা। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত। বুদ্ধির ছটা। বিলাসের উচ্ছ্বাস। পৃথিবীর রাজধানী অনন্য প্যারিস।

এই প্যারিসে জো ফরাসী পড়লেন, কিছুটা আর্ট শিখলেন। ইতিহাসের পাঠ নিলেন। কিন্তু বইয়ের স্তূপের মধ্যে মাথামুণ্ডু গুঁজে পড়ে থাকতে পারলেন না। জো চান জীবন-তরঙ্গ।

জো এখন শিখায়িত সৌন্দর্যে জ্বলন্ত এক তরুণী। "জো তার স্বাভাবিক মাধুর্য নিয়ে ঝলমল করছে [এক জাহাজ-ভ্রমণকালে বেটী লিখেছেন]—ইতিমধ্যেই সে অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয়াদি সেরে ফেলেছে। এখানে গল্প করছে, ওখানে মাথা ঝোঁকাচ্ছে, সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে আলোর ঝলক। আর হতভাগ্য আমি [বেটীর ছদ্ম দুঃখ]—জানিনা কি করে চেনাশোনা করতে হয়—কি করে অপরের মনোযোগকে মূল্য দিতে হয়!"

স্বতঃই মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের দল ধেয়ে এসে জো-কে ঘিরে ফেলল—এবং পেল লীলায়িত প্রত্যাখ্যান।

ঐ যে বেলজিয়ান ছোকরা, গুয়াতেমালায় বাস করবে স্থির করেছে, ওর দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু অত্যন্ত হিসেবী, জো-র পক্ষে ওকে সহ্য করা সম্ভব নয়।

দূর গাঁ থেকে এসেছে ওই ফরাসি জমিদার যুবকটি। রামোঃ, কি বিকট সংকীর্ণ মনোভাব ওর! ও বস্তু চলবে না।

কি, কার কথা বলছ? ওই সুদর্শন ইংরেজ ভদ্রলোকটি? হাঁ, চেহারা খুবই রোমাণ্টিক, ভাবখানাও তাই, গাড়িতে যাবার সময়ে চমৎকার ভঙ্গিতে 'প্রস্তাব' করেছিল—কিন্তু উঁহু, ভবিষ্যৎ বিলকুল ফাঁকা—।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু জো এনগেজড হয়ে পড়লেন। লোকটি সরকারী কর্মচারী, চলন-বলন ভালো। পছন্দের যোগ্য মানুষ।

"হরি, হরি। বিয়ে না হতেই এই! এত ঈর্ষা! উনি চান না—জো আর কারো সঙ্গে কথা বলুক—কারো দিকে হেসে তাকাক! এত অধিকার-প্রবণতা! এতটুকু বিশ্বাস নেই?"

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জো এনগেজমেণ্ট ভেঙে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।—"বাবাঃ বাঁচলাম। একটু হলেই ফাঁদে পড়েছিলাম আর কি!"

"বাঁচলাম, বাঁচলাম!" জো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন।—"ঈশ্বর করেছেন, ধরা পড়িনি।—না না না, তোমরা জোসিকে কেউ বাঁধতে পারবে না।"

কিন্তু যদি হয় অনন্তের বন্ধন....

শেষ পর্যন্ত জো ধরা পড়লেন—সেই তাঁর নিয়তি। বাইরের চলচঞ্চল রূপের গভীরে ছিল আর এক জোসেফিন, অনন্তকে যার নিত্য আক্রমণ। সেই 'অনন্ত' মানবাকার ধারণ করে জো-র সামনে উপস্থিত—নাম বিবেকানন্দ। জো তাঁর পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করলেন।

ওধারে বাঁক নিয়েছে বেটীর জীবনস্রোত। স্টার্জেস পরলোকগত। বিধবা বেটীকে হৃদয় নিবেদন করেছেন ফ্রান্সিস (ফ্রাঙ্ক) লেগেট (১৮৪০-১৯০৯)। নিউইয়র্কের এই ধনী শস্য-ব্যবসায়ী তখন দীর্ঘদিন বিপত্নীক। একদা প্রথম যৌবনে তিনি এক সুন্দরী নারীকে বিয়ে করেছিলেন; দু' বছর সাত মাস পরে তাঁদের পুত্র জন্মেছিল; ফ্রাঙ্কের মনে হয়েছিল, এই সন্তানের পুণ্যে পৃথিবী উদ্ভাসিত হবে ঈশ্বরালোকে; সন্তান জন্মের দু' সপ্তাহ পরে অকস্মাৎ কালো ছায়া গ্রাস করেছিল তাঁর ভুবনকে; তরুণী পত্নীর মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছিল কবরখানায়; আরও পাঁচ বছর সাত মাস পরে পুত্রটিও একই পথে যাত্রা করেছিল; বড় সুন্দর দেখতে ছিল সে, প্রাণকাড়া তার কথাবার্তা, আচরণ; সে যখন চলে গেল, ফ্রাঙ্ক ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "আমার অ্যালবার্ট নেই, আমার আলো নেই—স্বর্গে ফিরে গেছে।" ফ্রাঙ্কের বয়স তখন মাত্র ২৮।

পঁচিশ বছর বিপত্নীকের জীবন কাটাবার পরে ফ্রাঙ্ক লেগেট আবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর বন্ধু উইলিয়ম স্টার্জেসের জীবনের শেষ বিপর্যয়ের কালে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামরত মহিমময়ী নারী মিসেস স্টার্জেসকে দেখে

তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিণত বয়সের অপরিসীম সৌন্দর্য সে নারীকে অবলম্বন করে বিকশিত। উজ্জ্বল স্বর্ণ-পিঙ্গল কেশ, দীর্ঘ কৃশ মুখ, কোমল চোখে রহস্যের ছায়া—ক্রমসঞ্চিত দুর্ভাগ্যের ধূসরতার মধ্যে রাজ্ঞীর মহিমায় তিনি বিরাজমান। অপরপক্ষে পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ ফ্রাঙ্কও সুদর্শন, মর্যাদাগম্ভীর। তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। মুখর নন, কিন্তু তাঁর নীরব অস্তিত্বের প্রভাব অনতিক্রম্য।

ফ্রাঙ্ক বেটীকে ভালবেসেছিলেন। বেটীও ক্রমে ফ্রাঙ্ককে ভালবাসলেন। ফ্রাঙ্ক যখন 'প্রস্তাব' করলেন, বেটীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। পছন্দের মানুষ প্রস্তাব করেছে, সেই আনন্দ। সেইসঙ্গে জীবনের নিরাপত্তা ও আকাঙ্ক্ষিত বিস্তারের প্রতিশ্রুতি। বেটী ফ্রাঙ্কের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। দুজনেই এখন গভীর সুখে সুখী। কিন্তু দুজনের সুখের আকার ভিন্ন। ফ্রাঙ্কের ক্ষেত্রে এই বিবাহ 'সূচনা' নয়—পূর্ণতার পরিতৃপ্তি, জীবনের যাত্রা-শেষের শান্তিসদন। আর বেটীর ক্ষেত্রে এই বিবাহ যে-গৌরবময় জীবনকে তিনি জেনেছেন, তারই অধিকতর প্রসারের মুক্ত দুয়ার।

বেটী ও মিঃ লেগেটের প্রণয়পর্ব-কালেই তাঁদের জীবনে স্বামীজীর আবির্ভাব। স্বামীজীর দ্বারা মিঃ লেগেট এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, প্যারিসে তাঁদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। "প্যারিসে সেই বিবাহের দুই সাক্ষী—জনৈক প্রাচ্য ঋষি এবং বধূর ভগিনী।" তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। এই তারিখ, লেগেট-পরিবারের দুটি চরম দিনের একটি—অন্যটি ২৯ জানুয়ারী ১৮৯৫—যেদিন বেটী ও জো স্বামীজীকে প্রথম দেখেন।

যে-প্রেমকে মিঃ লেগেট ও মিসেস লেগেট দেহে-মনে অনুভব করার জন্য এখন ব্যাকুল সেই প্রেম অন্য এক আলোকিত সত্তার আধারে কোন্ রূপ ধরে বিরাজমান ছিল, তার আভাস স্বামীজীর ৬ জুলাই, ১৮৯৬ তারিখের একটি পত্রে পাই। স্বামীজী মিঃ লেগেটকে লিখেছিলেন,

> "কোনো-কোনো দিন আমি যেন এক ভাবের আবেশে থাকি, তখন মনে হয়, এই পৃথিবীতে যে-কেউ আছে, যা-কিছু আছে, সবকিছুকেই আমি আশীর্বাদ করব, ভালবাসব, আলিঙ্গন করব। সত্যই দেখতে পাই—যাকে বলি পাপ সে ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।…যেদিন জন্মেছি, ধন্য সেই দিন, আশীর্বাদ করি তাকে। তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আমি আর কি! কোন্ কালেই বা তাছাড়া অন্য কিছু ছিলাম? প্রিয় তিনি, লীলাময়, আমি তাঁর প্রেমের খেলার সখা। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, সবই তাঁর খেয়াল আর খেলা।… জো [মিস ম্যাকলাউড] যেমন বলে, ভারি মজা, ভারি মজা! ··নাচের ঘূর্ণিলাগা একপাল স্কুলের ছেলেকে যেন খেলতে মাঠে ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে—জগতের এই খেলার মাঠে। যুক্তি-বিচার, বিদ্যাবুদ্ধি—এই সবকে অতিক্রম করে রয়েছে—প্রেম। আঃ সাকী, পূর্ণ করো পেয়ালা, যেন মাতোয়ারা হয়ে যাই।"

"জীবন-গ্রন্থের পাতা ওল্টাতে শুরু করলেই মজার শুরু হয়ে যায়," স্বামীজী বলেছিলেন।

খুলে গেল ভারতের দ্বার....

বিবেকানন্দকে জানার পরে জোসেফিনের পক্ষে সংসারকে নির্বাসন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দিদির মতো তিনি সাংসারিক সাফল্যের মূল্য স্বীকার করলেও আসলে কৌতূহলী ছিলেন মূলগত বস্তুতে। যা-কিছু হচ্ছে পৃথিবীতে —গৃহকর্ম, রান্নাবাড়া, বাগান করা, বাচ্ছা হওয়া—কী কাণ্ড! দেখে শুনে জো চমৎকৃত। তা' বলে জো কি ঐ সকল কিছুতে লিপ্ত হতে আগ্রহী? আরে না না। "তোমরা বাপু জো-কে বুঝতেই পারোনি। এই জগৎ বা অন্য জগৎ জো মোটেই চালাচ্ছে না।" কিন্তু জো'র এবার মনে হলো—এই পৃথিবীতে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যিনি যবনিকার অন্তরালের সংবাদ বোধহয় জানেন। তিনি ভারতে ফিরে গেছেন। জো তাঁকে চিঠি লিখলেন, আমি কি ভারতে যেতে পারি? স্বামীজী ১০ জুলাই, ১৮৯৭, তার উত্তর দিলেন,

> "আসতে চাও? অবশ্যই এসো। কেবল মনে রাখবে—ইউরোপীয়গণ ও হিন্দুগণের (যাদের ইউরোপীয়রা 'নেটিভ' বলে থাকে) পারস্পরিক সম্পর্ক তেল-জলের মতো। ইউরোপীয়দের পক্ষে নেটিভদের সঙ্গে মেলা-মেশা গর্হিত ব্যাপার। এমন-কি (প্রাদেশিক) রাজধানীগুলোতেও ভালো বলা চলে এমন হোটেল নেই। · কৌপীন-পরা লোকদের দেখে-দেখে চোখ সইয়ে নিতে হবে। আমাকেও ঐ রকম পোশাকে তুমি দেখতে পাবে। সর্বত্র নোংরা আবর্জনা, আর কালা আদমী।·· হয়ত আমি তোমাদের সঙ্গে একত্রে খেতেও পারব না।"

[এটা বাড়তি সতর্কবাণী। স্বামীজী ওঁদের সঙ্গে খেতেনই। এবং তিনি গভীর উল্লাস বোধ করেন যখন শোনেন যে, ব্রাহ্মণ-ঘরের বিধবা নারী শ্রীমা সারদাদেবী মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুল, মার্গারেট নোবেল প্রমুখ তাঁর ম্লেচ্ছ কন্যাদের সঙ্গে একপাত্র থেকে খেয়েছেন। তখনকার দিনে অধিকাংশ হিন্দু সংস্কারক পর্যন্ত ও-কাজ করবার কথা ভাবতে পারতেন না।]

বিবেকানন্দ কিছু আশার বাণীও শুনিয়েছিলেন,

"কিন্তু তুমি দার্শনিক আলোচনা করার মতো অজস্র লোক পাবে।··· আর আমি আশ্বাস দিচ্ছি—তোমাদের সঙ্গে অনেক জায়গায় আমি ভ্রমণ করব, এবং তোমাদের ভ্রমণকে আনন্দময় করার জন্য সবকিছু করব।"

সব শুনেও মিস ম্যাকলাউড ভারতে এসেছিলেন। ইউরোপীয়দের পক্ষে অসহ্য ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসে গ্রহণ করেছিলেন। তারই মধ্যে হয়ত চকিতে, নিজের অজান্তে, ভুল করেছেন, আর তখনি নেমেছে আঘাত। ম্যাকলাউড একবার ভারতে একটি দৃশ্য দেখে হেসে উঠেছিলেন, মুহূর্তে বিবেকানন্দের জ্বলন্ত রোষ সে হাসিকে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিল।

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে দেখে মিস ম্যাকলাউড হেসে ফেলেছিলেন।

"কি কাণ্ড! ভদ্রলোক শিক্ষিত পণ্ডিত, কপালজোড়া ওসব বিদঘুটে আঁকাজোকা কেন?"

আলাসিঙ্গার কপালে ছিল মস্ত রামানুজী তিলক—দেখতে উদ্ভট—সত্যই হাস্যকর।

ম্যাকলাউডের ব্যঙ্গহাসির উপরে বজ্রস্বরে স্বামীজী ফেটে পড়লেন—"থামো।—তুমি নিজে এ-পর্যন্ত কী করেছ?" বিমূঢ় ম্যাকলাউড বুঝতে পারলেন না তাঁর দোষ কোথায়? বুঝতে পারলেন না বিবেকানন্দের রসবোধ হঠাৎ হারিয়ে গেল কেন? তাঁর চোখ ফেটে জল এল।

পরে জানলেন—অপরাধটা কোথায়?

"তরুণ ব্রাহ্মণ আলাসিঙ্গা পেরুমল, মাদ্রাজের একটি কলেজের অধ্যাপক, মাসে রোজগার একশো টাকা, তার দ্বারা প্রতিপালন করেন পিতা-মাতা, পত্নী ও চার পুত্রকন্যা—তিনিই বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্ত্যে পাঠাবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন।" মিস ম্যাকলাউডের অপমানের অনুভূতি ঢেকে গিয়েছিল বিপুল কৃতজ্ঞতায়। "আলাসিঙ্গার প্রয়াস ভিন্ন হয়ত আমরা কোনোদিন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেতাম না।"

মিস ম্যাকলাউড ভারতে এসে সঙ্গিনী হিসাবে পেলেন মিসেস ওলি বুল, মিস মার্গারেট নোবলকে। বেলুড়ের গঙ্গাতীরে ভাঙা একটি বাড়িকে তাঁরা 'ভালবাসার কুটীরে' রূপান্তরিত ক'রে বাস করতে লাগলেন। তারপরে ১৮৯৮ সালে উত্তর ভারতের নানা স্থানে এবং হিমালয়ের নৈনিতালে, আলমোড়ায়, কাশ্মীরে, স্বামীজী ও তাঁর দলবলের সঙ্গে তাঁরা ভ্রমণ করলেন। স্বামীজী তাঁদের সামনে ক্ষণে-ক্ষণে খুলে ধরলেন ভারতবর্ষকে—জাগ্রত করলেন তার অতীতকে, দীপ্ত করলেন বর্তমানকে, উন্মোচন করলেন ভবিষ্যৎকে। স্বামীজীর মধ্যে তাঁরা দর্শন করেছিলেন মানবদেহে পরমের আবির্ভাবকে। এই ভ্রমণ—পরবর্তীকালে এঁদের কাছে সুমহিম স্মৃতির মহাগ্রন্থ—যার পৃষ্ঠা উল্টে-উল্টে

এঁদের অবশিষ্ট জীবন কেটেছে। এই সময়কার অনেক কথা ও ছবি ফুটে আছে নিবেদিতার চিঠিতে, ডায়েরিতে। তারই সারাৎসার নিবেদিতার এই কয়েক লাইনে,

অপরূপ দিনগুলি এই বৎসরের···আদর্শ মূর্ত অঙ্কে তার···
বেলুড়ের নদীতটের কুটীরে,
নৈনিতালে, আলমোড়ায় ও কাশ্মীরে—হিমালয়ে,
অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠস্বর,
যা বাহিত, ধ্বনিত হবে জীবন থেকে জীবনান্তরে।
লীলা—শুধু লীলা—

প্রেমকে দেখেছি আমরা—
সে এমন প্রেম যা দীনতম অজ্ঞানতমের সমস্তরে নামে।
প্রেমকে দেখেছি আমরা—
যার চোখে এই পৃথিবী মধুময় শুধু মধুময়।

দেখেছি তাঁকে ভিক্ষুকের সাজে,
বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, স্বদেশীর পূজার্হ মূর্তিতে।
সে জীবনের যোগ্য প্রচ্ছদ—
ঘর্মাক্ত শ্রমের রুটি, কুটীরের আশ্রয়,
শস্যক্ষেত্রের বুক চিরে চলে-যাওয়া
আঁকাবাঁকা মেঠো পথখানি।

তাঁকে ভালবাসত শুধু পণ্ডিতেরা, শুধু রাজনীতিক?
না—যারা অজ্ঞানতম—তারাও।
মাঝি প্রতীক্ষা করত জলের দিকে তাকিয়ে
কখন তিনি ফিরে আসেন,
কোলাহল ক'রে কাড়াকাড়ি করত ভৃত্যরা
কে সেবা করবে তাঁর?
সবার মাঝে তিনি—সবের মাঝে তিনি,
তবু খেলার আবরণটি খসেনি কখনো।
'তারা খেলছে প্রভুর সঙ্গে'—জানত চেতনায়।

আলোকিত স্বর্গোদ্যানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম....

মিস ম্যাকলাউড চেয়েছিলেন—বিবেকানন্দকে আর একবার আমেরিকায় নিয়ে

যাবেন, স্থাপন করবেন যোগ্য পরিবেশে—দেখবেন, শুধু দেখবেন—আলোকের বর্ণালী। সে কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজী লেগেট-পরিবারের গ্রামভবন রিজলি ম্যানরে উপস্থিত হয়ে কয়েক সপ্তাহ কাটান।

সেই সময়ে রিজলি ম্যানরে অনেকেই এসেছিলেন। লেগেট-পরিবারের লোকজন—মিঃ ও মিসেস লেগেট, মিস ম্যাকলাউড, অ্যালবার্টা, হলিস্টার, ফ্রান্সেস। তা ছাড়াও সেখানে কম-বেশি সময় উপস্থিত ছিলেন—মিসেস ওলি বুল, সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, অধ্যাপক ডাঃ মার্চেন্ড, শিল্পী মড স্টাম, এবং অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের উপস্থিতি এমন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে, অধ্যাপক মার্চেন্ড বলেছিলেন, "এ হলো ঈশ্বর-নিকেতন।" "জো-র ধারণা, প্রফেটের উপস্থিতির জন্য ও-জিনিস ঘটেছিল [ফ্রান্সেস লেগেট লিখেছেন] কিংবা—তা ঘটেছিল ক্যাটস্কিল পর্বত থেকে ছড়িয়ে-পড়া কোনো মোহমায়ার জন্য। যে-জন্যই হোক, রিজলি ম্যানরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অসহিষ্ণুতা বা ছন্দ-হীনতার কোনো চিহ্নই ঐকালে দেখা যায়নি।"

রিজলি ম্যানরের সেই ঘনীভূত পরিবেশ, যেখানে কেবল আত্মার রাজ্য, সেখানে স্বতঃই নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুলকে কেন্দ্র করে অনেককিছু গভীর অধ্যাত্মব্যাপার ঘটেছে, সেইসব অসামান্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করব না, কেবল এখানে স্বামীজী নিবেদিতাকে যে আশীর্বাদী-কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন, তারই কয়েক লাইন স্মরণ করব নিবেদিতার গভীর জীবনসত্যের উন্মোচক হিসাবে।

কবিতার নাম—'শান্তি'।

সেই যথার্থ শান্তি কী?

> "দুই জীবনের মধ্যে—সে মহামরণ,
> দুই ঝঞ্ঝার মধ্যে—সে মহাশান্তি।
> মহাশূন্য সে—সৃষ্টির উৎস,
> সেখানে সৃষ্টির—প্রত্যাবর্তন।"

আমরা এখানে রিজলিতে লেগেট-পরিবারের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেব। রিজলি মিঃ লেগেটের বহু স্বপ্ন ও সাধের সৃষ্টি—তাই তিনি বোধহয় সেখানে বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে এতগুলি মানুষের সমাবেশ দেখে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন। আর মিসেস লেগেট? রিজলি থেকে চলে আসার পরে নিবেদিতা তাঁকে লিখেছিলেন,

"আনন্দের স্বপ্নের মতো সপ্তাহগুলি ওখানে কেটেছে।...আপনাদের সুন্দর ভবনে আপনি রাণীর মতো বিরাজমান, তা যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি।"

মিসেস লেগেটের প্রথম পক্ষের পুত্রসন্তান হলিস্টার, তখন কুড়ি বছরের সদ্য-যুবক, অত্যন্ত প্রাণবন্ত, পিতার মতোই উত্তাপ বিকিরণ ক'রে সকলকে আকর্ষণ করতে সমর্থ, ইতিমধ্যেই অনর্গল ফরাসি বলতে পারে, কিছুটা জার্মানিও, পিয়ানোয় স্বচ্ছন্দ ঝংকার তুলতে পটু, স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয়। তার সঙ্গে স্বামীজীর মোলাকাতের কথাচিত্র এই :

"অল্পবয়সীরা কেবলই ভিতর-বাহির করছে, কখনো স্বামীজীর মুখ থেকে ঝরে-পড়া দিব্যসত্য মস্ত এক ঢোক পান করেই—এই দৃশ্যপটের পিছনে হলিস্টার যে-স্ফূর্তি, মজা ও খেলার আয়োজন ক'রে রেখেছে তার টানে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারি মধ্যে হল্ একবার রুখে বলল, 'না স্বামীজী, না, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই না ; আমি বিয়ে করব, আমার ছেলে-পুলে হবে।' স্বামীজী দিলেন, 'ঠিক আছে বৎস। তবে খেয়াল রেখো, তুমি কঠিনতর পথকেই বেছে নিলে'।"

স্বামীজীর সঙ্গে হলিস্টারের মজার সম্পর্ক আগেই শুরু হয়েছিল। স্বামী বিজয়ানন্দ মিস ম্যাকলাউডের মুখে একটি উপভোগ্য ঘটনার কথা শুনেছেন।

স্বামীজী মিঃ লেগেটের বনভবন রিজলিতে সেই প্রথমবার গেছেন—১৮৯৫ সালে। হলিস্টার তখন কিশোর বালক। লেগেটের এই ভবনের চত্বরে একটি মাঝারি-মাপের নয়-গর্তের গলফ্ কোর্স আছে। সেখানে বেড়াবার সময়ে স্বামীজী হলিস্টারকে ডেকে নেন। সুযোগ বুঝে হলিস্টার স্বামীজীকে গলফ খেলা সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি জ্ঞানদান করল—ওই যে পতাকা আছে, তার কাছে আছে গর্ত, এই গলফের লাঠি দিয়ে বল মেরে তাতে ফেলতে হয়, বল গর্তে পড়লে পয়েণ্ট লাভ। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, সাত-আটবার মারের কমে বল গর্তে পড়ে না। স্বামীজী বললেন, তিনি এক মারেই বল গর্তে ফেলতে পারেন। অবিশ্বাস্য কথা। হলিস্টার উপেক্ষায় ফুঃ করে স্বামীজীর কথা উড়িয়ে দিল। ফলে দুজনে বাজি হয়ে গেল। হল্ পকেট থেকে তার সম্পদ বার করল, আধ ডলার—তার বাজি। স্বামীজী বার করলেন এক ডলার—তাঁর বাজি।

এই সময় মিঃ লেগেট হাজির হলেন। সব শুনে তিনিও বললেন, স্বামীজী আপনি পারবেন না। ভালো ভালো খেলোয়াড়রাও তিন-চার বারের কমে গর্তে ফেলতে পারে না। তা সত্ত্বেও স্বামীজী যখন নিজ দাবিতে অনড় রইলেন তখন মিঃ লেগেট দশ ডলার বাজি ধরলেন।

স্বামীজী গলফ্-ক্লাব হাতে নিয়ে হলিস্টারকে বললেন, তুমি গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে গর্তটা দেখিয়ে দিয়ে সরে যাও। আমার বল শূন্যপথে ছুটবে। স্বামীজী কোটের হাতা গুটিয়ে গলফ্-ক্লাব নিয়ে তৈরি, হল্ গর্ত দেখিয়ে দিয়ে সরে গেল, স্বামীজী ক্লাবটি দুলিয়ে বলে আঘাত করলেন, বল শূন্যপথে ছুটে গিয়ে ঠিক গর্তটিতে পড়ল। কাণ্ড দেখে হলিস্টার হায় হায় করে উঠল—তার আধ ডলারের সম্পত্তি নাশ। হতভম্ব মিঃ লেগেট বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ভারতীয় যোগীর অলৌকিক কাণ্ড। স্বামীজী তাঁকে হেসে বললেন,

আরে না না, যৌগিক শক্তিকে এত তুচ্ছ ব্যাপারে খরচ করি না। আমি কি করেছিলাম বলছি। মনে মনে দূরত্বটা মেপে নিয়েছিলাম। আমার পেশির শক্তি কতখানি তা আমার জানা আছে। আমি মনকে বললাম, ওই সাড়ে দশ ডলার আমার চাই। আমার ইচ্ছা তখন আমার পেশীতে চলে এল। হাত চালালাম। যা চাইছিলাম পেয়ে গেলাম।

স্বামীজীর শোয়ার ঘরের দরজা ভেজানো। দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময়ে হলিস্টারের কানে গেল, স্বামীজী হেসে লুটোপুটি। তারপর স্বামীজী ঘর থেকে বেরোলে হলিস্টার জিজ্ঞাসা করল, "কার সঙ্গে আপনি অত কথা বলছিলেন?" স্বামীজী বললেন, "কারো সঙ্গে তো নয়। আমি একলা ধ্যান করছিলাম।" "একলা ধ্যান? উঁহু, না না। অত হাসি কিসের?"—হলিস্টার নাছোড়বান্দা। তখন স্বামীজী ভাবতে লাগলেন। কেন হাসি তা মনে পড়ে গেল।—"উঃ, কি বলব? ভগবান এত মজাদার না!"

ধর্ম-টর্ম নিয়ে হলিস্টার কখনো মাথা ঘামাননি। অনেক বছর পরে তাঁর পুত্র যখন কোনো একটা ধর্মীয় বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তার উত্তরে তিনি বলেন, "ওসব ব্যাপার আমার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে নেই। তবে আমি জানি ঈশ্বর আছেন, কারণ তা স্বামীজী আমাকে বলেছেন।"

হলিস্টার ভারতবর্ষে সস্ত্রীক এসেছিলেন—স্বামীজীর দেহত্যাগের বেশ কয়েক বৎসর পরে। সিস্টার ক্রিস্টিন হলিস্টারের স্ত্রীর বিষয়ে চিঠিতে লিখেছেন, "আহা জেনী কী রূপসী! আমি চোখ ফেরাতে পারি না।" ক্রিস্টিন তাঁদের নিয়ে বেলুড়মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। এই তীর্থগুলি দেখতেই তাঁদের ভারতে আসা। "হলিস্টারের কী সুগভীর সুন্দর ভক্তি," ক্রিস্টিন লিখেছেন, "স্বামীজীর প্রতি কী ভালবাসা! স্বামীজীর ঘরে ঢুকে তাঁর জিনিসপত্রগুলিকে দেখে তার ব্যাকুলতায় আমি অভিভূত।"

হলিস্টারের থেকে দু বছরের বড় তার দিদি অ্যালবার্টা তাঁর জীবনের পরম শিক্ষা স্বামীজীর কাছ থেকে এই রিজলি ম্যানরেই নিয়েছিলেন বলে সিস্টার নিবেদিতা মনে করেছেন। এই কালে অ্যালবার্টা একুশ-বাইশ বছরের তরুণী। "তাঁর মাথায় সোনালী কেশের রাশি···শুভ্র-সুন্দর সতেজ মুখশ্রী, তাতে আলোছায়ার দ্রুত আনাগোনা, প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি এবং পরনের মসলিনের সূক্ষ্ম কাজ-করা ঝালরের মতোই তাঁর শিশির-চিকন দিব্যতা।" "পূর্ণ নারীত্বে অ্যালবার্টা এখন প্রস্ফুটিতা। তাঁর মায়ের [মিসেস লেগেট] সোসাইটি-জীবনের কিছুটা প্রবণতা আছে তাঁর মধ্যে, যদিচ একইসঙ্গে মাসীর [মিস ম্যাকলাউড] তুল্য পার্থিব বস্তুর প্রতি উদাসীনতাও বর্তমান।" স্বামীজী বেশ কিছুদিন ধরেই অ্যালবার্টাকে জানেন, অত্যন্ত স্নেহ করেন, সকৌতুকে লিখেছেন, "অ্যালবার্টা এখন সঙ্গীত ও ভাষা-অনুশীলনে ব্যাপৃত, প্রচুর হাস্যে পূর্ণ এবং

যথেষ্টসংখ্যক আপেল ভক্ষণে নিযুক্ত।”

নিউইয়র্কের ‘অস্বাভাবিক নীরস’ সমাজ থেকে অ্যালবার্টাকে তুলে নিয়ে মিসেস লেগেট তাঁকে স্থাপন করেছিলেন লণ্ডনের অভিজাত সমাজে, যার পরিণতি ১৯০৫ সালে জর্জ মণ্টেগু’র সঙ্গে তাঁর বিবাহে। এই বিয়ে লেগেট পরিবারকে ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ এক অভিজাত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।

“মণ্টেগুরা লেগেটদের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্ব এনে দিয়েছিলেন [ফ্রান্সেস লিখেছেন]; অ্যালবার্টা এমন এক অভিজাত পরিবারে বিবাহিত, যার বিষয়ে বলা যায়, ‘সুপ্রসিদ্ধ’। কারণ, জর্জ, বিখ্যাত লর্ড স্যাণ্ডউইচের বংশধর, যিনি ক্যাপ্টেন কুকের বন্ধু ছিলেন, আমেরিকান রিভলিউশনের কালে যিনি ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমির‍্যালটি। হিনচিনব্রোক তাঁদের ঐতিহাসিক বাসস্থান।”

জর্জ মণ্টেগু পরে নবম আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ হন। এঁদের সন্তানের গড্‌মাদার হয়েছিলেন স্বয়ং ইংলণ্ডের রাণী।

অ্যালবার্টার ব্যক্তিত্ব ও মনস্বিতা উচ্চ পর্যায়ের। রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল, এবং ঝোঁক ছিল চরমপন্থী রাজনীতির দিকে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে নিবেদিতা তার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। অ্যালবার্টা, ফাদার পাওয়েলের কাছে ধর্মদীক্ষা নেন, কিন্তু স্বামীজীই ছিলেন তাঁর কাছে ধ্রুব আলোক। অ্যালবার্টার যখন বিয়ে হয়, তখন তাঁর কণ্ঠে ছিল স্বামীজীর মালা, এবং জর্জের দেওয়া একটি ক্রশ।

বহু বৎসর ধরে মিস ম্যাকলাউড অ্যালবার্টাকে নিয়মিত চিঠি লিখে গেছেন—তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করেছেন স্বামীজীর স্মৃতি এবং তাঁর প্রতি অনুরাগ। ১৯২৪ সালের ৯ এপ্রিল মিস ম্যাকলাউড অ্যালবার্টাকে লিখেছিলেন।

> “বাঁচো, বাঁচো—প্রিয় ব্রেটা! এসো, আমরা জীবনের নানা পরীক্ষা করে যাই, শিখি, একান্তে মিলিয়ে নিই আমাদের প্রাপ্তির হিসাব—এসো খেলি আরও কয়েক দশক ধরে। স্বামীজীকে কিছু জানা বা তাঁর ভাবকে কিছু গ্রহণ করা সামান্য উত্তরাধিকার নয়। আমি তোমার উপর এক্ষেত্রে কত-না নির্ভর করি।”

১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে লেগেটদের শিশুকন্যা ফ্রান্সেসের বয়স দু’ বছরের কিছু বেশি। জো মনে করতেন, এই শিশুটি স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সন্তান, কারণ তিনি এর পিতামাতার বিবাহে সাক্ষী ছিলেন। রিজলি ম্যানরে স্বামীজীর বিশেষ আশীর্বাদ শিশুটি পেয়েছিল।

“একদিন সকালে স্বামীজী ও অ্যালবার্টা হল-ঘরে বসে আছেন, শিশুটি সেখানে এল—হাতে কিছু ফুল নিয়ে, আর সেগুলি স্বামীজীকে দিল। স্বামীজী গভীরভাবে বললেন, ‘ভারতে আমরা আচার্যদের পুষ্প দিয়ে বন্দনা

করি…।' তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ তারপর উচ্চারণ ক'রে আশীর্বাদ করলেন।"

রিজলি ম্যানরে স্মৃতির মহাসম্পদ 'স্বামীজীর পাইন'—সেটি এই শিশুরই বসানো। ইলিয়ট-মেইনে স্বামীজী একটি বিরাট পাইন গাছের তলায় বসে শিক্ষা দিতেন, তার তলা থেকে তিনটি চারা তুলে আনেন মিস ম্যাকলাউড রিজলি ম্যানরে—সেখানে একটি তিনি নিজে বসান, আর একটি বসান ফ্রান্সেসের স্কটিশ নার্স, তৃতীয়টি ফ্রান্সেস। তিনটির মধ্যে ফ্রান্সেসের বসানো পাইনটিই বাঁচে, এবং তারই নাম হয় স্বামীজীর পাইন।

ফ্রান্সেস স্বামীজীর 'অধ্যাত্ম সন্তান', তাঁর আশীর্বাদপূত, আবাল্য দেখেছেন গোটা পরিবারটি স্বামীজীর স্মৃতিতে আচ্ছন্ন, অথচ বিস্ময়কর হলো, তাঁর জীবনে স্বামীজীর সত্যকার আবির্ভাব হয়েছিল বহু বৎসর পরে। তার আগে তাঁর জীবন প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে পাক খেয়ে অগ্রসর হয়েছে। ডেভিড মার্জেসনের সঙ্গে ফ্রান্সেসের বিয়ে হয়। ডেভিড, স্যার মর্টিমার মার্জেসন ও লেডি ইসাবেলা মার্জেসনের পুত্র। এই বিবাহেও মিস ম্যাকলাউড ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব করেছিলেন। কারণ তাঁর বান্ধবী লেডি ইসাবেলের (বাকিংহাম-শায়ারের ৬ষ্ঠ আর্ল লর্ড হোবার্টের কন্যা যিনি) সেন্ট জর্জেস রোডের বাসভবনে স্বামীজী ক্লাস নিতেন, সেখানেই নিবেদিতা এবং ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার স্বামীজীকে প্রথম দেখেন। লেডি ইসাবেলের কাছে স্বামীজী 'দি মাস্টার'। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের চল্লিশ বছর পরেও তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে লেডি ইসাবেল অভিভূতভাবে বলেছেন,

> "স্বামীজীর সংস্পর্শে আসামাত্র আমি এমন এক সত্যের স্পর্শ পেয়েছিলাম, যা এতই বৃহৎ ও মহৎ যে, তার মধ্যে আমি পূর্বে যা-কিছু জেনেছি, ভেবেছি, সকলই সমাহিত। সে সত্যকে আর কখনো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি।"

পিতামাতার প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র সন্তান ফ্রান্সেস সর্বদাই অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগের লক্ষ্য, অল্পবয়সেই সুবিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী—জীবনকে তিনি সহজভাবে নিতে পারেন নি, নিজের পরিবারের অনেক কিছুকে বক্র-কটাক্ষে দর্শন করেছেন, তার মধ্যে পারিবারিক বিবেকানন্দ-ভক্তির আতিশয্যও বোধহয় ছিল। সেই ফ্রান্সেস তার পর একদিন বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন নিজের স্বামী, রাজনীতি, এবং লণ্ডনের সোসাইটি-জীবন সম্বন্ধে। তখনই তাঁর মথিত জীবনের মধ্যে উত্থিত হলেন বিবেকানন্দ—অমৃতপাত্র নিয়ে।

"তিন দিন আগে ফ্রান্সেসের একটা চিঠি পেয়েছি [মিস ম্যাকলাউড, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪০ লিখেছেন], যাতে সে তার পরিপূর্ণ জীবনের কথা লিখেছে, …অবশেষে, ৪৪ বছর বয়সে স্বামীজীকে তার আবিষ্কারের কথা।"

ইংলণ্ডের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফ্রান্সেস আমেরিকায় ফিরে-

ছিলেন, 'যথার্থ বাসভবন' রিজলি ম্যানরে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিয়েছিলেন, দাঁড়িয়েছিলেন "স্বামীজীর পাইনের" নীচে, বৃহদারণ্য সেই বনস্পতির মূলের বেষ্টনী দেড়শো ফুটের উপর, তা তিনশো ফুটের উপর দীর্ঘ, তাকে পরিক্রমণ করতে পঞ্চাশ পদক্ষেপ করতে হয়। ভারতবর্ষে মানুষ যে-মন নিয়ে মন্দির পরিক্রমণ করে, সেই মন নিয়ে ফ্রান্সেসের মা মিসেস লেগেট একাকী থাকলে গাছটির পরিক্রমা করতেন। তাঁর কাছে, "স্বামীজী-বৃক্ষটি বিশাল, সুন্দর, এবং তাঁর স্মৃতির মতোই সারা বৎসর চিরসবুজ।" এই বিরাট বৃক্ষের তলায় লেগেট-পরিবারের জীবন-তরঙ্গকে বয়ে যেতে দেখেছেন মিসেস লেগেট। এবার ফ্রান্সেসও তাই দেখতে লাগলেন—তাঁর পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীদের ঐ গাছের তলায় ঘুরতে-ফিরতে-খেলতে। মনে পড়তে লাগল তাঁর মায়ের কথাগুলি "গাছটির তলায় আর একটি প্রজন্ম।'' সেখানে নিজের পৌত্র-পৌত্রীদের দেখতে দেখতে ফ্রান্সেস ভেবেছেন,

"এদের এই বর্তমানের মধ্যে নিঃশব্দ চরণে এসে গিয়েছে আগামীকাল।"

ফ্রান্সেস লেগেট, জীবনের শেষ পর্বে বিবেকানন্দকে হৃদয়মন্দিরে লাভ করে, তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রকাশরূপের অনুধ্যান করতে চেয়েছেন। রিজলিতে ১৮৯৯ সালের 'মহান গ্রীষ্মের' কয়েকটি অপরূপ ছবি তাঁর মনের আকাশে উজ্জ্বল আকারে ফুটেছিল। যেমন, তরুণী ফরাসী শিল্পী মড স্টামের এই বিবেকানন্দ স্মৃতিচিত্রটি :

"কী কথা, কী বাণী। অগ্নিশিখার মতো রেশমী পোশাকে আবৃত দেহ, অসাধারণ মহিমার আকার, প্রাণ-মন-হৃদয়কে ক্রীতদাস করে রাখে। হলে আগুনের ধারে বসে আছেন, সঘন কৃষ্ণ গভীর আর্দ্র নয়ন—প্রাচ্য কবিদের উপমার ভাষায়, ভ্রমররাজিতুল্য—ধীরে তা সরে যাচ্ছে একজন থেকে অন্যজনের উপর দিয়ে। কিংবা রিজলির উদ্যানে পায়চারি করছেন—প্রত্যেক পদক্ষেপে যেন প্রত্যাখ্যান করছেন পৃথিবীকে—যে-পদপাতের বর্ণনা কবিরা করেছেন তাঁদের কাব্যে—না না, ও-জিনিস এ-জীবনে আর কখনো দেখার আশা করি না।"

ফ্রান্সেস লেগেটের মা মিসেস লেগেটের স্মৃতির ছবি এই :

"স্বর্ণোজ্জ্বল দিবস, কোমল তারাতুর রাত্রি, তারকাখচিত আকাশের নীচে শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে খালি-পায়ে পথ চলা—আর ঈশ্বরের কথা, মানবাত্মার কথা। তারপরে হল-ঘরে সে-রাত্রির মতো শেষ সমাবেশ, তখন দরজাগুলি খোলা আছে গ্রীষ্মরাত্রিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, এবং স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত ধ্বনিতরঙ্গ ঝিঁঝির সুরের সঙ্গে মিলে-মিশে অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত—কোনো প্রশ্নে

প্রতিবাদে যাকে বিচলিত করতে কেউ সাহস করে না। তারপর নিঃশব্দে সকলে একে একে প্রস্থান করে শয়নকক্ষের দিকে। বিশাল ভাবী ঘটনার পূর্বচ্ছায়া পড়েছে সেখানে, এমন একটি শক্তিশালী আন্দোলনের রথচক্র ঘুরতে শুরু করেছে, যা ওখানে উপস্থিত মানুষগুলির ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে, কেননা—যেন স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসে কথা বলছেন তাদের সঙ্গে।"

বিবেকানন্দের কথা শুনতে শুনতেই ফ্রান্সেস লেগেটের একাশি বছরের জীবন শেষ হয়েছিল। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০, আমেরিকার স্টোন রিজে তিনি মারা যাবার পরে, স্বামী চেতনানন্দ তাঁর পুত্র ভাইকাউণ্ট ফ্রাঙ্ক মার্জেসনকে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি লেখেন। চেতনানন্দের সঙ্গে ফ্রান্সেসের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল—পত্রে যোগাযোগও ছিল। (ফ্রান্সেস, চেতনানন্দের অনুরোধেই বর্তমান লেখককে তাঁর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সুখ্যাত গ্রন্থ 'লেট অ্যাণ্ড সুন' উপহার পাঠিয়েছিলেন)। চেতনানন্দ উক্ত পত্রে লিখেছিলেন, "লেগেট-পরিবারের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সংঘের ৮২ বছরের অব্যাহত সম্পর্ক—তা ছিন্ন হবার নয়।" "আর, [চেতনানন্দ লেখেন] স্বামীজী তাঁর এক শিষ্যকে একবার বলেছিলেন, আমি যার মাথায় হাত রেখেছি, তার আর পরজন্মের ভাবনা নেই।" ভাইকাউণ্ট ফ্রাঙ্ক মার্জেসন উত্তরে বলেছিলেন, তিনি তাঁর মায়ের [ফ্রান্সেস লেগেট] কাছ থেকে স্বামীজীর কত কথাই না শুনেছেন। তাই চেতনানন্দের পত্র তাঁর কাছে পুরাতন বন্ধুর স্নেহ-সান্ত্বনার করস্পর্শের মতোই মনে হয়েছে।

"আপনার পত্রের প্রার্থনামন্ত্র আমার (প্রয়াত) মাতাকে সেই শক্তি ও অবলম্বনের আশ্রয় এনে দিয়েছে, যার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। দৃঢ় বাহুর আশ্রয় যেন তা। এ-জিনিস তখনি এসেছে যখন তাঁর প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রয়োজন আমারও—ঐ আশ্রয় তাঁর আছে—আমি যেন তা জানতে পারি। ···আমার মা বিভিন্ন সময়ে আমাকে বলেছেন, স্বামীজী তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। নিজের জীবনের পিছন দিকে তাকিয়ে তিনি ভেবেছেন—সংকট যখন ঘনীভূত, বিপর্যয় আসন্ন, তখন কি তিনি স্বামীজীরই ত্রাণহস্তের দ্বারা আবৃত ছিলেন না? আমার তো মনে হয়, তিনি অনুভব করেছিলেন, স্বামীজীর আশীর্বাদ স্বর্ণসূত্রের মতো তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল।"

একেবারে শেষ অবধি স্বামীজীর ছবি ছিল ফ্রান্সেসের প্রার্থনা-ডেস্কের উপরে। এঁর কন্যা মাননীয়া লেডি চার্টারিস চেতনানন্দকে লিখেছিলেন, "আপনার হয়ত জেনে ভালো লাগবে, তাঁর শেষ দিনে হাসপাতালে আমি তাঁর কাছে আপনার ছোট্ট বইটি থেকে পাঠ করেছিলাম—'মেডিটেশন উইথ বিবেকানন্দ'। [বইটির আসল নাম, "মেডিটেশন অ্যাণ্ড ইটস্ মেথডস্—অ্যাকর্ডিং টু স্বামী বিবেকানন্দ।"] ওটি বছরখানেক আগে আপনি পাঠিয়েছিলেন। যে-ঘরে তিনি সর্বদা প্রার্থনা করতেন, সেই ঘরে বইটি ছিল।"

লেডি চার্টারিস শেষ করেছেন এই বলে,

"আপনি বলেছেন, গত ৮২ বছরে রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগ অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। সে কথা সত্য। সে যোগ যেন কখনো বিচ্ছিন্ন না হয়।"

সভ্যতার কেন্দ্রভূমি প্যারিসে…

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

লেগেট-পরিবার এবং স্বামীজী ১৮৯৯-এ রিজলি ম্যানরে অবস্থানের পরে আবার একত্র হয়েছিলেন প্যারিসে। স্বামীজী প্যারিসে যান ১৯০০ সালের 'কংগ্রেস অব দি হিস্টরি অব রিলিজিয়নস্'-এ যোগ দিতে। প্যারিসে বিশ্বমেলা উপলক্ষে ঐ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লেগেটরা ৬ নম্বর প্লাস দে-জেতাৎ ঠিকানায় একটি বাড়ি লীজ নিয়েছিলেন। সে বাড়ি সুসজ্জিত, সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে পূর্ণ। স্বামীজী ওই বৎসরের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মাঝামাঝি হতে মাসখানেক এই লেগেট-ভবনে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি লেগেট-পরিবারের লোকজন, এবং সেকালের বিখ্যাত সোসিওলজিস্ট প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে প্রায়ই বিশ্ব-মেলা দেখতে যেতেন।

প্যারিসের বিশ্বমেলায় বহিরঙ্গ সভ্যতার কল্পনাতীত ঐশ্বর্য থরে-থরে সাজানো ছিল। কিন্তু সেই প্যারিস, স্বামীজী যাকে 'সভ্যতার কেন্দ্রভূমি' বলেছেন, তার বিদ্যা-বুদ্ধি ও সংস্কৃতি কম বিকিরিত হচ্ছিল না বিভিন্ন ড্রইং-রুমের বা পার্টির আলাপ আলোচনায়। লেগেট-ভবনে তেমন বহুল সমাবেশের বিষয়ে স্বামীজী নিজেই বলেছেন,

"মিঃ লেগেট প্রভৃত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন।…কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক গায়িকা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ মিস্টার লেগেটের আতিথ্যসমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ—সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত।"

এই সমাবেশে স্বামীজী "সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী বিদগ্ধ নাগরিকের মতো বাক্য-দ্যুতি বিকিরণ করতে পারতেন ; চূড়ান্ত বক্রোক্তি-কুশলীর সঙ্গে সমকক্ষতায় সমর্থ ছিলেন ; পরাভূত করতে পারতেন সর্বপ্রধান পণ্ডিত ও মনস্বীদের বিতর্ককালে।" ফ্রান্সেস লেগেট বলেছেন, "তাঁর রূপসৌন্দর্য এবং মর্যাদাময় ভাবভঙ্গি, সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। প্যারিসে বলা হতো, তাঁর চেহারা যতখানি-না সন্ন্যাসীর ততোধিক রাজপুত্রের।"

আর মিসেস লেগেট, যিনি ইংলণ্ডে ও কণ্টিনেণ্টে রাজপরিবার ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সুপরিচিত হোস্টেস, তিনি বিবেকানন্দের মহামর্যাদা সম্বন্ধে বলেছেন,

"আমি যত বিখ্যাত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেবল দুজন মানুষ নিজেদের মর্যাদা সর্বাংশে রক্ষা করেও প্রথম আলাপেই অপরকে সম্পূর্ণ মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারতেন, তাঁদের একজন হলেন—জার্মান সম্রাট, দ্বিতীয় জন—স্বামী বিবেকানন্দ।"

অ্যালবার্টার চিঠিতে স্বামীজীর এইকালের একটি ছবি :

> "গত রাত্রি মনোরমভাবে কেটেছে। ডিনার অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত। আমি প্রিন্সেস ডোরিয়াকে আমার ডান দিকে বসিয়েছিলাম, তারপর স্বামীজী। টেবিলের এক প্রান্তে লেডি অ্যাংলেসী, এবং আমার বাঁ পাশে ডিউক অব নিউক্যাসল। স্বামীজী স্ফূর্তির মেজাজে ছিলেন। দেখলাম, রাজকুমারী তাঁর ভাইয়ের (ডিউক অব নিউক্যাসল) সহানুভূতির মনোভাব দেখে আনন্দোজ্জ্বল। ডিনারের মধ্যে ডিউক স্বামীজীকে অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন করলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন, এই প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিলেন।"

অ্যালবার্টার অন্য এক চিঠি,

> "গত রাত্রে স্বামীজী দারুণ মেজাজে ছিলেন।...সানন্দে তিনি প্যারিস ঘুরে দেখছেন—শিল্পী ও মনীষীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে—তাঁদের মধ্যে রদ্যাঁ ইত্যাদিও আছেন। বৃহস্পতিবার তিনি গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছেন বিখ্যাত এক ফরাসী চিত্রশিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।"

স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ (স্বামীজীর ইউরোপ-জীবন সম্বন্ধে যিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন) মন্তব্য করেছেন, "শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে প্রায়শ কথিত অগুস্ত রদ্যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, এ সংবাদ চমৎকার।" আর লুইজ্ বার্কের (বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক) দুঃখ, অ্যালবার্টা কেন, পূর্বোক্ত "বিখ্যাত ফরাসি চিত্রশিল্পীর নাম করলেন না—বিশেষত ফ্রান্স সেকালে যখন জ্বলন্ত শিল্পী ও মনীষীতে পূর্ণ ছিল ?" লুইজ্ বার্ক তাঁদের কয়েকজনের নামও করেছেন।

সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বামীজীর সম্ভাব্য সাক্ষাতের প্রসঙ্গে না গিয়ে, আমরা স্পষ্টত যাঁদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় বা আলাপ-আলোচনার কথা জেনেছি, তাঁদের মধ্যে এই রচনায় পূর্বে উল্লিখিত হননি, এমন কয়েকজন হলেন—বিখ্যাত কনসার্ট-গায়িকা এমা থার্সবি, চিকাগোর সমাজকর্মী জেন অ্যাডামস, সমাজবিবর্তনবাদী ডাঃ লুইস জেনস, সর্বশ্রেষ্ঠ অপেরা গায়িকা এমা কালভে, চিকাগোর সমাজজীবনে রাজ্ঞীসদৃশা মিসেস পটার পামার, নাট্যশিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে সুপরিচিত বক্তা মিসেস মিলওয়ার্ড অ্যাডামস্, বৈজ্ঞানিক ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, গ্রীনএকার সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাত্রী মিস সারা ফার্মার।

আমরা আরও জেনেছি, স্বামীজীর সঙ্গে সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড শক্তিশালী নেত্রী প্রিন্সেস ডেমিডফের বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। এবং দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়েছিল 'দৈবী সারার' সঙ্গে ('লা দিভিন সারা') যিনি পাশ্চাত্ত্যজগতের সর্বপ্রধান অভিনেত্রী এবং সর্বাধিক খ্যাত নারী।

বৈজ্ঞানিক, এবং বিখ্যাত কামান-নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গেও বিবেকানন্দের এখানে আবার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিবেকানন্দের মধ্যে "ধর্মজগতের নেপোলিয়ানকে" দর্শন করেছিলেন। "তেজস্কর, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিবেকানন্দ—(হিরাম ম্যাক্সিম লিখেছেন)—বিশাল তাঁর পাণ্ডিত্য, ইংরেজী বলেন ওয়েবস্টারের মতো, সমগ্র আমেরিকার সমবেত সকল পাদরি ও মিশনারি অপেক্ষা অধিক ধর্ম ও দর্শন জানেন।"

স্বামীজীর পরিচয় হয়েছিল ইউরোপের এক প্রধান পুরুষ, অ্যানার্কিস্ট তত্ত্বের বিখ্যাত প্রবক্তা, বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে, যাঁর বিষয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "টলস্টয়ের পরেই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী।" পরিচয় হয়েছিল ধর্মযাজক পিয়ের হিয়াসান্থ-এর সঙ্গে, "যাঁর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং দারুণ ত্যাগ-তপস্যার খ্যাতি ফ্রান্স ও বৃহত্তর পৃথিবীতে প্রসারিত ছিল।" আমেরিকার দর্শনজগতে স্বর্গযুগের প্রবাদপুরুষরূপে কথিত উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে স্বামীজী এখানে আবার মিলিত হয়েছিলেন, যিনি স্বামীজীর একটি ভাষণের মুদ্রিত রূপ পড়ে এইকালে লিখেছিলেন,

"বিবেকানন্দ লোকটি বাগ্মিতাশক্তিতে পরমাশ্চর্য ব্যাপার।…সন্দেহ নেই তিনি মানবলোকের মহাগৌরব।"

প্যারিসের ধর্ম-ইতিহাস কংগ্রেসে বক্তৃতাকালে স্বামীজী যাঁদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ্ এমিলি গুইমেট, সিলভাঁ লেভি, এম এ ফুসে প্রভৃতি। এই কংগ্রেস হয়েছিল প্যারিসের সরবন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একাধিক হলে। সরবনের গ্র্যাণ্ড অ্যাম্পি-থিয়েটারে ফরাসি শিল্পী প্যুভি দ্য শ্যভানে'র (নিবেদিতা যাঁর শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ব্যাখ্যাসহ যাঁর ছবি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন) আঁকা বিরাট ম্যুরা-লের ছবি আছে—নাম, 'পবিত্র অরণ্য'। একদিকের গোটা দেওয়ালজোড়া ৭৫ ফুট দীর্ঘ এই চিত্রের কেন্দ্রে অরণ্যমধ্যে উচ্চাসনে উপবিষ্টা এক নারী, সরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি পরিবেষ্টিত আরও কতকগুলি নারীর দ্বারা, যাঁদের কেউ সাহিত্য, কেউ বাগ্মিতা, কেউ কেউ-বা বিজ্ঞানের নানা শাখার প্রতীকমূর্তি।

স্বামীজী স্বয়ং বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের ও বাগ্মিতার প্রতীক, সরবনে তিনি গিয়েছেন —প্যুভি দ্য শ্যভানের ম্যুরালের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন—এই সংবাদ শুনে মিসেস লেগেট পত্রে লেখেন,

"সরবনে স্বামীজী! আ-হাঃ! প্যুভি দ্য শ্যভানে'কে পশ্চাদ্‌পটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—তেমন একটি ফটোর জন্য আমি কী না দিতে পারি!"

প্যারিসে স্বামীজীর সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটাবার পরে নিবেদিতা অন্যত্র চলে যান। সেখান থেকে লেখেন,

"আমার মনে হয়, স্বামীজী ইতিমধ্যে সারা প্যারিসকে তাঁর পদতলে এনে ফেলেছেন।"

এই সময়ে যে-কয়েক মাস স্বামীজী ফ্রান্সে ছিলেন, সমস্ত সময়টা কিন্তু লেগেট-ভবনে কাটান নি। বরং বলা চলে, বেশির ভাগ সময়ই অন্যত্র কাটিয়েছেন। স্বামীজীর মধ্যে অসহিষ্ণু একটি মানুষ সর্বদাই সুস্থিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত, আর তিনি ঠেলে বেরিয়ে পড়তেন। লেগেট-ভবনে সামাজিক আকর্ষণের কেন্দ্রমণি যখন, তখনি ছিটকে চলে গিয়েছিলেন তরুণ ফরাসী লেখক জুল বোয়া-র দরিদ্র-আবাসে, যেখানে "রাশি-রাশি বই, আর অখণ্ড শান্তি।"

লেগেট-ভবনে জুল বোয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে অল্প আলাপের পরেই স্বামীজী তাঁকে একান্তে বলেন, তিনি ওঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবেন।

"স্বামীজীর প্রস্তাব শুনে আমি চমৎকৃত, [জুল বোয়া লিখেছেন], তা আমার কাছে গৌরবজনক। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, তিনি এখানে কোন্ বিলাসবৈভবের আশ্রয়ে আছেন, কতখানি মনোযোগের লক্ষ্য তিনি। উল্টোপক্ষে আমি মাত্র তরুণ এক লেখক, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ব্যবস্থাও করে উঠতে পারব না। তিনি বললেন, আমি ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, মাটিতে বা মেঝেয় শুয়ে কাটাই। আপনার ওখানে আমাদের বিলাস হবে—আচার্যদের প্রজ্ঞার আস্বাদন। আমি আমার পাইপ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তার ধূম্র-গন্ধের ভিতর থেকে উৎসারিত হবে বেদ ও উপনিষদের স্তোত্র।"

স্বামীজী পরদিনই সেখানে চামড়ার একটা ছোট ব্যাগ হাতে করে এসে হাজির। ৬ তলা উঁচুতে জুল বোয়ার ফ্ল্যাট, শহরের কর্ম-কোলাহল থেকে দূরে। সামনে পাহাড়, উপত্যকা, কৃত্রিম হ্রদ—উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলসিত। দিনান্তে জুল বোয়া এসে দেখতেন, সকালে বিবেকানন্দ যেখানে বসেছিলেন, এখনো সেখানেই আছেন, প্রচুর ধূমপান করেছেন, অধিকতর ধ্যান। অপূর্ব সন্ধ্যাগুলি তাঁরা একত্র কাটাতেন, যেখানে প্রকৃতি ও ধর্মদর্শনের মোহন মিশ্রণ।

"পুষ্পের ঘন গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে যেত হিন্দু-সঙ্গীতের সরল গম্ভীর তান। [বোয়া আরও লিখেছেন]। মনে হতো, প্যারিসের বাসন্তী প্রহরে বয়ে এসেছে গঙ্গার বায়ুপ্রবাহ। আকাশে তারকার অর্ধস্পষ্ট আলোর মোহমায়া, তারই নীচে পুরাতনী ভারতের এই বার্তাবহ—তাঁর সুমহান আকার, বৃহৎ উজ্জ্বল নয়ন, যা কখনো পূর্ণ বিস্ফারিত, কখনো ঘন অক্ষিপত্রে অর্ধাবৃত, মাথার উপরে জ্যোতির্বলয়ের মতো কৃষ্ণকেশের মেঘপুঞ্জ—হিমালয়ের বুদ্ধ যেন স্থানান্তরিত হয়েছেন সীন নদীতটের এক শহরতলীতে।"

বিবেকানন্দ ইউরোপেও আর থাকতে চাইলেন না। পূর্ব পৃথিবীর দিকে পুনর্যাত্রা শুরু করলেন। প্যারিস থেকে ভিয়েনা, কনস্টানটিনোপল, এথেন্স, মিশর, এশিয়া মাইনর, জেরুজালেম মাড়িয়ে চললেন তিনি—সঙ্গে ছিলেন সঙ্গী হিসাবে এই জুল বোয়া, সস্ত্রীক পেয়র হিয়াসান্থ, মাদাম কালভে। সেই

তীর্থযাত্রার খণ্ডাংশের চমৎকার বিবরণ লিখেছেন মাদাম কালভে (যার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের 'সুরের অপ্সরা' অধ্যায়ে আছে)।

এই ভ্রমণের পরিচালিকা-নেত্রী ছিলেন মিস ম্যাকলাউড। স্থিরবুদ্ধি বিচক্ষণ তিনি। তবু তিনিও অন্যান্যদের মতো পথ হারিয়েছেন পথ চলতে চলতে—বিবেকানন্দের মোহিনী মায়ায়।

মিস ম্যাকলাউড অধিকন্তু জানতেন, এই অনিকেত মানুষটিকে আবদ্ধ করা যায় না। কায়রোয় স্বামীজী হঠাৎ একদিন তাঁকে বললেন,

'আমি চলে যেতে চাই।'

'কোথায় ?'

'ভারতে।'

'বেশ তো, যান।'

'কোনো বাধা নেই তো ?'

'নিশ্চয়ই না।'

মাদাম কালভে কিন্তু অত সহজে স্বামীজীকে বিদায় দিতে চান নি। স্বামীজীকে গভীর বিষণ্ণ দেখে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার কারণ।

স্বামীজী বললেন, "আমি গুরুভাইদের কাছে ফিরে যেতে চাই।"

"শুধু এই ? তা ভাবনার কি আছে ? আমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছেন কেন, বলুন ?"

স্বামীজীর চোখ জলে ভরে গেল। কালভের উদারতায় তিনি অভিভূত।

"আমি ভারতে যাব গুরুভাইদের মাঝখানে থেকে দেহত্যাগ করতে।"

শুনে কালভে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন, শিউরে উঠলেন।

"স্বামীজী, আপনি মারা যাবেন !! না না, সে হয় না। আপনাকে যে আমাদের চাই।"

স্বামীজী ঘাড় নাড়লেন। "উপায় নেই। এই পৃথিবীর মেয়াদ আমার ফুরিয়েছে।"

"তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলে দিলেন।"

দিবসের শেষ সূর্য...উচ্চারিল...

স্বামীজী তাঁর শেষ মাসগুলি ভারতে কাটাবার জন্য ফিরে এলেন। মিস ম্যাকলাউড গেলেন জাপানে, সেখানে জাপানী শিল্পশাস্ত্রী কাকাজু ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হলো। স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ওকাকুরা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন, কিন্তু শারীরিক কারণে স্বামীজী তাতে রাজী হতে পারলেন না। তখন ওকাকুরা ভারতে এলেন মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে—স্বামীজীর সাক্ষাৎ বাসনায়। বেলুড়ে উভয়ের দেখা হলো। কয়েকদিন পরে ওকাকুরা মিস ম্যাকলাউডকে সজোরে বললেন—"বিবেকানন্দ আমাদের,

তিনি প্রাচ্যের ; তিনি তোমাদের নন।" শুনে ম্যাকলাউডের মন গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল, কারণ তিনি অনুভব করলেন—এই দুটি মানুষের মধ্যে একটা সত্যকারের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সেই একই তৃপ্তি তিনি পেলেন যখন স্বামীজী ওকাকুরা সম্বন্ধে তাঁকে বললেন, "মনে হচ্ছে, বহুদিনের হারানো ভাইকে ফিরে পেলাম।" ওকাকুরা জাপানে পাঠানো পত্রে লিখলেন, "বিবেকানন্দ এমনই বিরাট ব্যক্তি যে সারা পৃথিবীর লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করে।...এমন মানুষ অন্য কোথাও মিলবে না।" ওকাকুরা কিন্তু স্বামীজীর সংঘে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, "না, জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনো আমার শেষ হয়নি।" ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রোমা রোলাঁকে বলেছেন, বিবেকানন্দই ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে বলেছিলেন: "এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ ; আপনি রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান ; তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।" স্বামীজীর সূত্রে ভারতে আসার পরে ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেনাশোনা হয়।

এইকালে, অর্থাৎ ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে, স্বামীজীর সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়েছে। একদিন স্বামীজী তাঁকে বললেন:

"এ পৃথিবীতে সম্বল বলতে আমার আর কিছু নেই। একটি কপর্দকও নয়। আমাকে যা দেওয়া হয়েছিল, সবই দিয়ে দিয়েছি।"

ম্যাকলাউড বললেন, "যতদিন আপনি বাঁচবেন, আমি মাসে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে যাব।"

এক মুহূর্ত ভেবে স্বামীজী বললেন, "তাতে আমার চলে যাবে তো?"

ম্যাকলাউড বললেন, "নিশ্চয়ই। তবে হয়ত ওতে আইসক্রীম জুটবে না।"

কৌতুকের সঙ্গে বিচিত্র স্নেহের অনুভূতিতে মিস ম্যাকলাউডের মন ভরে যায়। এতবড় মানুষ বিবেকানন্দ, আদি অন্ত করা যায় না, আইসক্রীমের উপর কিন্তু ছোট ছেলের ভালবাসা। মিস ম্যাকলাউডের মনে পড়ে, একদিন তাঁরা খেতে বসে সবাই স্ট্রবেরি খাচ্ছেন, একজন প্রশ্ন করল, "স্বামীজী, স্ট্রবেরি আপনার কি রকম লাগে?" স্বামীজী বললেন, "স্ট্রবেরি? ও-জিনিস আমি খাই-ই নি।" "সেকি আপনি তো প্রতিদিনই স্ট্রবেরি খাচ্ছেন?" "কই কোথায়?" "কেন, আইসক্রীমে তো স্ট্রবেরি দেওয়া থাকে।" "ও হো! তাই বলো। কিন্তু বাপু, আইসক্রীমের মধ্যে কী থাকে, তা কি কেউ হিসেব করে? ওর মধ্যে নুড়ি দিয়ে দাও না, তাও না-জেনে মেরে দেবো।"

মাথা দুলিয়ে মজা করে স্বামীজী হাসতেন—মিস ম্যাকলাউডের মনে পড়ে যায়। স্বামীজী হাসেন আর বলেন, "আমি চকোলেট আইসক্রীম ভা-লো-বা-সি! আমার রঙ চকোলেটের মতো। আমি তাই চকোলেট আইসক্রীম ভা-লো-বা-সি-।"

ম্যাকলাউড স্বামীজীকে অগ্রিম ২০০ ডলার দিলেন।

এই সময়ে আর একদিন, স্বামীজী তাঁর ঘরে বসে আছেন, ম্যাকলাউডকে

বললেন, "আমার আয়ু চল্লিশ পুরোবে না।" তখন স্বামীজীর বয়স ঊনচল্লিশ চলছে।

ম্যাকলাউড বললেন—"কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ তো তাঁর বড়-বড় কাজগুলি চল্লিশ থেকে আশি বছরের মধ্যেই করেছিলেন!"

স্বামীজী—"আমি আমার বাণী দিয়েছি। এবার ফিরে যেতেই হবে।"

"কেন যাবেন ?"

"বড় গাছের ছায়ায় ছোট গাছ বাড়ে না! তাদের সুযোগ দিতে আমি চলে যাব।"

কে তুমি…পেল না উত্তর…

মিস ম্যাকলাউড কি স্বামীজীর কথাগুলি বিশ্বাস করেছিলেন? স্বামীজী তাঁর কাছে নব অবতার, মূল সত্যে ওটা স্বীকার্য, কিন্তু তিনি তো দেহে আবদ্ধ, সুতরাং তাঁর ছোটখাট দৈনন্দিন কথায় বিশ্বাস না রাখলেও চলে, বিশেষত মৃত্যু যখন দৈবাধীন।

ইংলণ্ডের রাজার জুবিলী অনুষ্ঠান দেখতে মিস ম্যাকলাউড ইংলণ্ড চলে গেলেন। সেখানে একদিন থিয়েটারে ম্যাটিনী শো থেকে বেরিয়ে তাঁর মনে হলো —পৃথিবী কী ধূসর আর বিবর্ণ। সমস্ত প্রাণরস শুকিয়ে গেছে। সব ছায়া-ছায়া। সেই রাত্রেই তিনি তারবার্তা পেলেন—স্বামীজী নির্বাণ লাভ করেছেন— ৪ঠা জুলাই।

মিস ম্যাকলাউড একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন। দেহ-মন-প্রাণ আলোড়িত হয়ে অশ্রু নামল। দু' বছর ধরে সেই অশ্রু ঝরল।

একদিন মিস ম্যাকলাউডকে উপলক্ষ ক'রে, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই সম্বন্ধে স্বামীজী একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেটি অনেকের কাছেই বিবেকানন্দের মহাপরিনির্বাণ দিবসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। ঐ কবিতার এই লাইনগুলি—"এসো এসো, হে আলোকের প্রভু, স্বাগত তুমি, হে সূর্য, বিকীর্ণ করছ—মুক্তি"—মিস ম্যাকলাউডের কি মনে পড়েছিল? মনে করবার মতো মানসিক অবস্থায় কি তিনি তখন সত্যই ছিলেন?

নিবেদিতার চিঠিগুলি একের পর এক আসতে লাগল। মিস ম্যাকলাউড জানলেন স্বামীজীর বিদায়ের বিশাল বারতা:

"কী অসাধারণ মহান হয়েছিল শেষ দৃশ্য, তা কি জানো!…সান্ধ্য ধ্যানের অন্তে নিঃশব্দে দেহত্যাগ—জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মতো। 'আমার মরণ হবে মহামরণ। হর! হর! হর! বলতে-বলতে চলে যাব'—বহুদিন আগে তিনি বলেছিলেন। সেকথা সত্য হলো। মালা এখনো শুকোয়নি, বর্ম অটুট, সবই ঠিক আছে—তিনি চলে গেলেন।"

মিস ম্যাকলাউড জানলেন—দেহান্তের আগে স্বামীজী নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। তারপর নিজে জল ঢেলে তাঁর হাত ধুইয়ে দিয়েছিলেন—যীশু যে-ধরনের কাজ করেছিলেন শেষ ক্ষণে। তার দ্বারা স্বামীজী আসন্ন বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ৪ঠা জুলাই বিকালে দু' মাইল বেড়িয়ে আসার পরে উত্তরপশ্চিম দিকে মুখ করে তিনি ধ্যানে বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে শুয়েছিলেন। একটু ঘুমিয়েছিলেন :

"তারপর সহসা ঘুমের মধ্যে শিহরণ, কান্না যেন, গভীর এক শ্বাস, অনেকক্ষণ বাদে আর একটি শ্বাস—সেই শেষ। আমাদের প্রিয়তম আচার্যদেব আর নেই। জীবনের সন্ধ্যাসঙ্গীত স্তব্ধ, পৃথিবী নীরব, আর মুক্তির অরুণোদয়।"

"সমস্ত পৃথিবী পূজারত [নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউডকে আরও লিখেছিলেন] কিন্তু আমি জানি, তাঁর স্মৃতির শ্রেষ্ঠ পূজামন্দির তোমার হৃদয়। তুমি পীড়িত, আর তোমাকে ক্লান্ত করব না।"

মিস ম্যাকলাউডের জন্য স্বামীজীর শেষ বার্তা তাঁর চিতাগ্নি থেকে অলৌকিকভাবে উড়ে এসেছিল—অন্তত নিবেদিতা তাই মনে করেছেন। স্বামীজীর শেষ শয্যার উপরে পাতা ছিল তাঁর একটি বস্ত্র—নিবেদিতার মনে হলো, যদি ঐ বস্ত্রের একটি কোণ কেটে নিয়ে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাই হবে শেষ স্মারক। কিন্তু সঙ্কোচে তা করতে পারেন নি। চিতা জ্বলেছিল। স্তব্ধ নিবেদিতা একধারে অন্যমনে বসে আছেন। "হঠাৎ কে যেন আমার জামার হাতায় টান দিল, [নিবেদিতা লিখেছেন]—চোখ নামিয়ে দেখি, অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে উপবিষ্ট আমার কাছে উড়ে এসেছে দুই-তিন ইঞ্চি বস্ত্রখণ্ড, যা ছিল আমার প্রার্থিত। সমাধির অপর পার থেকে সে যেন তাঁর পত্র—তোমার জন্য।"

এই ঘটনা, এবং অন্য আরও দু'একটি ঘটনার জন্য নিবেদিতা খ্রীস্টীয় রেজারেকশনের মূল সত্যকে আর অবিশ্বাস করতে পারেন নি।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে বিবরণসহ প্রথম যে-পত্র লেখেন, তাতে এই দগ্ধ বস্ত্রখণ্ডটি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই চিঠি মিস ম্যাকলাউড যথাকালে পান নি। নিবেদিতার কাছে বস্ত্রখণ্ডটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এতই বেশি ছিল যে, মিস ম্যাকলাউড সেটি না পাওয়ায় তাঁর অন্তর্যাতনার শেষ ছিল না। চিঠির পর চিঠিতে তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছেন,

"ও য়ুম ! ও য়ুম ! এও কি সম্ভব, আমার প্রথম চিঠি এবং তার ভিতরকার মহামূল্য জিনিসটি ডাক-পথে হারিয়ে গেছে!" "আমাকে একবার জানাও, তুমি চিঠিটি পেয়েছ। তিনিই ভরসা। তিনি নিশ্চয় তোমার জন্য যে সান্ত্বনা-স্মারক পাঠিয়েছিলেন, সেটি ডাক-পথে হারিয়ে যেতে দেবেন না।"

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার যে-বিপুলসংখ্যক পত্র আমি পেয়েছি, তাদের মধ্যে কোথাও উল্লেখ নেই—মিস ম্যাকলাউড বস্ত্রখণ্ডটি পেয়েছিলেন।

স্বভাবতই এক্ষেত্রে আমরা সন্দিগ্ধ নৈরাশ্য বোধ করেছি। মিস ম্যাকলাউড সত্যই কি জিনিসটি পান নি? এই প্রশ্ন মনে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল।

প্রশ্নটির আনন্দদায়ক মীমাংসা হয় ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে, যখন বাঙ্গালোরে মিঃ রামকৃষ্ণের (স্বামীজীর শিষ্য ডাঃ বেঙ্কটরঙ্গমের পুত্র) বাসস্থানে যাই। তিনি কথায়-কথায় বলেন, মিস ম্যাকলাউড তাঁদের খুব স্নেহ করতেন, বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি প্রিয়পাত্রদের মাথায় এক টুকরো পোড়া কাপড় ছোঁয়াতেন, যেটি তাঁর সঙ্গে সর্বদা থাকত। তারপর সেটি এক সময়ে সমুদ্রের জলে পড়ে যায়। শুনেই আমি চমকে উঠি। ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করি, এর কোনো প্রমাণ আছে? মিঃ রামকৃষ্ণ বলেন, হাঁ, ও-ব্যাপারটা মিস ম্যাকলাউড তাঁর বাবাকে চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। আমার বিশেষ অনুরোধে সেই চিঠির ফটোচিত্র মিঃ রামকৃষ্ণ আমাকে দেন, এবং তা আমি মাদ্রাজের বেদান্ত কেশরী মাসিক পত্রে জানুয়ারী ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশ করি।

মিস ম্যাকলাউড ২৫ মার্চ, ১৯১৮, ডাঃ বেঙ্কটরঙ্গমকে লিখেছিলেন,

"জানো কি, জাহাজে যাবার সময়ে (সমুদ্রে) হারিয়ে ফেলেছি স্বামীজীর মহান পত্রটি, সেইসঙ্গে স্বামীজীর দেহত্যাগ সম্পর্কিত নিবেদিতার পত্র, এবং চাদরের ছোট্ট টুকরোটি, যা নিবেদিতার কাছে উড়ে এসে পড়েছিল—যা স্বামীজীর একটি বিশেষ পত্রের মতোই মনে হয়েছিল। ও সবগুলি এখন কেবল স্মৃতিতেই রয়ে গেল। তাই তো ভালো, নয় কি?"

উপরে মিস ম্যাকলাউড যাকে স্বামীজীর 'মহান পত্র' বলেছেন—সেটি স্বামীজী তাঁর দেহত্যাগের দু'বছর আগে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন—"তাঁর সমস্ত চিঠির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চিঠি।" আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সেটির বাংলা অনুবাদ—বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম শান্তরসের সাহিত্য। স্বামীজী যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এই:

> লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হলো। এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া।' হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু!
>
> যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক-বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণর অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই আমার আসল প্রকৃতি। আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি-মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর, যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে।
>
> যাই প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক-গে, সংসারের ভালো-মন্দ সংসারীরা দেখুক-গে, তুই ও-সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়।' যাই প্রভু যাই।

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে খুশি। এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতে খুশি। জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশি। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এমন বন্ধন আমি কারো কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতেই মুক্ত হই—সেই পুরনো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে—চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না।···

যাই মা যাই।—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।

আ-হা! কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে।···মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব বোধ হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের বিষয়ে ভালো-মন্দ ভাব পর্যন্ত জাগে না—আমার মনের অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ—কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলো পুতুল আর ছবি সাজানো দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না—এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে—আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ ঐ—আবার সেই আহ্বান—যাই, প্রভু যাই।

মিস ম্যাকলাউড সবই জানতেন। বিবেকানন্দকে বাঁধা যায় না—যাবে না। তবু কেঁদেছিলেন, বছরের পর বছর। তারপর একদিন চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। মেটারলিংক তাঁকে বাঁচালেন:

"আমি মেটারলিংকের এই কথাগুলি পড়লাম—'যদি তুমি কারো দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকো—তাহলে অশ্রুর দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করো।' আমি আর কখনো কাঁদিনি।"

এখন তিনি সেন্ট জোসেফিন···

মিস ম্যাকলাউডের তৃতীয় জন্ম ঘটল।

লেগেট-পরিবারের মধ্যেই তিনি রইলেন—কিন্তু এক নিজস্ব ভুবনে। মিসেস লেগেটের পাশে-পাশেই ঘুরতে লাগলেন অন্য এক মন নিয়ে।

বেটী লেগেট তাঁর ভগিনীর ভিন্ন-মনের কথা আগেই জানতেন। স্বামীজীর

সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই জো-র পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেটী দেখতেন, জো অজস্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে, প্রাণের কথা বলছে, কিন্তু তার অধিকাংশই ঈশ্বর সম্বন্ধে। জো বলতেন, মানুষ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের মূলে—"প্রভু কিভাবে ওদের মধ্যে বিকশিত হচ্ছেন, তা আবিষ্কার করা।" "আমরা সকলেই দিব্য।" বেটী অন্তরে-অন্তরে জানতেন, কথাটা সত্য, তবু ব্যাপারটা তাঁর কাছে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক মনে হয়নি। বরং প্রায়শই তা অস্বস্তিকর, বা ক্লান্তিকর। ও-প্রসঙ্গ কদাচিৎ ডিনার-পার্টিতে বাক্যের ঝলক আনে। জো-র মতে, বেটীও তা জানতেন—অমুক-অমুক ডিউক তোমার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করলেন কিনা, ফরাসী দূতাবাসের বল্-নাচে তুমি আমন্ত্রিত হলে কিনা, ছোট আকারের যে-ডিনার-নাচের ব্যবস্থা তুমি করেছ সেটি এই সিজ্নের সবচেয়ে সফল নাচ-পার্টি কি-না—এগুলো তোমার আত্মিক পরিস্থিতির ভালো-মন্দ ঘটাতে পারবে না তা সত্য, অতীব সত্য। কিন্তু বেটী অধিকন্তু জানতেন—ঐসব জিনিস তোমার সামার-সিজ্নের তৃপ্তিসুখের ক্ষেত্রে অবশ্যই হেরফের ঘটিয়ে দিতে পারে। ঐসব পার্টি, বল-নাচ, ইত্যাদি আছে বলেই তো প্যারিসের সেরা দর্জি-বাড়িতে নতুন দুর্মূল্য পোশাক অর্ডার দেবার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর পাচক নিয়োগ ও ড্রইংরুমকে যথোচিত সুদৃশ্য করার কারণও মেলে। আর ওসব না-করা হলে—পৃথিবীতে সুন্দর জিনিস থাকার প্রয়োজন কি? ওসবের পিছনে টাকা খরচ করতে না পারলে, টাকা থাকারই বা মানে কি?

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, জো পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি দিদির জীবনরীতিকে নিজের বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ নামক অবিস্মরণীয় ব্যাপার তাঁর ক্ষেত্রে সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল। রিজলি-ম্যানরে স্বামীজী—মিসেস ওলি বুল ও নিবেদিতাকে গেরুয়া দান করেন, তা জেনে মিসেস লেগেট নিবেদিতাকে বলেছিলেন—"মার্গট, আজ রাত্রে তুমি গেরুয়া পেয়েছ ঠিকই, কিন্তু জো-র জন্যই আছে মিশন।" স্বামীজীর জীবনকালের মধ্যে, যখন জো লন্ডনের সোসাইটি-জীবনের সুখ ও ঐশ্বর্যতরঙ্গে সন্তরণ করছেন, তখনি তাঁর ভিতরে মিশনারি রূপ কেউ-কেউ দেখতে পেয়েছিলেন। নিবেদিতা ১৯০০ সালের মে মাসেই লিখেছেন, "রাজ্ঞী জোসেফিন হয়েছেন সেণ্ট জোসেফিন।" স্বামীজী জো-র মিশনারি ভূমিকা নিয়ে ঈষৎ কৌতুকও করেছেন পত্রে :

"মিস ম্যাকলাউড—জাপান থেকে ভারতে আসছেন—সঙ্গে ধর্মান্তরিত জাপানীগণ। তাঁরা অবশ্যই পুরুষ, কারণ মিস ম্যাকলাউড নারী-মিশনারি।"

কিন্তু স্বয়ং বিবেকানন্দই কি দ্বার খুলে দিয়ে যান নি? আর কোন্ পাশ্চাত্য নারীকে বিবেকানন্দ মিস ম্যাকলাউডের তুল্য সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করেছেন? অন্য সকলে তাঁর মাতা বা ভগিনী, কিংবা শিষ্য—জো তাঁর সমকক্ষ। স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের স্থিরবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার প্রশস্তি করে বলেছিলেন, "জো-র

কুশলী বুদ্ধি, শান্ত কর্মক্ষমতা দেখে আমি একেবারে মোহিত। সে খাঁটি মহিলা স্টেটসম্যান। সে রাজ্য চালাতে সমর্থ। কদাচিৎ অমন দৃঢ় অথচ মঙ্গলকর সহজবুদ্ধি দেখেছি।" স্বামীজী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, "কেবল তুমিই আমার ভার বহন করতে এবং আমার সকল নিষ্ঠুর বিস্ফোরণ সহ্য করতে সমর্থ।" "তুমি আমার কাছে শুভংকরী দেবদূতী।" "সবকিছুর মোদ্দা কথা এই," স্বামীজী একবার ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে, তার চেয়ে বেশি গভীরতার সঙ্গে, বলেছিলেন, "লন্ডনে কোনো কাজই হবে না, যেহেতু তুমি এখানে নেই। তুমিই দেখছি আমার নিয়তি।"

স্বামীজী সর্বদাই মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে আশা বিশ্বাস ও সমর্থন চেয়েছেন : "সংস্কারবশেই আমার মন চারিদিকে সেই চেনা মুখখানি খুঁজছিল, যেখানে আপত্তি-অভিযোগের কোনো রেখা কখনো দেখা যায়নি, যা অম্লান অপরিবর্তিত, যা সর্বদাই উৎসাহে আনন্দে শক্তিতে ও সহায়তায় পূর্ণ।"

'ধন্য' সেই মানুষ, যাঁর বিষয়ে স্বয়ং বিবেকানন্দ বলতে পারেন,

"যীশুখ্রীস্ট তাঁর সারমন্ অন দি মাউণ্ট-এর মধ্যে কেন বলেন নি—যারা সদা আনন্দময় ও সদা সাহায্যকারী তারা ধন্য, কারণ ইতিমধ্যে তারা স্বর্গ-রাজ্য লাভ করেছে? যিনি নিজ হৃদয়ে বিশ্ববেদনা বহন করেছিলেন, যাঁর কাছে সাধুর হৃদয় শিশুর মতো, তিনি নিশ্চয় ওকথা বলেছিলেন, কিন্তু হায়, লিখে রাখা হয়নি।"

যীশুর সেই অলিখিত বাণীর প্রতিমা জো, বিবেকানন্দের বিবেচনায় বিধাতার মনোলোকের সকল সুন্দর বস্তুর সমাবেশে গঠিত—তৎসহ তাঁর চরিত্রে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে—"সর্ববিধ পবিত্রতা ও মহত্ত্ব।"

এঁকে বিবেকানন্দ নিজের সমপর্যায়ের সহকর্মী মনে করেছিলেন বলেই এঁর সাধারণ পারিবারিক জীবন আকাঙ্ক্ষা করেন নি।

"ওহে মাদ্‌মোয়াজেল, [বিবেকানন্দ লিখেছিলেন] তুমি একটা পাক্কা যাদুকরী। শরীর মনকে চাঙ্গা রাখো, চাঙ্গা রাখো। তোমার জন্য গৌরব এবং সম্মান অপেক্ষা করছে—এবং মুক্তি। বিয়ে ক'রে, পুরুষকে ধরে, উপরে ওঠাই মেয়েদের স্বাভাবিক উচ্চাশা। কিন্তু সেসব দিন গেছে। কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়াই তুমি বড় হবে—তুমি যেমন আছো সেইভাবে থেকেই—তুমি, আমাদের অনাড়ম্বর অকৃত্রিম প্রিয় চিরন্তন জো। জগন্মাতার বিধান—আমরা এক সঙ্গে কাজ করব। এতে ইতিমধ্যেই বহু লোকের কল্যাণ হয়েছে—ভবিষ্যতে আরও হবে। তাই হোক।"

জো চিরকুমারী থেকে গিয়েছিলেন।

দুই হৃদয়ের নদী…সমুদ্রগামী…

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি গুণের সমাদরের ক্ষেত্রে মাত্রা হারাতেন,

প্রশংসা বিতরণে বেহিসেবী বদান্য। সন্দেহ হতে পারে, মিস ম্যাকলাউড এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের উদারতার প্রশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু নিবেদিতা? বিচারে কঠোর, অন্তর্ভেদী মনস্বিতায় প্রখর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউড সম্পর্কে কী বলেছেন? ম্যাকলাউডের মহিমা বোধহয় আমরা সম্পূর্ণ বুঝতেই পারতুম না, নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্রাবলীতে ছড়ানো মন্তব্যগুলি না পেলে। এই সকলের মধ্য থেকে দেখতে পাই, নিবেদিতা মনে করেছিলেন, স্বামীজীর সকল শিষ্য ও বন্ধুদের মধ্যে জো-ই সবচেয়ে গভীরভাবে সত্যভাবে স্বামীজীকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। বিশ্বপটে স্বামীজীর জীবননাট্যের প্রযোজনায় জো-র ভূমিকা সম্বন্ধে নিবেদিতা সচেতন ছিলেন। একবার তাঁর বিষয়ে 'ইমপ্রেসারিও' কথাটিও নিবেদিতা ব্যবহার করেছেন।

দুই দিক থেকে জো-র ভূমিকা নিবেদিতার কাছে অবশ্যস্বীকার্য হয়ে উঠেছিল। প্রথমত জো-র বিষয়ে স্বামীজীর মনোভাব তিনি জানতেন (স্বামীজীর এ-সম্পর্কিত কিছু উক্তি উপরে তুলেছি), দ্বিতীয়ত তিনি নিজেও জো-র কাছ থেকে বহু-কিছু পেয়েছেন, চিরমূল্য সেই সকল সম্পদ।

নিবেদিতার চিঠিতেও জো-র বিষয়ে স্বামীজীর নানা উক্তি ছড়িয়ে আছে। "জো আমার শুভ তারকা," স্বামীজী বলতেন। জো-র সঙ্গে স্বামীজীর অন্য ভক্ত শিষ্যদের তুলনা করে নিবেদিতা তাঁকে লিখেছিলেন, "অপরেরা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই পরিবর্ধিত হয়েছেন, কিন্তু তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই পূর্ণ বিকশিত।" এ কথাটা স্বয়ং স্বামীজীর কাছ থেকেই নিবেদিতা শুনেছেন।

"লাঞ্চের সময়ে আমি বললাম—[নিবেদিতা লিখেছেন] 'য়ুম য়ুম (অর্থাৎ জো) বলে, সে কিছুই চায় না, কাউকে চায় না।' স্বামীজী মুখ তুলে তাকালেন, কাঁপা গলায় বললেন, 'না, সত্যই সে চায় না। ঠিকই। এই হলো জীবনের শেষ পর্ব। এর পরে আর চাওয়া নেই, শুধু দেওয়া।"

"স্বামীজী সত্য সত্যই আন্তরিকভাবে বললেন, [নিবেদিতা পুনশ্চ লিখেছেন] তুমি তাঁর আওতায় বেড়ে ওঠো নি। ওঁর ও-কথাটা সত্য। তোমার স্বভাবে এমন একটা চিরন্তনতা আছে, যাতে পরম আশ্বাসের আশ্রয় পেয়ে যাই।…এমন-কি মাতাদেবী [সারদা দেবী] পর্যন্ত বললেন, য়ুম হলো জ্ঞানী, একেবারে পুরুষের প্রকৃতি।" "স্বামীজী প্রায়ই বলেছেন, নিজের ছায়ার মতোই তুমি বিশ্বস্ত।" "তুমি প্রেমের মতোই প্রেমময়।" "স্বামীজী আরও বলেছেন, জো পবিত্রতার মতোই পবিত্র।"

নিবেদিতা শেষোক্ত কথার কথাটার ব্যাখ্যা করেছেন: "পবিত্রতা সম্বন্ধে কোনো তুচ্ছ সংজ্ঞা অনুযায়ী ও-কথাটা বলা হয় নি। তোমার মূলগত বাস্তবতার বিষয়ে মূলগত বোধ থেকেই ঐ কথাটা বলা হয়েছে।"

বিবেকানন্দ নামক 'দিব্য বালকে'র রক্ষণাবেক্ষণে মিস ম্যাকলাউডের আচ্ছাদনী ভূমিকার কথা নিবেদিতা বারে বারে বলেছেন।—"আমাদের সর্বোত্তম অবতারের রক্ষায় অবতীর্ণ দেবী তুমি।" "পিছন ফিরে তাকালে দেখি, আমাদের

সকলের মধ্যে তুমি সর্বাধিকভাবে তাঁর সমস্তরে থেকে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছ—তিনি স্বরূপত কী, তা তুমিই সর্বাধিক জেনেছ।" "তুমি তাঁর সর্বাধিক খাঁটি, ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু।" "কখনো বিচ্যুত হওনি। পূর্ণ তোমার প্রেম, তাতে ত্রুটির চিহ্নমাত্র ছিল না।"

নিবেদিতার পত্রাবলীতে দেখি, তিনি অজস্রবার মিস ম্যাকলাউডের কাছে ব্যক্তিগত ঋণ স্বীকার করেছেন। কেন? মিস ম্যাকলাউড তাঁকে বাস্তব প্রয়োজনের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন—সেই জন্য? না। নিবেদিতাকে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য করেছেন মিসেস ওলি বুল। মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে নিবেদিতার স্বভাবগত পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল, সে-বিষয়ে নিবেদিতা সচেতনও ছিলেন। "হাঁ, আমি জানি, [নিবেদিতা জো-কে লিখেছেন] নিসর্গ-প্রকৃতি তোমাকে খুশি করে না, আবার শহর আমাকে খুশি করে না। আমি এমন-সব জিনিসকে ভালবাসি যাকে তুমি হয়ত ঘৃণাই করবে।" জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিবেদিতা একটি চিঠিতে (২৫ আগস্ট, ১৯১০) উভয়ের জীবনরীতির পার্থক্যের কথা খুলে লিখেছিলেন: "তুমি যে-স্বাধীনতার মধ্যে বাস করো, তাতে সামাজিক জীবনের উপযোগী মধুরতার চর্চা করতে পারো। কিন্তু আমি জীবনের যে-সংগ্রামের মধ্যে আছি তাতে যদি তোমার পথ নিতে চাইতাম—পথ হারিয়ে যেত।" নিবেদিতা ক্রমেই স্পষ্টতর: "তুমি বোধহয় সকলকেই ভালবাসো, কিন্তু এমন বহু মানুষই আছে যাদের পরিষ্কারভাবে আমি অপছন্দ করি, এমন কি ঘৃণা করি।"

নিবেদিতা স্বীকার করলেন, "হয়ত আমি···সর্বদা ধর্মযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান ক'রে ক্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত আর বার্ধক্যপীড়িত হয়ে উঠব। কিন্তু", নিবেদিতা যোগ করলেন, "পাহাড়ের চূড়োয় বসে নীচের নদী ও অরণ্যের দৃশ্য দেখা তো সর্বদা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না—নেমে পথে চলতেই হবে—যে-দিব্যের দর্শন পেয়েছি তারই স্মরণের শক্তিতে ভর ক'রে।"

পথের পার্থক্য উভয়ের ছিল, কিন্তু মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার কাছে অবশ্যই দেবদূতী, যেহেতু স্বামীজীকে কিভাবে বরণ করতে হয়, তা ম্যাকলাউডই নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন। নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করতেন, আঘাত করতেন, স্বামীজী তাতে ঝলসে উঠতেন—কিন্তু বহুলাংশে তিনি তখন আত্ম-সচেতন। ম্যাকলাউড বুঝেছিলেন, প্রফেটকে খুঁচিয়ে জাগাবার প্রয়োজন নেই; ইনি সাধারণ কোনো মানুষ নন যে, সংঘর্ষ দ্বারা এঁর শক্তিবিকাশ ঘটাতে হবে। এঁকে স্বাধীনতা দেওয়াই শ্রেয়, তবেই এঁর অসচেতন আত্মউন্মোচনের দিব্যলীলা দর্শন করা যাবে। ইনি হাসি বা রোষ, আনন্দ বা আক্রমণ, সব নিয়ে একই মানুষ—এইটাই মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতাকে বুঝিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন,

"তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে কিভাবে স্বামীজীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে হয়—না-হলে আমি হয়ত এখনো অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছি!—প্রতিদিন তা অনুভব করি।"

"১৮৯৯—অপূর্ব ঐ বৎসর ! [নিবেদিতা লিখে চলেছেন] যতই দিন যাচ্ছে, ততই তার ধ্যান আমার মনকে অধিকার করছে। তিনি যা—তিনি তাই ছিলেন—কিন্তু তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে কিভাবে অহংকে দমন সেই মহা-গৌরবের আলোকচ্ছটাকে গ্রহণ করতে হয়। সে ঋণ অপরিশোধ্য।"

"পদে-পদে তুমি শিখিয়েছ—কিভাবে স্বামীজীকে ভালবাসতে হয়, সেই ভালবাসার বিষয়ে প্রতিমুহূর্তে বিশ্বস্ত থাকতে হয়—সে ভালবাসা বৃহৎ বস্তুর বিষয়ে যেমন তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও।"

ম্যাকলাউডের চেষ্টায় স্বামীজীকে যথার্থভাবে দর্শন করার শক্তি অর্জন ক'রে নিবেদিতা যা পেয়েছিলেন, সেই মহান প্রাপ্তির স্মৃতিকে তিনি ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভাগ ক'রে আস্বাদন করতে চেয়েছেন পরবর্তীকালে। নিরন্তর সংঘাতের জীবনের মধ্যে নিবেদিতার সেই ছিল এক মানসিক শান্তির নীড়। নিবেদিতা এই কল্পনা করে সুখ বোধ করেছেন—শহর থেকে অনেক দূরে একটি পরম মাধুর্যভরা কুটীর, যাতে আছে বারান্দা, ফুলে-ভরা বাগান, সামনে ছড়ানো বিস্তীর্ণ প্রান্তর—সেখানে মিস ম্যাকলাউড থাকবেন—তাঁর ভাণ্ডারে রয়েছে বিরাট প্রেমের ও বিরাট স্মৃতির সঞ্চয়। "তোমার সেখানে আমরা মাঝে-মাঝে যাব, তোমার পায়ের কাছে বসব, আর সেই মহাস্মৃতির পুণ্যবারিতে অবগাহন ক'রে নবজীবন লাভ করব।"

স্নিগ্ধ নিবিড় নিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন : "তোমাকে আমি নিরন্তর দেখি, নীল, হালকা নীলের আচ্ছাদনে, যেমন চোখ দুটি তোমার।··· তোমার ঐ নীল চোখ-দুটির মধ্যে যদি তাকিয়ে—শুধু তাকিয়ে থাকি—না, সেখানে কোনো তিরস্কার নেই, নেই কোনো প্রত্যাখ্যান।" নিবেদিতার কণ্ঠ শ্রদ্ধাঘন : "আমার যুম বাস্তবিক কী ?—একটি মধুর সান্নিধ্য।···তাঁর মুখটি কী ?—আশীর্বাদ। তাঁকে চেষ্টা করে দিতে হয় না—তিনি উৎসর্গীকৃতা হয়েই আছেন।"

বারে বারে নিবেদিতা স্বামীজীর মহান স্মৃতির গভীরে ডুব দিতে চেয়েছেন,

"ঝিলাম-তটের সেই দিনগুলিতে ফিরে যেতে কত-না চাই।"

ঝিলামের তটে অবস্থানের সাত বছর পরে নিবেদিতা জো-কে লিখছেন,

"আর সেই রাত্রিগুলি, যখন আমি তোমার সঙ্গে নিদ্রাঘোরে কথা বলতাম। 'আঃ ! সেই অদৃশ্য হাতের স্পর্শ—নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠের সঙ্গীত'।"

মহান বৈরাগ্যে ও অনির্বচনীয় ঔদাস্যে ঢেকে যায় তাঁর মন,

"*কিন্তু না, চলো চলো। সেই দিনগুলি যেমন চলে গেছে,* আমরাও তেমনি চলে যাব। কেবল হৃদয় ভরে থাক আকাশভরা তারকার নীচে নিদ্রিত পর্বতগাত্রের নিবিড় মৌনে।"

বিবেকানন্দে বাঁধা তাঁরা···কিন্তু তিনি যখন নেই···

শোকাগ্নির ভিতর থেকে নবরূপে আবির্ভূত মিস ম্যাকলাউড যে-নূতন পথে

চলতে শুরু করলেন, তাঁর দিদি মিসেস লেগেট কিন্তু সেই পথে চলতে ইচ্ছুক বা সমর্থ ছিলেন না। বেটীর উপর স্বামীজীর আলোক এসে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আলোকের দ্বারা কিছুটা প্রাণের প্রসাধন ক'রে নেওয়ার অতিরিক্ত কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং—যে-জীবনকে মিসেস লেগেট প্রাণপণ অধ্যবসায়ে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন, সেই জীবনের মারও তাঁকে খেতে হলো। এঁর কন্যাই সেই বিষাদঘন কাহিনী লিখে গেছেন।

মিঃ লেগেটের জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে মিসেস লেগেটের সুগভীর মনোবিচ্ছেদ ঘটেছিল।

ফ্রাঙ্ক ও বেটী পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু উভয়ের জীবনদৃষ্টি পৃথক। ফ্রাঙ্ক খাঁটি আমেরিকান, প্রাদেশিক, নিউইয়র্ককে অত্যন্ত ভালবাসেন—তার গন্ধ, শব্দ, রূপ—পরিবেশের শেষ বিন্দু পর্যন্ত। উল্টোপক্ষে বেটীর কাছে আমেরিকানরা বিদগ্ধ নয়, তারা টাকা করার জন্য খেটে মরে, আর যখন টাকা জোটে তখন জানে না কী ক'রে শিক্ষিত রুচির সঙ্গে তাকে ব্যবহার করা যায়। বেটী চেয়েছিলেন ফ্রাঙ্ককে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন, দুজনে মিলে নতুন-নতুন জগৎ আবিষ্কার করবেন, তাঁদের কাছে "জীবন হয়ে উঠবে দীর্ঘ প্রসারিত মধুচন্দ্রিমা।" বেটী ফ্রাঙ্ককে বলেছিলেন, "আমি বৃহৎ পৃথিবীর নাগরিক।"

১৮৯৫ সালে বেটীর ইচ্ছায় ধরা দিয়ে ফ্রাঙ্ক সমুদ্র পেরিয়ে প্যারিসে যান বিয়ের জন্য, গিয়েছিলেন আনন্দেই। কিন্তু তিনি সত্যকার খুশি হন যখন ১৮৯৯ সালে 'তাঁর' রিজলিতে সকলে সমবেত হয়েছিলেন। তার পর ১৯০০ সালে উৎসাহ না থাকলেও তিনি আবার প্যারিসে যান, বিশেষত বিবেকানন্দ যখন সেখানে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দ ফ্রাঙ্কের বিপরীত প্রান্তের মানুষ, তবু তাঁর প্রতি ফ্রাঙ্কের ভালবাসা ছিল প্রবল। "সফল ব্যবসায়ী ফ্রাঙ্ক, তাঁর কালের পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার মার্কামারা উৎপাদন, মধ্যবয়সী, রক্ষণশীল; আর হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বয়সে তরুণ, গতিশীল চরিত্রের, সেবার আদর্শে উৎসর্গীকৃত, সম্বলহীন—এই দুইজন বন্ধু হয়েছিলেন।" ফ্রাঙ্ক কেন বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট? দুই বিপরীত প্রান্ত যেমন স্বতঃই পরস্পরকে আকর্ষণ করে—সেই-রকম? সম্পূর্ণ তা নয়। ফ্রাঙ্ক নিজ গুণেরও চরম প্রকাশ বিবেকানন্দের মধ্যে দেখেছেন। "ফ্রাঙ্ক বলতেন, স্বামীজী আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ অন্য যে-কারো অপেক্ষা অধিক তাঁর সহজ বুদ্ধি।" কিন্তু নিছক সমাদরের মনোভাব নয়, গভীর বিস্ময়পূর্ণ সম্ভ্রমই ফ্রাঙ্কের মনকে অধিকার করে রেখেছিল। ১৮৯৬, ৬ই জানুয়ারী ফ্রাঙ্ক জো-কে লিখেছিলেন,

"এক রাত্রে রিজলিতে আমরা সকলে তাঁর [বিবেকানন্দের] অবিরাম বাণী-নিঃস্বনে একেবারে স্তম্ভিত, বাক্‌রুদ্ধ। আড়াই ঘণ্টা ধরে তিনি বলে গেলেন। তেমন চিন্তার ঐশ্বর্যপ্রকাশ আমি কোনো দেহধারী মানুষে দেখিনি। আমাদের হৃদয়ে তিনি অনপনেয় ছবি এঁকে গেছেন, যা জীবনান্ত পর্যন্ত আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনা দেবে।"

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও ফ্রাঙ্ক লিখেছিলেন, "এ-জীবনে তাঁর মতো আর কাউকে দেখব না।"

বেটীও যখন একই প্রসঙ্গে নিম্নের এই কথাগুলি লিখেছিলেন, তখন ফ্রাঙ্ক নিঃসন্দেহে তাঁর সঙ্গে একই অনুভূতিতে বাঁধা ছিলেন :

"কী অপূর্ব ! শেষ দিনটি আসছে, তার বিষয়ে তিনি পূর্ণ সচেতন, অথচ কোনো মানুষকে সে-বিষয়ে কথাটি বলা নয়—এমন জিনিস কল্পনা করতে পারো ? বিবাহ কিংবা জীবনের অন্য বড় ব্যাপারের জন্য নিজেকে সযত্নে, এমন কি সুগভীর সুগম্ভীর ভাবে প্রস্তুত করা কাকে বলে আমরা জানি—কিন্তু চরম বৃহৎ পদক্ষেপটির জন্য নিজের সমস্ত চৈতন্যকে ঘনীভূত করা—এ-জিনিস কেবল তাঁরই। কী ঘটবে—তার পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনি—ঈশ্বরের আবির্ভাব ছাড়া তিনি আর কি ?"

কিন্তু বিবেকানন্দের দ্বারা মোহিত হওয়া এক জিনিস, আর বিবেকানন্দের উন্নীত আলোকিত জগতে বাস করা, অন্য জিনিস। বেটী বা ফ্রাঙ্কের পক্ষে সে কাজ সম্ভব ছিল না। এবং এই ১৯০০ সালে প্যারিসে থাকাকালেই ফ্রাঙ্ক অনুভব করেন, পত্নীর প্রিয় সোসাইটি-জীবনও তাঁর জন্য নয়। খরচ করার মালিক তিনি, তাতে তেমন কিছু মনেও করতেন না, রসরুচি ও সৌন্দর্যের জন্য এইসব বেহিসেবী খরচ-পত্তর চললেও চলতে পারে ; "কিন্তু আমি আমার নিজের বাড়িতে অতিথি হিসাবে বাস করতে চাই না।" সুরম্য প্রাসাদ ভাড়া ক'রে পার্টির পর পার্টি—রাজবংশীয়, অভিজাতবংশীয়, এবং প্রতিভার বরপুত্রগণের মুহুর্মুহু আগমন, স্বর্ণরৌপ্যগলিত উজ্জ্বল আলোক সেখানে, অথচ সর্বকিছু হচ্ছে যাঁর অর্থে তিনি 'মিসেস লেগেটের স্বামী'—তাঁর এইমাত্র পরিচয় !!

১৯০০ সালের প্যারিসই এঁদের জীবনের বাঁক নেবার সময়। এই প্যারিস থেকেই স্বামীজী বিদায় নেবেন এঁদের কাছ থেকে—কিছু দিনের মধ্যে পৃথিবী থেকেও ; তাঁর ফলে সেই আলো সরে গেল, যা এই পরিবারকে বিচিত্রভাবে রঞ্জিত করে রেখেছিল। স্বামীজীই এই দম্পতিকে যেন যুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর বিদায়ে এঁদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের রেখাগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠল। ফ্রাঙ্ক নিউইয়র্কে ফিরে গেলেন, বেটী তাঁকে অনুসরণ করতে পারলেন না। স্বামীকে তিনি ভালবাসেন, কিন্তু সোসাইটি-জীবনের মাদকতা, তাকেও তো ত্যাগ করা যায় না। "সোসাইটি এক তৃষ্ণা-বিশেষ—অন্যান্য তৃষ্ণার মতোই চির অপরিতৃপ্ত।" "বেটীর কাছে বৃহৎ পৃথিবীর হাতছানি বাস্তব সত্য ছিল।" সর্বকিছু শ্রেষ্ঠর জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা—সেই সকলকে তিনি করায়ত্ত করতে পারবেন না কেন, যখন সঙ্গতি আছে তাঁর ? সুতরাং বেটী লণ্ডনে, প্যারিসে তাঁর ঐশ্বর্যবিকাশের দ্বারা ও আতিথ্যের দ্বারা সোসাইটি-সংবাদপত্রগুলিতে চাঞ্চল্যকর সংবাদের উৎস হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর বিষয়ে লেখা হতে লাগল :

"এতাবৎ অজ্ঞাত মিসেস লেগেট...লণ্ডন-সোসাইটিকে জয় করে ফেলেছেন—রাজা এডওয়ার্ড থেকে তাঁর সর্বশেষ কোটিপতি প্রজা পর্যন্ত।" "মিসেস

লেগেটের প্যারিসে কেনাকাটা মনোহারী কাণ্ড। ৯৩ গিনির অপেরা বক্স নিয়েছেন তিনি। কালভে তাঁর জন্য গান গাইবেন। তাঁর বল্-নাচের আসর দারুণ সফল।"

মিসেস লেগেটের ব্যক্তিগত চিঠিতে ঈষৎ অহঙ্কৃত, উৎফুল্ল সংবাদগুলি ছিটকে ছিটকে উঠতে লাগল :

"লর্ড ব্রুহাম আমার সঙ্গে সাপারের টেবিলে পৌঁছলেন ; এত সুন্দর সাপারের আয়োজন তিনি পূর্বে দেখেন নি। হিজ রয়াল হাইনেস্ দি ডিউক অব কেমব্রিজ জানতে পাঠিয়েছেন, 'আগামী বুধবার কিংবা শুক্রবার মিসেস লেগেট কি তাঁকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ করবেন ?' শুক্রবার দিন স্থির করলাম। সেখানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত সস্ত্রীক উপস্থিত থাকবেন।"

"গতকাল ব্যাডেন পাওয়েল আমাকে আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন রদ্যাঁর হুইসলার প্রদর্শনীর উদ্বোধন সময়ে উপস্থিত থাকবার জন্য। হাঁ, রদ্যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ আমাকে করা হয়েছে।···হেনরি নরম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি বানার্ড শ'-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের তোফা জমেছে।"

"হাজির হওয়ামাত্র ব্রুহামরা আমাদের দুজনকে যেন গ্রাস করে ফেললেন। অবিলম্বে নিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল ফিৎসজর্জের কাছে।···তার পর রাশিয়ার প্রিন্স রডজিউইলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। তাঁকে দেখতে তৃতীয় নেপোলিয়ানের মতো।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেটী যখন তাঁর উচ্চাশা চরিতার্থ করতে সারা পৃথিবীতে ঘুরছেন—ফ্রাঙ্ক তখন পড়ে আছেন স্বস্থানে, নিউইয়র্কে, ব্যবসা দেখছেন, পুনর্বার যেন ফিরে গেছেন ব্যাচিলর-জীবনে। এখন তাঁর ভালবাসার জন্য অবশিষ্ট রয়েছে কেবল শ্রম আর অর্থ। বেটীর জীবনে খ্যাতি জমতে লাগল, ফ্রাঙ্কের জীবনে অভিমান। তাই বলে বেটী তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন না তা নয়, খুবই ভালবাসতেন। ফ্রাঙ্ক সফল ব্যবসায়ী হলেও স্থূল নন। তাঁর শান্ত মর্যাদা—শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করে। কিন্তু কি করব, উনি যে নিজেকে নিউইয়র্কে বেঁধে রেখেছেন—সেখানে আটকে থাকবার কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তাই তো ইংলণ্ডে, ইউরোপে চলে আসি।

তা হলেও, সকল ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে বেটীর হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে—এনগেজ্মেণ্ট-বুক হাতে ধরে তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকেন—অমুক লর্ড আসবেন, অমুক ডিউকের কাছে যেতে হবে ; ঐ অপেরায় সবচেয়ে দামী আসনটি প্রতি সোমবারে আমার জন্য বুক করা আছে ; এ বছর আমার নাচের পার্টিই সবচেয়ে সফল—সবকিছু ছায়াবৎ হয়ে যায়, উচ্ছল নরনারীর দল তাদের সুন্দর সংলাপ নিয়ে অশরীরী অবাস্তব হয়ে হারিয়ে যায়, সমস্তই যেন অর্থহীন, ব্যর্থ, শূন্য—তারই ভিতর থেকে ফুটে ওঠে একটি নিঃসঙ্গ মূর্তি, যার ঋজু, দৃঢ় মর্যাদার অক্ষয় আসন বেটীর হৃদয়ে। না, না, বেটী তো তাঁকে ত্যাগ করে নি, তিনি ইচ্ছা করেছেন বলেই তো বেটী বিদেশে! তিনি কি সত্যই ইচ্ছা করেছেন?

তাঁকে কতদিন দেখিনি।—কতদিন! এবার নিশ্চয়ই ফিরে যাব—তাঁর সঙ্গছাড়া আর হব না। মানুষটি বুড়ো হয়ে পড়েছেন—ওঁর কাছাকাছি থাকা দরকার। আগামী বছর আর এখানে আসছি না, হাঁ, সকলকে বলে দেব সে-কথা।

না, মিসেস লেগেট ফিরতে পারলেন না। চাইলেই কি ফেরা যায়?

ওধারে মিঃ লেগেটের মনের অভিমান ক্রমে আক্রোশের রূপ ধরেছে। "মিঃ লেগেটের চেয়ে গভীরভাবে আর কেউ ভালবাসতে সমর্থ নয়"—স্বামীজী বলেছিলেন। সেই ভালোবাসাই শূন্যে মাথা খুঁড়ে বিষাক্ত ফণা ধরল। তিক্ত মনে তিনি অনুচিত আচরণের বিষরস ওষ্ঠে ধরলেন। তারপর একদিন—রিজলি থেকে সপ্তাহশেষে অবসর কাটিয়ে ফেরার সময়ে, পথে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন—এবং হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ে অ্যাম্বুলেন্সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। নিউইয়র্কের এক কোটিপতি ধনী যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে কেউ উপস্থিত ছিলেন না—তাঁর পত্নী এবং পত্নীর ভগিনী ও কন্যা সুদূর ইংলণ্ডে—সমাধির কালেও তাঁরা উপস্থিত হতে পারেন নি—তাঁর শবাধার বইল ব্যবসায়ের কর্মচারীরা—যে-ব্যবসাকে তিনি এত ভালবেসেছেন!!

মিঃ লেগেট কিন্তু প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি কোনো উইল করে যান নি—এবং প্রায় নিশ্চিতভাবে—ইচ্ছা করেই। এই ব্যাপারটি দারুণ সামাজিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়—সংবাদপত্রে হেড লাইনের বিষয়বস্তু হয়। উইল না থাকায়, আমেরিকার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর ১২ বছরের নাবালিকা কন্যা ফ্রান্সেস দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিকারী হয়—মিসেস লেগেট এক-তৃতীয়াংশের। উইল না থাকলেও মিসেস লেগেট অত্যন্ত ধনীই থেকে গিয়েছিলেন—কিন্তু উইল না-থাকা পত্নীর পক্ষে নিদারুণ অপমান—ওটা তাঁর সম্পর্কে স্বামীর ইচ্ছাকৃত অবহেলা। সন্দিগ্ধ পৃথিবীর সামনে মিসেস লেগেট সেই নারী হয়ে দাঁড়ালেন যিনি স্বামীর অর্থ ভোগ করেছেন কিন্তু প্রেম হারিয়েছেন।

নিবেদিতা জানতেন, মিসেস লেগেটের প্রতি প্রেমই মিঃ লেগেটের পরম জীবনসত্য, পরম মুক্তির পথ। তিনি লিখলেন, "মিসেস লেগেটের মধ্য দিয়েই মিঃ লেগেট স্বামীজীর চেতনা লাভ করেছেন। মিসেস লেগেট যথার্থই বলেছেন—স্বামীজীই মুক্তি—তিনি (মিঃ লেগেট) তা জানুন বা না-জানুন।"

মিঃ লেগেটের জীবন-প্রান্তেও নিবেদিতা দেখেছেন, স্বামীজীর প্রতি কী ভালবাসা তাঁর! মৃত্যুর বছরখানেক আগে মিঃ লেগেট নিবেদিতা-পরিকল্পিত স্বামীজীর পত্রাবলীর সংকলন ও প্রকাশনে কত-না আগ্রহ দেখিয়েছিলেন——ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশে কত-না উৎসাহিত ছিলেন। যাতে স্বামীজীর ভাবধারা উন্মোচিত হয় তার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। কি আছে জীবনের সাময়িক বিচ্যুতিতে—নিবেদিতা ভেবেছেন—"মিঃ লেগেট স্বামীজীরই জন্মে জন্মান্তরে।"

সেকথা কম সত্য নয়, হয়ত আরও ব্যাপকভাবে সত্য মিসেস লেগেট সম্বন্ধে, যাঁকে স্বামীজী মা বলে ডাকতেন। স্বামীজীর যে-স্মৃতিকে মিসেস লেগেট বহন করেছেন জীবনান্ত পর্যন্ত—তারই মর্মর প্রতিচ্ছবি তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। বেলুড়ে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরে স্থাপিত মর্মর রিলিফ-মূর্তি মিসেস লেগেটের অর্থে নির্মিত। (নিবেদিতার প্রয়াস এর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়েছিল তা আমি উদ্বোধন পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩৮৫, সংখ্যায় বিস্তারিত-ভাবে লিখেছি)। মঠের অতিথিশালাও (লেগেট-ভবন) তাই। মিসেস লেগেট ভারতে এসেছিলেন ১৯১২ সালে, স্বামীজীর স্মৃতিস্থানগুলি দেখে যাবার জন্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রথম পক্ষের কন্যা অ্যালাবার্টা ও জামাতা জর্জ মণ্টেগু (পরে আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ) এবং মিস ক্যাথারিন মার্জেসন (পরে লেডি কুশেনডন)।

আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ এই ভ্রমণের একটি স্মৃতিকথায় বলেছেন, বিয়ের পর পত্নীর মুখ থেকে স্বামীজীর গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং জ্যোতির্ময় মনের কথা অবিরাম শুনে তিনি স্বামীজীর বিষয়ে আকৃষ্ট হন—স্বামীজীর জীবনী ও রচনাবলী বিশেষভাবে পড়ে ফেলেন। ভারতের নানা জায়গায় এঁরা স্বামীজীর সম্বন্ধে বিস্ময়কর ভক্তি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। হয়ত দক্ষিণ বা উত্তর ভারতের কোনো মন্দির দেখতে গেছেন, সাধারণ ইউরোপীয় দর্শক ভেবে সমবেত মানুষেরা এঁদের বিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য কিংবা গ্রাম্য কৌতূহল দেখিয়েছে—কিন্তু যে-মুহূর্তে তারা শুনেছে, এঁরা বিবেকানন্দের পরিচিত, তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক পরিবর্তন—কাড়াকাড়ি অভ্যর্থনা তখন এঁদের জন্য। এঁরা বারাণসীতে স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শ্রীম'র সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বেলুড় মঠে দুঃখের বিষয় ব্রহ্মানন্দ অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দেখা পেয়েছিলেন শিবানন্দ ও প্রেমানন্দের। প্রেমানন্দ লর্ড স্যাণ্ডউইচকে দু'-হাতে জড়িয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন, যেন বহুদিনের হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন। এঁরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন।

"এবং আমাদের কলকাতায় অবস্থানের পরমতম ঘটনা—হোলি মাদারের দর্শন," লর্ড স্যাণ্ডউইচ লিখেছেন। "আমরা তাঁর পদধূলি নিলাম। তিনি অল্পই কথা বললেন। কিন্তু সেই মহিমান্বিত মুখের শান্ত, কিছুটা নির্লিপ্ত ভাব আমি চিরদিন স্মরণে রাখব।"

ভারতপ্রেমে বাহিত ক্রুশ···

ভারতবর্ষকে ভালবাসো।

কারণ ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের।

মিস ম্যাকলাউডের মিশনারি-পতাকার উপরে ঐ কথাগুলি লেখা ছিল।

স্বামীজীকে মিস ম্যাকলাউড একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—"আপনাকে আমি

কোন্ সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য করতে পারি ?”

স্বামীজী বলেছিলেন—“ভারতকে ভালবাসো।”

পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে মিস ম্যাকলাউডের কানে ঝংকৃত হয়েছিল একটি মন্ত্র—ভালবাসো—ভালবাসো—ভালবাসো—ভারতকে। ভারতবর্ষ অর্থাৎ বিবেকানন্দ।

যখন তিনি বাহ্যত ভারতবর্ষের জন্য কিছুই করছেন না তখনো নিবিড়ভাবে ভারতকে ভালবাসছেন।

তরুণ সন্ন্যাসী লোকেশ্বরানন্দ দেখলেন, ট্যাণ্টিন গঙ্গার ধারে যেখানে শ্রমিকরা কাজ করছে সেখানে একটা শক্ত ঝুড়িকে উপুড় করে তার উপর কুশন চাপিয়ে বসে আছেন—তন্ময় চোখে। দেখছেন।

লোকেশ্বরানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধাকে—ট্যাণ্টিন, কী করছ ?

ট্যাণ্টিন বললেন—আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসছি।

‘I am loving India.’

মিস ম্যাকলাউডের এই নব-রূপের দিকে তাকিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন,

“স্বামীজী মঠ ত্যাগ ক’রে গিয়েছিলেন—যতদিন না ১০,০০০ লোককে রামকৃষ্ণের নাম নেওয়াতে পারছি ততদিন ফিরব না, এই প্রতিজ্ঞা করে—সেই একই কাজ তুমি এখন করছ—সারা পৃথিবী ঘুরছ—আর মানুষকে স্বামীজীর নাম নেওয়াচ্ছ।”

না, নাম নেওয়ানো মানে নয় মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দ নামের হরিনাম করে বেড়াচ্ছিলেন। ওর অর্থ তিনি বিবেকানন্দের কাজ করছিলেন, বিবেকানন্দের ভাব ছড়াচ্ছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য তিনি কী করেছিলেন সে ইতিহাস কোনোদিন সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে না। কখনো-কখনো একটি-দুটি সংবাদের ঝলক পেয়ে যাই, সেই হঠাৎ-আলোয় শিউরে উঠে ভাবি—এতখানি ভালবাসার দায় আমাদেরই জন্য কেউ একজন বহন করে গিয়েছিলেন—হায়, তার কোনো সংবাদই রাখি না। তার পরেই সচেতন হয়ে চিন্তা করি—শ্রেষ্ঠ দানের এই তো রীতি—তার নিঃশব্দ সঞ্চারে সরস হয় মৃত্তিকাস্তর, সুফলা হয় ধরণী।

যেমন আমরা নিবেদিতার পত্র-মারফত জেনে ফেলি—আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার পিছনে মিস ম্যাকলাউডের অর্থ ও অন্য সাহায্য যথেষ্ট ছিল। ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনের পিছনেও তা ছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানা উচ্চ মহলে এঁর গতিবিধি ছিল বলে তার সুযোগ নিয়ে নিবেদিতার পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালানো সম্ভব হয়েছিল। আমেরিকায় পলায়িত ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য এঁর অনুকূল হস্ত প্রসারিত ছিল। (ইনি রাজনীতিতে উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু স্বামীজীর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তাঁর সাহায্য পেতেই পারে!)। ইনি গোপনে বেলুড় মঠের গেস্ট-হাউসে, এঁর বাসস্থানে, লর্ড লিটন ও দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশের আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে এই সংবাদটি চিত্তাকর্ষক। ১৯২০ সালের ২০ ডিসেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বরের দুটি চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড ঐ আলোচনার যে-বিবরণ লিখে পাঠান, তাদের মধ্যে দেশবন্ধুর রাজনীতিজ্ঞান ও দেশ-মর্যাদা-বোধের চমৎকার পরিচয় আছে। লেডি স্যাণ্ডউইচকে পাঠানো তাঁর বিবরণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে ভারতীয় কর্তৃত্ব বিষয়ে দেশবন্ধুর বক্তব্য আছে, সেই সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব। দেশবন্ধু লর্ড লিটনের ব্যক্তিগত ঔদার্যের উপর নির্ভর করতে রাজি হননি। "আমরা অনুগ্রহ চাই না, আমরা চাই কার্যকরী নীতির প্রতিষ্ঠা, যার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গঠন করতে পারব"—দেশবন্ধু বলেছিলেন। মিস ম্যাকলাউড এই সূত্রে ভাইসরয়কেও পত্র লেখেন। এবং পরে একই ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট হাউসে গিয়ে লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন, "সৌভাগ্যবশত সংবাদপত্রে কিছু বের হয়নি।"

মঠে আলোচনাকালে তিনি দেশবন্ধুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তির কথা জেনেছিলেন :

"আমি দাশের কাছে শুনলাম, তিনি প্রায়ই রামকৃষ্ণের কাছে যেতেন, এবং স্বামীজী ৪০ বছর আগে তাঁর শিক্ষক ছিলেন। স্বামীজীর অপূর্ব কণ্ঠস্বর তিনি এখনো প্রত্যক্ষ সজীবভাবে স্মরণ করতে পারেন।"

স্বামীজীর বাংলা ম্যালেরিয়ায় জর্জর—কিভাবে ম্যালেরিয়া দূর করা যায় তার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রদেশ দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত—সুষ্ঠু নদী-পরিকল্পনার দ্বারা কৃষি-উন্নয়ন করা প্রয়োজন—সেজন্য নিজের অর্থ ব্যয় করে মিশরের নদী পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইলকক্সকে এদেশে আনিয়েছিলেন। স্যার উইলিয়ম বাংলায় এসে বক্তৃতাদি করেন ও পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষের পরে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলকে এ-সম্বন্ধে মনোযোগী করতে তিনি উদ্যোগী হন।

শিক্ষাকে স্বামীজী কোন্ মূল্য দিতেন—মিস ম্যাকলাউড যথেষ্টই জানতেন। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষামূলক প্রয়াসের সহায়তায় সর্বদা এগিয়ে এসেছেন। দেওঘর 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ' রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রথম বিশুদ্ধ শিক্ষাচেষ্টা' (এর আগে টেকনিক্যাল শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা মিশন করেছিল)—তার জমিসংগ্রহের জন্য তিনি লর্ড লিটনের আনুকূল্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তারপর যখন বেলুড়ে বিদ্যামন্দির কলেজ স্থাপন ক'রে রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করল, তখন ১৯৩৯ সালে তিনি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' দিয়েছিলেন। ঐ দান তিনি করবেন—এই স্বপ্ন পোষণ করেছেন ৩৭ বছর ধরে। স্বামীজী তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত আগে বলে গিয়েছিলেন, বেলুড়কে কেন্দ্র করে একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে—বিদ্যামন্দির কলেজ তারই সূচনা। মিস ম্যাকলাউড সগৌরবে বলেছিলেন—"স্বামীজীর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিই হব প্রথম দাতা"—এবং তা তিনি হয়েছিলেন।

নিবেদিতার স্কুলে যদিও সর্বাধিক সাহায্য মিসেস ওলি বুলের—মিস

ম্যাকলাউড একেবারে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন না। পরবর্তীকালে স্কুলের পরিচালক সিস্টার ক্রিস্টিন জার্মান বংশোদ্ভব বলে স্কুলের উপর সরকারের বিষ-দৃষ্টি পড়েছিল, তখন তিনি উপর-মহলে কলকাটি নেড়ে স্কুলকে বাঁচিয়েছিলেন।

তিনি বাঁচিয়েছিলেন মূল বেলুড়-মঠকেও। বেলুড়-মঠে বিপ্লবীরা আশ্রয় পেয়েছে (অনেক বিপ্লবী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন)—এজন্য সরকারের রোষ আছড়ে পড়েছিল মঠের উপরে। জমির পাশ দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের ইয়ার্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার করেছিল। কালো ছায়া নেমে এসেছিল মঠের উপরে। সেই সর্বনাশা দিনগুলিতে মিস ম্যাকলাউড অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠেছিলেন—সর্বোচ্চ সরকারী মহলে (ভাইসরয় পর্যন্ত) ঘুরে বুঝিয়েছিলেন, এতবড় শত্রুতা ভারতবর্ষ ক্ষমা করবে না। শেষ পর্যন্ত সরকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।

দুর্গরক্ষার সাফল্যময় যুদ্ধশেষে, মিস ম্যাকলাউড লাটভবন থেকে বেরিয়ে এসে স্টিমারে চড়ে বেলুড়ে ফিরছিলেন—স্টিমারের জেটিতে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সারদানন্দ তাঁকে সহাস্যে বললেন,

'Victory to you Tantine'—তোমার জয় ট্যাণ্টিন—তোমারই জয়!

মিস ম্যাকলাউড স্বামীজীর মন্দিরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন,

'Victory to me Swami ? Victory to that piece of *Solid Rock* which is seated over there.'

আমার জয় ?—নহে। ঐ দেখো অটল অচল—জয় ওঁরই।

মিস ম্যাকলাউডের একান্ত ভালবাসার কাজ কিন্তু ছিল 'নূতন বুদ্ধ' ও তাঁর বাণীর প্রচার। বিবেকানন্দের বাণী ও বক্তৃতার প্রধান অংশ সংকলিত হতে পেরেছে জে জে গুডউইন নামক অত্যন্ত পটু এক ইংরাজ স্টেনোগ্রাফারের জন্য—যাঁর কাজের সময়ের অনেক দাম—তাঁকে নিয়োগ করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন মিস ম্যাকলাউডই (স্বামীজীর সান্নিধ্যে অল্প দিন থাকার পরে গুডউইন টাকা নিতে অস্বীকার করেন। "যদি বিবেকানন্দ তাঁর জীবন দিতে পারেন, আমি সামান্য কাজটুকুও কি তাঁর জন্য দিতে পারব না ?"—গুডউইন বলেছিলেন। গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গী হয়ে ভারতে আসেন সবকিছু ত্যাগ করে। এবং এখানেই তিনি মারা যান। স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতের জন্য ইনি প্রথম বিদেশী শহীদ।) স্বামীজী যখন উদ্বোধন পত্রিকা বের করতে ইচ্ছুক, তখন ম্যাকলাউডের টাকাতেই তার প্রেস কেনা হয়।

বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলিকে বিদেশে প্রচারের জন্য এঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। অক্লান্তভাবে তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করে সে-কাজ করেছেন। নানা ইউরোপীয় ভাষায় স্বামীজীর বই অনুবাদ করিয়েছেন নিজের টাকায়। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনী রচনার জন্য ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডারকে ডেট্রইট থেকে ভারতে পাঠানোয় এঁর হাত ছিল। স্বামীজীর প্রধান বাণীবাহী নিবেদিতার গ্রন্থপ্রচারেও এঁর অপরিসীম আগ্রহ। লিজেল রেঁম নিবেদিতার ফরাসি জীবনী রচনার সময়ে

এঁর কাছ থেকেই সবাধিক সাহায্য পেয়েছেন।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ-জীবনী 'দি ফেস অব সায়লেন্স' ('মৌনের মুখ') লেখেন প্রধানত এঁরই প্রেরণায়। ধনগোপালের গ্রন্থ পড়েই রোমা রোলাঁ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহী হন—যার পরিণতি তাঁর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিষয়ে দুই জীবনীগ্রন্থ। সেই দুটি বই রচনাতেও মিস ম্যাকলাউড অক্লান্ত সাহায্য করেছেন—তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে, এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বলে। রোলাঁর ডায়েরিতে ১৩ মে, ১৯২৭ তারিখে মিস ম্যাকলাউডের এই ছবি :

> "ভদ্রমহিলা আমেরিকান, বছর ষাট বয়স, [না, বয়স তখন ৬৯] সাদা চুল, লম্বা, রোগা, মুখে বলিরেখা, কিন্তু খুব প্রাণপূর্ণ, প্রখর বুদ্ধিমতী, মনটি উদগ্র ও কৌতূহলী, বেশ ভালো ফরাসিতে বাক্‌পটুতার সঙ্গে কথা বলেন, না-থেমে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান। তিনি ধনী, মার্জিতরুচি। দীর্ঘকাল ভারতে থেকেছেন—যাঁরা আগ্রহের যোগ্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ ঘোষ—সবাইকে সেখানে জেনেছেন। কিন্তু সর্বোপরি জেনেছেন বিবেকানন্দকে, যিনি হয়ে আছেন এঁর ধর্মবিশ্বাস ও আবেগের উৎস। বিবেকানন্দের সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিচ্ছুরিত আকর্ষণী-ক্ষমতা সম্বন্ধে এঁর বলা শেষ হতে চায় না। বিবেকানন্দের মধ্যে এক মল্লবীরের শক্তি মিশেছিল পরম মাধুর্যের সঙ্গে। তাঁর শক্ত চোয়াল, চোখে অগ্নিদ্যুতি। বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর তাঁর সাফল্যকে অর্ধেক নিশ্চিত করে দেয়। চেল্লোর মতো সুন্দর কণ্ঠস্বর, একটু গম্ভীর, মন কাড়ে, সাড়া জাগায়, (রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর থেকে খুবই পৃথক, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ওঠে খুব উঁচুতে), তা চড়ে না, কিন্তু গম্ভীর স্পন্দনে ঘর ও শ্রোতার মন তাতে গম্‌-গম্‌ করে ওঠে ; আর শ্রোতা যখন মুগ্ধ হয় তখন তিনি সেই কণ্ঠস্বরকে ধীরে ধীরে সমে নামিয়ে আনেন—সেইভাবে শ্রোতাকে টেনে নিয়ে যান মনের গভীরতম প্রদেশে।"

স্বামীজীর বাণী আলোকের মতো—স্বামীজীর রূপও তাই—উভয়কেই মিস ম্যাকলাউড সর্বত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন। বেলুড়ে স্বামীজীর সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর প্রচেষ্টার কথা বলেছি। শিল্পাচার্য হ্যাভেল স্বামীজীর ঐ রিলিফ মূর্তির বিষয়ে অবহিত ছিলেন ; এবং ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু মনে করেছিলেন, "জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ।"

এক যুগে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কারু-শিল্পী, নক্‌শাকার ও অলঙ্কার-শিল্পীরূপে খ্যাত পিয়ের লালীক্‌-কে দিয়ে মিস ম্যাকলাউড (এবং ভগিনী নিবেদিতাও) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মেডাল তৈরী করিয়েছিলেন। লালীক্‌-এর তৈরী স্বামীজীর পরিব্রাজক-রূপের ক্ষুদ্র সুন্দর স্ফটিকমূর্তি আছে—মিস ম্যাকলাউডই তা করান—এবং প্রথম সুযোগেই সেগুলি তিনি বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের মধ্যে

বিতরণ করতেন। উপহার-প্রাপ্তদের মধ্যে জর্জ বার্নাড্ শ', লর্ড লিটন, লর্ড ওয়াভেল ইত্যাদিরাও ছিলেন। লেডি ওয়াভেল স্বামীজীর মূর্তি ও বই পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন—লেডি ইসাবেল মার্জেসন ও মিস ম্যাকলাউডকে।

লর্ড লিটন লিখেছিলেন :

"বিবেকানন্দের লালীক্-কৃত ছোট্ট স্ফটিক-মূর্তিটি এখন আমার লেখার টেবিলে দাঁড় করানো রয়েছে। প্রতিদিন অপরাহ্নে তার উপর যখন অস্তসূর্যের আলো এসে পড়ে, তখন মনে হয়—ভিতর থেকে যেন পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে তাকে জ্যোতির্ময় করে তুলেছে।"

স্ফটিক-মূর্তির রহস্যকথা…

বিবেকানন্দের স্ফটিকমূর্তি. তাতে দেহাবয়ব খোদাই, আবার আলোকদ্যুতি প্রবাহিত হয় তার মধ্য দিয়ে—যা ছিলেন বিবেকানন্দ। এই মূর্তি কেউ পেয়েছে অযাচিতভাবে, আবার কেউ বহু সন্ধানে, প্রায় তপস্যা ক'রে। সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী। মৌলিক জীবনময়ী মিস ম্যাকলাউড কাহিনীর সৃষ্টি না করে পারতেন না। তেমনই একটি কাহিনী, যা প্রায় অধ্যাত্ম রহস্যনাটক দাঁড়িয়েছে, পরিবেশন করেছেন প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠের অর্ধ-বাৎসরিক ইংরাজি পত্রিকা 'সম্বিত'-র ২১ মার্চ ১৯৪০ সংখ্যায়। তাঁর অনুসরণ করে কাহিনীটি বলা যাক।

গায়িকা-শ্রেষ্ঠা এমা কালভের বান্ধবী দ্রিনেৎ ভার্দিয়ে। দুজনেরই মাতোয়ারা জীবন। একবার দুজনে সমুদ্রযাত্রায় আছেন। দ্রিনেতের উড়নচণ্ডী জীবনের দিকে তাকিয়ে কালভের কেন যেন মনে হলো—ও-জীবনে এর পরে সংকট ঘনাবে। দ্রিনেৎ-কে তিনি সতর্ক করলেন। কিছু আশ্বাসও দিলেন :

"তবে যদি সত্যই তেমন কোনো অবস্থা আসে তাহলে বিবেকানন্দের নাম নিও, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।"

"বিবেকানন্দ ? সে আবার কে ?"—দ্রিনেতের সবিস্ময় সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

কালভে বিবেকানন্দের বিষয়ে অনেক কথা বলে গেলেন—কিভাবে স্বামীজী তাঁকে আত্মনাশ থেকে রক্ষা করেছেন, এখনও তাই করছেন, কী অপূর্ব তাঁর করুণা, যা তাঁর প্রয়াণের পরেও অনুভব করি, ইত্যাদি।

কয়েক বছর কাটল। জীবনের আবর্তে ঘুরপাক খেতে-খেতে দ্রিনেতের মনে হলো, তিনি বোধহয় নরকের একেবারে তলায় নেমে গেছেন। তখন স্মরণ হলো কালভের কথা।—বিবেকানন্দ! তুমি বিবেকানন্দের আশ্রয় নিও। তাই নেব। আঘাত যখন অসহ্য কঠিন তখন দ্রিনেৎ ডাকতে লাগলেন বিবেকানন্দকে। মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসলেন। দ্রিনেতের মন জুড়ে বসলেন বিবেকানন্দ।

বিস্ময়ের কথা, দ্রিনেৎ কিন্তু এখনো জানেন না বিবেকানন্দের চেহারা কি রকম ? কালভে তাঁকে স্বামীজীর কোনো ছবি দেখাতে পারেন নি। শুধু

বলেছিলেন, তাঁর বান্ধবী মিস ম্যাকলাউড বিখ্যাত মণিকার গঁসিয়ে লালীক-কে দিয়ে বিবেকানন্দের ক্ষুদ্রাকার স্ফটিকমূর্তি তৈরি করিয়েছেন। কালভের ধারণা, প্লাস ভাঁদোম্-এর একটা দোকানে তা পাওয়া যাবে।

তাহলে তো মূর্তিটা পেতে কোনোই অসুবিধা নেই—দ্রিনেতের স্বামীর সঙ্গে ওই দোকানের মালিকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। দ্রিনেৎ সেখানে ছুটলেন। ম্যানেজার ঘাড় নাড়লেন, "উঁহু, ও-মূর্তি এখন আমাদের কাছে নেই। তবে চিন্তা করবেন না, জোগাড় করে দেব।"

কয়েকদিন কেটে যাবার পরে ম্যানেজার জানালেন, "নাহ্, প্যারিসের কোথাও পাওয়া গেল না। তবে কোপেনহেগেন বা স্টকহোম-এর দোকানে ও-জিনিস দেখেছি।"

দ্রিনেৎ তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে অর্ডার পেশ করলেন, "যে-কোনো দাম লাগুক, ওটি আমার চাই, আনিয়ে দিন অবিলম্বে।"

ওইকালে দ্রিনেতের আদুরে অস্থির স্বভাব। যেটি ধরবেন সেটি তখনি চাই। কোনো দেরী সইবে না। ম্যানেজারকে তাগিদে-তাগিদে উত্ত্যক্ত করে তুললেন—"ওই স্ফটিকমূর্তি চাই, চা-ই-ই। দামের চিন্তা নেই, যে-কোনো দাম, পরোয়া নেই।"

বৃথা চেষ্টা। ম্যানেজার জোগাড় করতে পারলেন না। তখন দ্রিনেৎ নিজে সে-কাজে নামলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, তিনি ইউরোপের সব-কটি লালীক-দোকানে ঘুরলেন, কিন্তু কোথাও ওই স্ফটিকমূর্তির দর্শন মিলল না।

শেষপর্যন্ত আর কোনো উপায় না দেখে, (এবং নিশ্চয় পত্নীর ছটফটানিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে) দ্রিনেতের স্বামী স্বয়ং লালীকের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন। লালীকের সঙ্গে দ্রিনেতের স্বামীর ব্যবসাসূত্রে জানাশোনা ছিল। লালীকও আশ্বাস দিলেন, "চিন্তা নেই, ও-বস্তু আছে, আগামীকালই তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।"

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল—লালীকের তরফে কোনো সাড়াশব্দ নেই। অবশেষে তাঁর চিঠি এল: "খুবই দুঃখিত। স্ফটিকমূর্তি বা তার ছাঁচ কোনোটাই নেই। চিলেঘরে অন্য শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে ছাঁচ রাখা ছিল। মনে হয়, ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আমার ধারণা, একটা মূর্তি আমি জোগাড় করে দিতে পারব।"

না, তিনি পারলেন না।

এই সময়ে হতাশার মধ্যেও দ্রিনেৎ হঠাৎ আলো দেখলেন। কালভের কাছে তো মূর্তিটি আছে। সে নিশ্চয় দেখাতে পারবে।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কালভের দেখা পেলেন না।

কালভে দ্রিনেৎ-কে বিবেকানন্দের রাজযোগ পড়বার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বইটার মধ্যে নিশ্চয় বিবেকানন্দের ছবি আছে। তাহলে বইটার সন্ধান করা যাক। প্যারিসের থিয়জফিক্যাল সোসাইটিতে তিনি বইটি পেলেন। হায়, তাতেও ছবি নেই। দ্রিনেৎ এখানেও ব্যর্থ।

ড্রিনেৎ স্বামীর সঙ্গে নিউইয়র্কে গেছেন। মহিলার অতি ব্যস্ত সামাজিক জীবন। ডায়েরি-ঠাসা এনগেজমেন্টের তালিকা—সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে লাঞ্চ, ডিনার, নৃত্যগীত, ফ্যাশান-শো ইত্যাদি।

ড্রিনেৎ-রা উঠেছেন রিভস্ কার্লটন হোটেলে। এক সোমবার মহিলার এমনই শরীর খারাপ লাগল যে, লাঞ্চের এনগেজমেণ্ট বাতিল করে দিতে হলো। বিকেল হয়-হয়, বিছানায় শুয়ে আছেন, টেলিফোন বাজল। বান্ধবী পাউলা উইলিয়ামসন বললেন, "তুমি তো ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী। শোনো, ভারত থেকে সদ্য এক এক মহিলা ফিরেছেন, অতীব চিত্তাকর্ষক তিনি। আগামীকাল স্যাভয় হোটেলে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে উনি ইচ্ছুক।"

"সবই তো বুঝলুম, কিন্তু আমার তখন সময় হবে কি!" ড্রিনেৎ ডায়েরির পাতা ওলটাতে লাগলেন। "আরে অবাক কাণ্ড, ঠিক ওই সময়টিতে ফাঁক আছে—পরবর্তী দু'সপ্তাহের মধ্যে কেবল ওই সময়টিই ফাঁকা!!"

পরের দিনটি সুর্যোজ্জ্বল। খাঁটি বসন্তের দিন। ড্রিনেতের শরীর এখন বেশ ঝরঝরে। "অতীব চিত্তাকর্ষক" মহিলাকে দেখা যাবে ভাবতেও ভালো লাগছে।

হতাশ, হতাশ। মহিলা মোটেই "অতীব চিত্তাকর্ষক" নন। ছোটখাট চেহারার সামান্য জীব। তবে তাঁর কথার মধ্যে একটা দরকারী বিষয় ছিল। ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ড্রিনেতের আগ্রহ আছে শুনে বললেন, "তাই যদি, তাহলে তুমি দেখা করে এসো না—গতকাল বিকেলে আমি যাঁর সঙ্গে চা-পান করেছি—মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে।"

জোসেফিন ম্যাকলাউড! শুনে ড্রিনেতের বুক ধক্ করে উঠল। ওই নাম তো কালভের মুখে শুনেছি। রাজযোগ বইয়ের একটা ফুটনোটেও ওঁর উল্লেখ আছে। উনিই তো বিবেকানন্দের স্ফটিকমূর্তি তৈরি করিয়েছেন—যার সন্ধানে এতদিন ছুটছি।

"অবশেষে পাওয়া গেল সন্ধান—আমার অর্থ বা প্রতিপত্তি এ-পর্যন্ত যা সংগ্রহ করে দিতে পারেনি। স্ফটিকমূর্তির কারয়িত্রী দেবীর সন্ধান তাহলে সত্যই মিলল!" উল্লসিত রোমাঞ্চিত ড্রিনেৎ ভাবলেন।

বার্বাজোন প্লাজা হোটেলে মিস ম্যাকলাউড আছেন। মধ্যাহ্নভোজের পরে সেখানে টেলিফোন করে কিন্তু যোগাযোগ করা গেল না—কোনো উত্তর নেই। তখন সংবাদদাত্রী ছোটখাট মহিলাটিকে এঁরা বললেন, "এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আপনি করে দিন।" তিনি বললেন, "মিস ম্যাকলাউড নিতান্ত ব্যস্ত মানুষ—লাঞ্চ, চা-পান, ডিনার, এ-সবে যোগ দিতে কেবলই বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ত হতে পারে, তবে দু'চার মিনিটের বেশি আলাপচারির সময় মিলবে না। পরে আর তাঁর পাত্তা পাওয়া যাবে না। সাক্ষাৎকারের সময় চেয়ে তাঁকে চিঠি লেখাই ভালো।"

ড্রিনেতের স্বামী বেরিয়ে গেলেন নিজের কাজে। বেলা তিনটের সময়ে তাঁরা একত্র হলেন একটা ফ্যাশান শো-তে। সন্ধ্যায় তাঁদের ডিনার নির্ধারিত হয়ে

আছে। দ্রিনেতের শরীর তেমন ভালো নয়। তাই তাঁর পক্ষে এখন হোটেলে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়াই ভালো! স্বামী কাজ সেরে সন্ধ্যার সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে ডিনারে মিলিত হবেন।

দ্রিনেৎ হোটেলে ফিরছেন। তাঁর মাথায় এখন শুধু—বিবেকানন্দ—মিস ম্যাকলাউড—কালভে। তাতেই মগ্ন তিনি। চটকা ভাঙল চলন্ত ট্রেনের কর্কশ শব্দে। তাঁর গাড়ি রেলসেতুর আগে একটা ক্রশিং-এ থেমেছে। তখনই তাঁর মাথায় খেলে গেল কথাটা—না, হোটেলে ফেরা নয়। শোফারকে বললেন, "গাড়ি ঘুরিয়ে বার্বাজোন প্লাজা হোটেলে চলো।" তাঁর বুকে তোলপাড় শব্দ। বাইরে ট্রেনের বিকট শব্দ। তার মধ্যে তিনি বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলতে লাগলেন :

"বিবেকানন্দ বিষয়ে কালভে আমাকে যা বলেছেন তা পুরো মিথ্যে হয়ে যাবে যদি আমি গত কয়েক বছর ধরে জীবনের যন্ত্রণাকঠিন পথ হাঁটবার জন্য বিবেকানন্দকে যেভাবে ডেকেছি, যেভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি, তার পরেও মিস ম্যাকলাউড হোটেলে না-থাকেন, এবং আমাকে চিনতে না-পারেন। তেমন ঘটলে আমার বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটবে তৎক্ষণাৎ।"

বার্বাজোন প্লাজা হোটেলের ডেস্ক-ক্লার্ক মিস ম্যাকলাউডের ঘরে ফোন করলেন। হ্যাঁ, মিস ম্যাকলাউড আছেন, তিনি ফোন ধরেছেন। ক্লার্ক দ্রিনেৎ-কে রিসিভার এগিয়ে দিলেন।

অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল, "কে আপনি?"

"আমার নাম শুনে কিছু বুঝবেন না। তবে আমি বিবেকানন্দের কথা শুনেছি—আর তাঁতে আমার বিশ্বাস আছে।"

"ঠিক আছে, উপরে চলে আসুন।"

আঠার তলায় মিস ম্যাকলাউডের ১৮১১ নং ঘর। এলিভেটরে চড়ে দ্রিনেৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে দরজায় টোকা দিলেন।

"ভিতরে আসুন।"

দরজা খুলে দ্রিনেৎ ঢুকলেন। তাঁর আপাদমস্তকে বিদ্যুৎশিহরণ। জানলার সামনে দীর্ঘ শীর্ণ এক দেহরেখা—বাইরের রোদ-ঝলসানো আকাশের পটে ফুটে আছে। বসন্তকালের সেন্ট্রাল পার্কের ঝলমলে একাংশও দেখা যাচ্ছে।

দু'হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, "এসো বাছা, এসো।" দ্রিনেৎ-কে তিনি জড়িয়ে ধরলেন।

জানলার কাছে একটা আরামকেদারার উপর বসে তিনি পাশে একটা ছোট টুল দেখিয়ে দ্রিনেৎ-কে বললেন, "এখানে এসে আমার কাছে বসো। তোমার যা-কিছু বলার আছে বলো।"

বড়ো শান্ত আর মধুর তাঁর কণ্ঠস্বর। স্থির চোখে দ্রিনেতের দিকে তাকিয়ে আছেন—কী গভীর অতল নীল চোখ!

দ্রিনেৎ একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে তো তাঁর কোনো পরিচয় নেই—আর···কিভাবেই-বা কথা শুরু করা যাবে···

শুরু করলেন মাদাম কালভের কথা দিয়ে। বলে গেলেন, গত কয়েক বৎসরের

জীবনের নানা ঘটনার কথা। "কিন্তু কী লজ্জা, উনি তো কোনো কথা শুনছেন না, একটা কথাও ওঁর কানে গেছে কিনা সন্দেহ! আমি নিজের একান্ত জীবনের ঘনিষ্ঠ কথাগুলো বলে যাচ্ছি এক সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে—আর তিনি সেগুলোতে কান পর্যন্ত দিচ্ছেন না !!!"

হঠাৎ নড়েচড়ে বসে মিস ম্যাকলাউড প্রশ্ন করলেন, "তুমি বিবেকানন্দের স্ফটিকমূর্তি দেখেছ?"

দ্রিনেৎ অবাক। কী বলছেন উনি! তারপর কোনোক্রমে বললেন, "আমি—মানে চেষ্টা করেছি—"

মিস ম্যাকলাউডের কানে বোধহয় সে-কথাও ঢুকল না। উঠে পড়ে বললেন, "শোনো, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ওই দ্যাখো, ঘরের কোণে আমার ট্রাঙ্ক, সুটকেশ। বেড়াবার সময়ে ওদের মধ্যে বিবেকানন্দের একটা স্ফটিকমূর্তি থাকেই। গতকাল দেখি, সুটকেশের মধ্যে একটা নয়, দুটো মূর্তি রয়েছে। দ্বিতীয়টি আছে—তো-মা-কে-ই দেবার জন্য।"

কথা শেষ করে মিস ম্যাকলাউড উঠে গিয়ে সুটকেশ খুললেন—এবং স্ফটিক-মূর্তি বার করলেন।

"ওই সেই মূর্তি যা আমার অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রয়াস আমাকে এনে দিতে পারেনি।"

দ্রিনেতের গলায় ছিল লালচে রঙের স্কার্ফ। সেটি খুলে, দু'হাতের উপরে বিছিয়ে, পরম ভক্তি ও ভালবাসায় নত হয়ে, তার উপরে গ্রহণ করলেন অমূল্য স্ফটিকমূর্তি। তারপর অসীম আনন্দে স্কার্ফ দিয়ে সেটি ঢেকে নিলেন।

মিস ম্যাকলাউড আবার দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন।

দ্রিনেৎ ভরা মনে চলে এলেন।

হে নবীনা···

মহাভারতীয় কাহিনীতে পাই, মন্দাকিনীর জলে স্নান করলে পার্থিব বার্ধক্য ঝরে গিয়ে নবজীবন পাওয়া যায়। এ সকলই আমাদের কাছে নিছক কাব্যিক কি পৌরাণিক ব্যাপার হয়ে যেত-যদি না ধরা যাক, মিস ম্যাকলাউডের মতো কোনো জীবনের কথা জানবার সুযোগ হত। মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দের জীবন-মন্দাকিনীতে নিত্যস্নায়ী।

আশি বছরের মিস ম্যাকলাউডের একটা কথাচিত্র পেয়ে গেছি গ্রীক লেখক নিকোস কাজাণ্টা-জাকিস-এর লেখায়। স্বামী চেতনানন্দ এক রচনায় ('ট্যাণ্টিনের স্মৃতিতে বিবেকানন্দ', বিশ্ববাণী, আশ্বিন ১৯৪০) কাজাণ্ট-জাকিসের 'ইংলণ্ড' নামক ভ্রমণপঞ্জী থেকে উক্ত বিবরণ উপস্থিত করেছেন।

১৯৩৮ সালে, "ধনী খেয়ালী বুদ্ধিমতী আমেরিকান মহিলা" মিস ম্যাকলাউড ধাবিত হলেন এথেন্সের দিকে, কারণ তিনি শুনেছেন সেখানে এক

মস্ত গ্রীক লেখক আছেন, ক্যাজাণ্ট-জাকিস, ফরাসি দার্শনিক আরি বের্গস্‌-র কাছে যাঁর শিক্ষা, ইউরোপের বহু মনীষী ও আন্দোলনের সঙ্গে যাঁর সংযোগ, টমাস মান প্রমুখ লেখক যাঁর প্রতিভার সমাদরকারী, যিনি 'দি অডিসি' নামে গ্রীক ভাষায় এক বৃহৎ অসাধারণ কাব্য লিখেছেন, যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। গ্রীক দেশটায় বিবেকানন্দ তেমনভাবে প্রবেশ করেন নি। ক্যাজাণ্ট-জাকিসের মতো কোনো লেখকের মস্তিষ্কে কি বিবেকানন্দকে ঢোকানো যায় না ?

এথেন্সে হাজির হয়ে মিস ম্যাকলাউডের দেখা হলো শ্রীমতী হেলেন ক্যাজাণ্ট-জাকিসের। ম্যাকলাউড তাঁকে তাড়া দিয়ে বললেন, "দ্যাখো, পাথুরে মনুমেণ্টে আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, অ্যাক্রোপোলিশ বা অন্যত্র প্রাচীন গুপ্ত সম্পদ দেখবার ইচ্ছাও নেই। আমি মানুষ দেখতে ভালবাসি। কে এই নিকোস ক্যাজাণ্ট-জাকিস—যার সঙ্গে তুমি বাস করছ ? তাকে দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল।"

তাঁদের দেখা হয়েছিল। প্রথমে এথেন্সে, তারপরে ইংলণ্ডের স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন-এ। মিস ম্যাকলাউড সেখানে শেক্সপীয়ারের কন্যা সুজানের হলস্‌ক্রফট বাড়ির মালিক। আতিথ্য নেবার জন্য ক্যাজাণ্ট-জাকিস দম্পতিকে ম্যাকলাউডের বোনঝি লেডি স্যাণ্ডউইচ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালে ওঁরা মিস ম্যাকলাউডের মুখে স্বামীজীর অনেক কথা শুনেছেন। স্বামীজীর জীবনীতে নেই এমন নতুন কথা তার মধ্যে প্রায় না থাকলেও, দু'একটি অংশের উপরে যেন নতুন আলোর ঝলক এসে পড়েছে। যথা :

> " 'লোকেরা যখন বিবেকানন্দকে অভিশাপ দিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে, [মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন]—তিনি তখন মৌন থেকেছেন, নিজেকে গভীর চিন্তায় ডুবিয়ে রেখেছেন। হঠাৎ তাঁর মুখখানি দ্যুতিতে ভরে যেত এবং মৃদুস্বরে বলে উঠতেন, 'শিব ! শিব !' মনে হতো তিনি যেন প্রার্থনা করছেন।
>
> " 'আপনি এসব মিথ্যা অপবাদের জবাব দিন', আমি বিবেকানন্দকে বলতুম, 'আপনি অন্য মানুষের মতো রেগে আত্মপক্ষ সমর্থন করুন।'
>
> "তিনি হেসে উত্তর দিতেন, 'কেন ? কিসের জন্য ? যে আঘাত করছে আর যে আঘাত পাচ্ছে—তারা কি সেই একই সত্তা নয় ? যে প্রশংসা করছে আর যে প্রশংসিত হচ্ছে—তারা কি সেই একই সত্তা নয় ? তত্ত্বমসি। আমরা সবাই এক।'
>
> "বিবেকানন্দ ছিলেন শিশুর মতো সরল, সন্তদের মতো নিষ্পাপ। তাঁর মন কখনও নোংরা অসৎ বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়েনি। তিনি আমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে হেসেছেন, ঘুরেছেন। বহু রূপসী মেয়ে তাঁর কাছে আসত। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাঁর দৃষ্টিতে কোনো দুর্বলতা ছিল না। যদি থাকত তবে আমিই প্রথম মানুষ যার নজরে তা পড়ত, কিছুতেই তা এড়াতে পারত না।"

স্বামীজী ভারতবর্ষের অনেক লোককাহিনী ওঁদের শোনাতেন। তার একটি মিস ম্যাকলাউডের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংসারের জালে বাঁধা পড়ে আছে মানুষ—যে যত সংসার-বস্তু আহার করে সে তত স্থূল হয়ে জালে আটক পড়ে যায়। ত্যাগ করলে তবে জালের ফাঁক দিয়ে মুক্তি। একবার এক ব্যাধ বহুসংখ্যক ঘুঘুপাখি ধরে এক মস্ত জালে আটকে রেখেছিল। ঘুঘুগুলো অনেক চেষ্টা করেও জালের ফাঁক দিয়ে বেরোতে পারে নি। ক্রমে তারা সে চেষ্টা ছেড়ে দিল, বিশেষত জালের মধ্যে যখন তাদের খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা ব্যাধ করে দিয়েছিল। খেয়েদেয়ে মোটাসোটা হয়ে তারা দিব্যি আরামে আলস্যে কাটাতে লাগল। ব্যাধ খাওয়াচ্ছিল—পাখিগুলো ভালো খেয়ে মাংসল হলে দর বেশি পাওয়া যাবে বলে। দলের মধ্যে একটা পাখি কিন্তু আহার ছেড়ে দিয়েছিল। ক্রমে সে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেল। এত শীর্ণ যে, জালের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়তে তার অসুবিধা হল না।

মিস ম্যাকলাউডের মুখে নিকোস শুনেছেন, "তাঁর দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় পর্যটক জীবনে তিনি যত লোকের সঙ্গে মিশেছেন তাদের মধ্যে বিবেকানন্দ এখনো অনন্য মহামানব।"

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে নতুন কথা বিশেষ না পাওয়া গেলেও ৮০ বছরের বৃদ্ধা মিস ম্যাকলাউডের অত্যন্ত সজীব এক ছবি পেয়েছি হেলেনের বর্ণনায় এবং নিকোসের লেখায়।

এথেন্সে এঁদের বাড়িতে পৌঁছেই মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন, "আমি প্রতিদিন এক একটা পৃথক ঘরে শোবো। আমার ঘরের সব দরজা খুলে দাও। আমার চারদিকে কী ঘটছে তা জানতে আমি ভালবাসি।"

এঁদের বাড়ির ছাত থেকে সারোনিক উপসাগরের নয়নমোহন দৃশ্য দেখা যেত। সারা বাড়ি ঘোরার পরে সরু সিঁড়ি বেয়ে মিস ম্যাকলাউড যখন ছাতে উঠছেন, তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করলেন হেলেন। বাধা দিয়ে ম্যাকলাউড বললেন, "তুমি আমাকে জেনেছ সবে গতকাল, তুমি ভাবো আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আর আমি আমাকে জানি আশি বছর—আমাকে সাহায্য আমিই অপরের চেয়ে ভালোভাবে করতে পারব।"

হেলেন দেখলেন, মহিলাটি ধনী হলে হবে কি, অত্যন্ত মিতব্যয়ী, প্রায় কৃপণের ধার ঘেঁষে। খাওয়ার সময়ে ডিমের সাদা অংশ ফেলে দেন না। দেশলাইয়ের একটা কাঠি মেঝেয় পড়ে থাকলেও সেটি কুড়িয়ে রাখেন। বলেন, অপচয় করো না।

নিকোসের টেবিলে রাখা ছিল এক মস্ত পাণ্ডুলিপি। এ সেই 'দি অডিসি', যার কথা শুনে মিস ম্যাকলাউড ছুটে এসেছেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে (১৯২৫-৩৮) নিকোস ওই অমর গাথা লিখেছেন তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ লাইনে। তাতে আছে, "যাত্রা, বিপর্যয়, অগ্নিকাণ্ড, স্বপ্ননগরী ধ্বংস ইত্যাদি।"

ম্যাকলাউডের অনুরোধে নিকোস তাঁর কাব্যের কাহিনী বলে গেলেন। শুনতে শুনতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি গভীর হল। ম্যাকলাউড তন্ময়। শেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, "এ বস্তু ছাপাও নি কেন?" নিকোস চুপ করে রইলেন। ম্যাকলাউড বুঝলেন। "ছাপাতে খরচ কত?"—"প্রায় ১৫০০ ডলার।"

হেলেন নৈশভোজে যাবার জন্য তাড়া দিতে এসেছেন। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "খাওয়া হবে'খন। এখন যাও দিকি আমার ঘরে—আমরা ব্যাগটা বিছানা থেকে এনে দাও।" ব্যাগ এলে তা থেকে চেক-বই বার করে তখনই তিনি ১৫০০ ডলার চেক কেটে দিলেন।

মিস ম্যাকলাউড তো আগেই শ্রীমতী ক্যাজাণ্ট-জাকিসকে বলেছেন, "এলেনি, মিতব্যয়ী হও। কখনো অপচয় করো না। বরং একটা মহান কর্মে দু'হাতে দান করো।"

শ্রীমতী হেলেন পরে মিস ম্যাকলাউডের আনুকূল্যে স্বামীজীর বাণী গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

নিকোস ক্যাজাণ্ট-জাকিসের বর্ণনায় মিস ম্যাকলাউডের ছবি এই :

"মহিলার বয়স আশির উপরে। দেহখানি সুন্দর, সুঠাম, তন্বী ও কোমল। চোখদুটি উজ্জ্বল নীলাভ। সুদৃঢ় চোয়াল ও মুখের হাসিটুকু শালীনতায় ভরা ও চিন্তাপূর্ণ। আমি কখনও প্রাণের এমন উচ্ছলতা দেখি নি। দেখবার ও শোনবার এমন অতৃপ্ত বুভুক্ষাও কখনও চোখে পড়ে নি। আর দেখি নি মানুষের এমন কালজয়ের সফলতা। মহিলাটি ঘুরেছেন একাকী ভারত থেকে ইউরোপে, ইউরোপ থেকে আমেরিকায়। [স্মর্তব্য, তখন দেশান্তরে যাত্রা সমুদ্রপথে জাহাজে]। তিনি ঘুরেছেন দ্রুত অস্থিরভাবে। তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর চোখদুটি হয়ত-বা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে, এবং তাঁর সময় কুলোবে না সব দেখবার ও জানবার। শিক্ষার প্রতি তাঁর অতৃপ্ত তৃষ্ণা, শিশুসম ক্ষুধার্ত মন, তাতে সর্বদা প্রশ্নোন্মুখতা এবং হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তি। 'Learning is my religion'—এক গাল হেসে তিনি আমাকে বললেন। তাঁর হাসির পিছনে ছিল অফুরন্ত অনির্বাণ জিগীষা।"

নিকোস দেখলেন, বিবেকানন্দ-নামক অফুরন্ত উৎস থেকে প্রাণবারি পান করার জন্যই মিস ম্যাকলাউড অতি বার্ধক্যেও সতেজ সবুজ।—

"মানবহিতৈষিণী সরলমনা এই প্রেমের দূতী থেকে বহু দূরে অবস্থিত আমার মন। কিন্তু আমি সানন্দে দেখেছি কিভাবে একটি ব্যক্তি-জীবনের স্ফুলিঙ্গ আশি বছরের উপর বিদ্যমান থাকে। দীর্ঘ আশি বছর ধরে তাঁর দেহযন্ত্রটি সদা দীপ্তিমান, তাতে মরচে ধরেনি। তাঁর দাঁত, পা, কিডনি, ব্রেন—সব দৃঢ় ও সক্রিয়। তারা কর্তব্য করে যাচ্ছে ত্রুটিহীনভাবে। তাঁর দেহযন্ত্র আহার-পানীয়-বাতাস-সূর্যতাপ প্রভৃতি বস্তু গ্রহণ করে তাদের রূপান্তরিত করছে শক্তিতে।"

গঙ্গার ধারে বিবেকানন্দের সমাধিমন্দিরের পাশে একটি বাড়িতে মিস

ম্যাকলাউড অনেক সময় থাকতেন। "একাগ্রতা অভ্যাসের জন্যই তিনি ওই বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। প্রাচ্যের ধ্যানপ্রণালী হল নিজেকে নিশ্চল করে চিন্তা-রাশিকে একটি বস্তুর উপর নিবন্ধ করা। কিন্তু ওই প্রকার ধ্যান ছিল তাঁর সক্রিয় অদম্য স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই অসাধারণ নারী তাই কর্মের দ্বারা একাগ্রতা অভ্যাস করতেন।"

আর সে কর্ম তো বিবেকানন্দকে বহন। বিবেকানন্দের কথা যখন বলতেন সে যেন কোমল মন্দ্ররবের মতো শোনাত।

"মিস ম্যাকলাউড যখন বিবেকানন্দের কথা বলছিলেন তখন তাঁর সুন্দর মুক্ত হাত দুখানি এমন শান্ত ছন্দে দুলছিল যাতে মনে হচ্ছিল যেন স্নেহভরে বায়ুকে স্পর্শ করছেন।...একটি শ্বেত গোলাপের উপর হাত বুলিয়ে মিস ম্যাকলাউড আবার শুরু করলেন...।"

ওঁর মুখে স্বামীজীর কথা শুনতে-শুনতে ক্যাজান্ট-জাকিস একটু অন্যমন হয়ে গিয়েছিলেন। তা দেখে মিস ম্যাকলাউড অল্প হেসে বলেছিলেন, "শোনো, এখনি আমি তোমার মনকে ফিরে আসতে বাধ্য করব।" এই বলে তিনি পকেট থেকে হলদে হয়ে-যাওয়া স্বামীজীর একখানি চিঠি পড়তে শুরু করলেন। স্বামীজী সে চিঠি তাঁকে লেখেন কালিফোর্নিয়া থেকে ১৮ এপ্রিল ১৯০০ ("যাই প্রভু যাই...")। দীর্ঘ পত্রটি তিনি একটানা পড়ে গেলেন। নিকোস সেটি তাঁর স্মৃতিকথায় পুরো উদ্ধৃত করেছেন। চিঠি পড়ার পরে মিস ম্যাকলাউড প্রশ্ন করেছিলেন :

"তুমি কি প্রার্থনা করো? যখন তুমি খুব খুশি বা গভীর হতাশায় মগ্ন, তখন প্রার্থনা করো কি?"

"না, কখনো প্রার্থনা করি না।"

"তুমি তখন কী করো?"

"আমি লিখি। এইভাবেই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই।"

"আমিও কখনও প্রার্থনা করি না। যখন খুব ভারাক্রান্ত তখন বেড়াতে বেরোই—গ্রামে নয়, শহরে—এবং জনগণের দিকে তাকিয়ে থাকি। অথবা এমন কিছু করি যা আমার বিবেচনায় ভালো কাজ।"

মিস ম্যাকলাউড আরও বলেছিলেন,

"অথবা এই চিঠিখানা পড়ি।"

তিন মহাদেশের ভালবাসা...একটি লকেটে...

মিস ম্যাকলাউড হয়ে দাঁড়ালেন 'প্রফেটেস্'—নারী-ঋষি।

ফ্রান্সের লেগেট জো-র এই নারী-ঋষিরূপ আঁকতে গিয়ে বলেছেন :

"বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে জো-র জগতের সবকিছু বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এর জন্য জো কোনোদিন 'ওল্ড মেড'

হলেন না। না—জো-কে ওল্ড মেড ভাবাই যায় না। তাঁর সাদা চুল, নীল চোখ এবং বাঁধা জীবনযাত্রার জন্য তাঁকে বাণীবাহী নারী-ঋষি বলেই যেন মনে হতো। ...প্যারিশ-ফ্যাশানের পোশাক-পরা এক আধুনিক নারী থেকে জো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রতধারিণী নারী—ট্যান্টিন, জয়ানন্দ, সর্বজনীন আণ্ট, পরিবারের নারী-পুরোহিত।"

আমরা জেনেছি—জো সর্বদাই ভ্রমণে থাকতেন। চলন্ত ট্রেনই ছিল তাঁর বিশ্রামাগার। ঠিকভাবে বলতে গেলে, তিনি চাকার উপর বিশ্রাম করতেন। তাঁর একটি টুপি ছিল, সেটি ট্রেনে তাঁর দিবানিদ্রার বালিশ। এবং ছিল একটি চামড়ার কোট, যার রঙ ও আকার কবে হারিয়ে গেছে। এই পোশাকে তিনি মাঝে-মাঝে তাঁর পরিবারের লোকজনদের মধ্যে হঠাৎ উদিত হতেন ব্রেকফাস্টের জন্য—হয়ত কোনো একটি ভূ-পরিক্রমা শেষে।

একটি চামড়ার থলিতে জো সর্বদাই অন্তত হাজার ডলার পরিমাণ অর্থ নানা দেশীয় মুদ্রায় ভাঙিয়ে রাখতেন—কারণ বলা তো যায় না কখন বেরিয়ে পড়তে হয়! এই অবিরাম ভ্রমণ যেন "চির অসমাপ্ত পিকনিক।" জো তাতে যোগদানের জন্য "সদা প্রস্তুত।" শনি ও রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ, তাই শুক্রবার জো টাকা তুলে রাখতেন—যদি প্রয়োজনে লাগে। পথিমধ্যে তিনি এমন কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবেনই যাকে ভারতের জন্য একটি সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কেটে দেওয়ার প্রস্তাব করা যায়—সেই ভারতবর্ষ—"যার গঙ্গাতীরে উৎসারিত হচ্ছে আলোক ও প্রজ্ঞা।" "এ সবই জীবনের অ্যাডভেঞ্চারের অংশ", জো বলতেন। "আর কিসে কি হয় কে বলতে পারে!" অন্তত জো বলতে পারেন না বা চান না। কেননা স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, "সর্বদা তোমার হৃদয়কে অনুসরণ করবে। কোনো জিনিস সম্বন্ধে তোমার প্রথম বোধ অধিকাংশক্ষেত্রে সত্য হয়ে দাঁড়ায়; কদাচিৎ তা তোমাকে বিপথে চালিত করে।"

জো-র নব বন্ধু যা-কিছু করতে এসেছেন, সব কিছুকেই জো নিজের কাজ করে নিয়েছিলেন। যেখানেই কোনো সাধুকে পাঠানো হয়েছে—সে-হোক নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ইংলন্ড, প্যারিস, বার্লিন, বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো স্থান—সেখানেই জো যথাসময়ে উদিত হন ঐসব সন্ন্যাসীদের পরামর্শ ও উৎসাহ দিতে, "ট্যান্টিনের আর একটি নূতন সন্তানরূপে" তাদের গ্রহণ করতে—কারণ নবাগত এই সাধুটি সেই তাঁর প্রতিনিধিরূপে এসেছেন যিনি "ঈশ্বরের কণ্ঠে কথা বলতেন", ৩৩নং স্ট্রিটের বাসভবনে শ্রুত যাঁর কণ্ঠস্বর জো-কে অসীমে বিস্তারিত করে দিয়েছে।

স্বামীজীর ভারতবর্ষ জো-কে কী দিয়েছিল?

পার্থিব বস্তুর মধ্যে একটি রত্নমাণিক্যের কথা আমরা অন্তত জেনেছি, যেটি জো-র কণ্ঠে ঝুলত।

রত্নপ্রাপ্তি, রত্নহারানো এবং পুনঃপ্রাপ্তির ইতিহাস মনোহর।

কাহিনীটি শুনেছিলুম পূজনীয় ভরত-মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দের)

মুখে। বেলুড়মঠে বসে তিনি মিস ম্যাকলাউডের কথা আমাদের বলছিলেন।

মহারাজ তখন কর্মীরূপে মায়াবতীতে আছেন। মিস ম্যাকলাউডও সেখানে। ওঁকে মহারাজরা 'ট্যাণ্টিন' বলতেন। একদিন উনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো দ্রুতপদে এসে বললেন: "ভরত! ভরত! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—আমার লকেট হারিয়ে গেছে। ওর মধ্যে স্বামীজীর মাথার কেশ ছিল। কি হবে ভরত? ও লকেট আমার চাই-ই। যেভাবে হোক, ওটি খুঁজে বার করো।"

ভরত-মহারাজ দেখলেন, বৃদ্ধা কেঁদে-কেটে অস্থির। তাঁকে নানা কথায় আশ্বস্ত করার পরে, অদ্বৈত আশ্রমের সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। বৃদ্ধার ধারণা হলো, কেউ ওটি চুরি করেছে। তিনি পুলিশের নীচুমহলে এবং ওপরমহলে খবর পাঠাতে লাগলেন। পুলিশের ওপর-মহলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তাছাড়া তখন বৃটিশ আমল এবং তিনি মেমসাহেব। ফলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল।

অবস্থা দেখে ভরত-মহারাজ খুব কড়া গলায় তাঁকে বললেন: "ট্যাণ্টিন, এ কী কাণ্ড বাধাচ্ছো তুমি? তোমার প্রিয় জিনিস হারিয়েছে ঠিকই। তাই বলে এইসব গরীব পাহাড়ী লোকদের উত্ত্যক্ত করবার ব্যবস্থা করবে? এরা নিরীহ, সরল। পুলিশ এদের অকারণে নাজেহাল করবে।"

মিস ম্যাকলাউড বুঝলেন। তারপর ভরত-মহারাজের দুটি হাত ধরে অতি কাতরস্বরে বললেন: "ভরত, ও-জিনিস আমার সর্বস্ব। ওই প্রাণের জিনিসটিকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে—সে একমাত্র তুমি। ভালো করে খুঁজে দেখো।"

বৃদ্ধা প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বেলুড়-মঠে ফিরে গেলেন। ভরত-মহারাজ অনেক সন্ধান করলেন, কিন্তু হদিশ মিলল না।

কয়েক মাস পরে, একদিন এক পাহাড়ী কুলি, অদ্বৈত আশ্রমে সে কাজকর্ম করে—হাতে হারের মতো কী-একটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসে হাজির। বলল: "মহারাজ, এটি রাস্তার ধারে পড়েছিল। দেখুন তো, এখানকার কারো জিনিস কিনা?"

মহারাজ দেখে চমকে উঠলেন। আরে, এ-যে ট্যাণ্টিনের হারানো লকেট। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এটা পেলি কি করে?" সে বলল, রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দ্যাখে, কী-একটা চিক্‌চিক্ করছে। পাতায় আর মাটিতে বাকি অংশ ঢাকা ছিল। মাটি সরিয়ে সে সেটি পেয়ে গেছে।

মহারাজ বুঝলেন, রাস্তায় হাঁটবার সময়ে মিস ম্যাকলাউডের গলা থেকে খুলে সেটি পড়ে গিয়েছিল লতাপাতার মধ্যে। পরে ধুলোয় চাপা পড়ে যায়। বর্ষার সময়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় সেটিকে কুলি দেখতে পেয়েছে।

মহারাজ তখনি টেলিগ্রাম করে মিস ম্যাকলাউডকে শুভসংবাদ জানিয়ে দিলেন। উল্লসিত মিস ম্যাকলাউড ফিরতি টেলিগ্রামে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আবিষ্কারক কুলিকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা বলে পাঠালেন।

ভরত-মহারাজ কুলিকে ডেকে পাঠালেন!

ভরত-মহারাজ—ওরে, মেমসাহেব খুশি হয়ে তোকে ২০০ টাকা দিতে

বলেছে। এই নে।

কুলি—আমি নেব কেন ?

মহারাজ—তুই মেমসাহেবের সাধের জিনিস খ‍ুঁজে দিয়েছিস, তাই বকশিস দিয়েছেন।

কুলি—ওটা দেখতে পেয়েছি, তাই এনে দিয়েছি। তার জন্য টাকা নেব কেন ? জিনিস খ‍ুঁজে এনে দিলে কেউ টাকা নেয় ব‍ুঝি ?

মহারাজ—মেমসাহেব ভালবেসে দিয়েছে, নিবি না কেন ?

কুলি—না, নেব না।

অনেক চাপাচাপি সাধাসাধির পরে কুলি শেষ পর্যন্ত ২২ টাকা নিতে রাজি হল। জমি না বাড়ি, কি একটা ব্যাপারে তার ওই টাকা দেনা হয়েছিল।

লকেটটি অলঙ্কারমাত্র ছিল না। তার পিছনের ইতিহাস গভীর ভাবে ও অর্থে প‍ূর্ণ। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে শ‍ুনে সে কাহিনী বলেছেন তাঁর বোনঝি ফ্রান্সেস লেগেট। কাহিনী এই :

স্বামীজীর সময়ের কথা। মিস ম্যাকলাউড বোম্বাই-এ আছেন। একদিন দ‍ুটি তর‍ুণ হিন্দ‍ু ছেলে এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের একজনের ঘড়ির চেনে ঝ‍ুলছিল একটি নীলকান্ত মণি। বড়ো চমৎকার সেটি।

মিস ম্যাকলাউড বললেন, "আহা, কী স‍ুন্দর রঙ।"

ছেলেটি তখনি বলল, "আপনি এটি নিন না !"

মিস ম্যাকলাউড একট‍ু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "সে কি, নেব কেন ? না না, মোটেই নেব না।"

পরদিন সেই ছেলেটি একলা এল। একেবারে ধরে পড়ল, "এটি আপনাকে নিতেই হবে।" মিস ম্যাকলাউড প‍ূর্ববৎ গররাজি।

মিস ম্যাকলাউড—কি বলছ ? অমন দামী জিনিসটা নিয়ে নেব ? কেন নেব বলো ?

ছেলেটি—আপনি আমাদের দেশের মান‍ুষকে ভালবাসেন ; তাই এই শ্রদ্ধার নিবেদন। আপনি নেবেন না ?

মিস ম্যাকলাউড নিলেন।

পরদিন ছেলেটির বন্ধ‍ু এল। সে বলল, "জানেন, আপনাকে আমার বন্ধ‍ু যা দিয়ে গেছে, তাই ছিল তার শেষ সম্পদ।"

মিস ম্যাকলাউড আর কখনো দ‍ুই বন্ধ‍ুর কোনো একজনেরও দেখা পাননি।

এই ঘটনার সাত বছর পরে নিউইয়র্কে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ম‍ঁসিয়ে লালীক-এর দেখা হয়। লালীক সেকালে ফ্রান্সে এবং ইউরোপে প্রখ্যাত কার‍ুশিল্পী ও মণিকার। শিল্পের বিশ্বকোষে গ‍ুর‍ুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন, এমন শিল্পী তিনি। লালীককে মিস ম্যাকলাউড রত্নটি দেখিয়ে তার প্রাপ্তির চমকপ্রদ ইতিহাস বললেন। তারপর অন‍ুরোধ করলেন—ওই মণিটি দিয়ে একটি

রেলিকুয়্যারি (সাধুদের দেহাবশেষ বা পবিত্র বস্তুর আধার) তৈরি করে দেবার জন্য। মণিটি নিয়ে গিয়ে মঁসিয়ে লালীক এক বছর পরে লকেটটি তৈরি করে দিলেন।

অসাধারণ সেই সৃষ্টি। মহাবিশ্বের হৃদয়-রূপ যেন সেটি। আবছা নীল কাঁচে ফুটে আছেন দুই দেবদূত ; অর্ধস্বচ্ছ অস্থিযুক্ত তাঁদের পক্ষ ; স্ফটিকের মেঘের উপরে নতজানু হয়ে তাঁরা হাতে ধরে আছেন আলোক-বিচ্ছুরিত নীলকান্ত মণিটিকে। অপরূপ।

লকেট পেয়ে মিস ম্যাকলাউডের আনন্দের সীমা নেই। বার বার কৃতজ্ঞতা জানালেন।

মিস ম্যাকলাউড—মঁসিয়ে লালীক, এই শিল্পকর্মটির জন্য আপনাকে পারিশ্রমিক হিসাবে কী দিতে হবে ?

মঁ লালীক—কিছু দিতে হবে না ; এটি আপনাকে আমার উপহার।

মিস ম্যাকলাউড—উপহার ? কেন, কী কারণে ?

মঁ লালীক—কারণ, আপনি আমাদের দেশের মানুষদের—ফরাসিদের—এত ভালবাসেন।

তিন মহাদেশ মিলিত হল একটি রত্নে—এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ। ভারতের এক অজ্ঞাতনামা যুবক, আমেরিকার মিস ম্যাকলাউড এবং ফ্রান্সের মঁসিয়ে লালীক।

কে মিলিয়ে দিলেন ?

বিবেকানন্দ।

তিনি ভারতের এবং বিশ্বের। এবং মহাবিশ্বের। তাই তাঁর স্মৃতিচিহ্নভরা লকেটটিতে দেখা গেছে মহাবিশ্ব-ছবি—সেখানে অসীম প্রেমের নীলকান্ত রত্নকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে আছেন—দুই দেবদূত।

মিস ম্যাকলাউডের যাত্রাও তাই চিরন্তন। রত্নলাভ তাঁর ভবিতব্য। পৃথিবীর অনেক রত্নই তাঁর আশপাশে এসে জুটেছিল—কোনোটাই মনঃপূত হয়নি। অবশেষে তিনি পেলেন—সেই অনন্য রত্নটি—যার জন্ম সুদূর গঙ্গার তীরে। রত্নটিতে বিশ্বভুবনভরা।

এহেন সম্পদ নিয়ে একান্তে বন্দ হয়ে থাকার চরিত্র তিনি নন। “শোনো শোনো সুরলোকবাসী, অমৃতের যে আছো সন্তান, জানিয়াছি সেই অবিনাশী, জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান।” সুরলোকবাসী নিয়ে আবার ওঁর ব্যস্ততা ছিল না। আগে অধিকার করতে হবে নরলোকবাসীদের।

মিস ম্যাকলাউডের কাজ দাঁড়াল—এক আশ্চর্য রত্নজ্যোতির বার্তা নিয়ে, ‘শোনো শোনো’ বার্তা কণ্ঠে তুলে, সারা বিশ্বে ছুটে বেড়ানো।

তাঁর ওই উধাও জীবনে নীলকান্তমণির লকেটটিকে, মিস ম্যাকলাউডের কাছে যা বিবেকানন্দ-প্রতীক, রেখে যাবেন কোথায় ?

নিবেদিতা সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর তিনিই দিয়েছেন।

৪ঠা জুলাই ওঁদের জীবনে মহাদিন—১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই মর্ত্যজীবন থেকে স্বামীজীর মহামুক্তির দিন। তার দুই বৎসর পরে ১৯০৪-এর ৪ঠা জুলাই নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

> "এই সেই রাত্রি—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মহারাত্রি। 'এ এমন রাত্রি যাকে প্রাণমন দিয়ে স্মরণ করবেন ঈশ্বরের যত সন্তান আছেন এই পৃথিবীতে—সকলেই।' ক্রিস্টিন এখন একলা বসে আছে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে একেবারে নিঃশেষিত, ছাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, আর আমি লেখার টেবিলে, কেবল ভাবছি, ভেবে চলেছি। আমার চিন্তা তোমারই দিকে ধেয়ে চলেছে—সমুদ্রপথে তুমিও হয়ত একলাই রয়েছ।"

তারপর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের লকেট-প্রসঙ্গ আনলেন। তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট নয়, লকেটটি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে কিনা। তবে লকেটের রেখাচিত্র তাঁর কাছে এসে গিয়েছিল—এবং সেটি যে কণ্ঠে ধারণ করা হবে, এই সংবাদও। নম্র-নত কণ্ঠে নিবেদিতা লিখলেন :

> "মিস স্টাম-এর আঁকা তোমার রেলিকোয়্যারির ছবি আজ এসেছে। কী অপূর্ব সুন্দর! কী রহস্যময়! কী শান্ত মৌন! মঁসিয়ে লালীক যে-ভাবে প্রতীকের ভাষায় চিন্তা করতে পারেন, দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু একটা কথা বলি, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতুম তাহলে ও-বস্তু কণ্ঠে ধারণ করতে পারতুম না। দেওয়ালের কোনো একটি জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে ওটিকে স্থাপন করে, নতজানু হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। কিন্তু তোমার পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। তুমি যে যাযাবর পাখি। তোমার পক্ষে ওটিকে স্থাপন করার একটি স্থানই আছে—তোমার হৃদয়।"

এত স্মৃতির ঐশ্বর্য যাঁর···তিনি কেন···

ফ্রান্সের লেগেট তাঁর গ্রন্থে তাঁদের পরিবারের কাহিনী বলতে গিয়ে একটা বড়ো অংশে জো-র কথাই বলেছেন। সেই সঙ্গে স্বামীজী কিভাবে এই পরিবারের প্রতিটি মানুষকে বহু বৎসর আচ্ছন্ন করে আছেন, সেই কথাও। বলেছেন—তাঁদের পরিবারের সর্বত্র স্বামীজীর চিহ্ন ছড়ানো। জো-ই এ-সকলের মূলে। স্বামীজীর বিরাট রঙিন পোস্টারটি (যেটি টেলরের মৃত্যুশয্যার উপরে টাঙানো ছিল?)—রিজলির সেই চেয়ারটি, যার উপরে বসে প্রফেট মহাশক্তির বাণী উচ্চারণ করতেন—স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনের বাড়িতে অ্যালাবাস্টারে তৈরি

স্বামীজীর মূর্তি—গেরুয়ায় বাঁধা স্বামীজীর রচনাবলী—লালীক্-এর করা স্বামীজীর অজস্র স্ফটিক মূর্তি।

এবং স্বামীজীর মুখে জো শুনেছেন এমন সব অপূর্ব কথা ও কাহিনী কিংবা স্বামীজীকে যেভাবে তিনি দেখেছেন তেমন ছবি।—

…স্বামীজী বলে চললেন, 'তখন সবে সন্ন্যাসজীবনে পদার্পণ করেছি… হঠাৎ চোখের সামনে খুলে গেল, সিন্ধুনদের তীরে আমি। দেখি, বিশাল নদীর তীরে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। অন্ধকার তাঁর উপরে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো এসে পড়ছে। তিনি ঋগ্‌বেদ থেকে স্তোত্রগান করে যাচ্ছেন…আমি শুনছি…। তারপর সহজ অবস্থা ফিরে পেয়ে সেই স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলাম—সেই সুরে—বহু প্রাচীনকালে আমরা যা ব্যবহার করতাম'…

…বেলুড়ে গঙ্গার ধারে সহসা ঝড় এল ধেয়ে, চতুর্দিক অন্ধকার, শুরু হয়ে গেল বজ্র বিদ্যুৎ ও মুষলধারে বৃষ্টি…আমরা গাছতলা থেকে দ্রুত চলে এসেছি ছোট বারান্দায়, বাইরে চলেছে ঝড়ের মাতামাতি, ভিতরে গভীরতর অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মাত্র একজনই, পায়চারি করছিলেন বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে…নাটকের বিষয়বস্তু, মানুষের ঈশ্বরপ্রেম। তার ভাব তরঙ্গে-তরঙ্গে আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাদের…ঈশ্বরের প্রতি উদ্বেল প্রেমের অগ্নি…যাকে নির্বাপণ করতে পারে না বিপুল জলরাশি, কিংবা প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু। জড়ে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন নরদেবতা, তাঁর চরণে নত হয়েছিল সকলে…

…কলকাতায় মাতাদেবী সারদার গৃহে তাঁকে দেখেছিলাম একদিন…কী ভয়ানকের ছায়াপাত তাঁর বিশাল নয়নে। রাজনৈতিক আকাশ দুর্যোগে সমাচ্ছন্ন …থমথম করছে চতুর্দিক…প্রতি রাত্রে আরক্ত কুয়াশা চাঁদকে ঘিরে…সকলের কাছে মহা অশুভের সূচক। প্লেগের সূচনা হয়েছে…দাঙ্গা-হাঙ্গামা…আতঙ্কে পাগল হাজার হাজার মানুষ। স্বামীজীর কণ্ঠে প্রলয়ের ব্যঞ্জনা, 'মা-কালীর অস্তিত্ব নিয়ে কেউ-কেউ ব্যঙ্গ করে…ঐ দ্যাখো-দ্যাখো, মা আবির্ভূত…ভয়ে মানুষ দিশাহারা…মৃত্যুর মোকাবিলায় ডাক পড়েছে সৈনিকদের। কে বলতে পারে, ভগবান শুভের মতো অশুভের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেন কিনা? কেবল হিন্দুই তাঁকে অশুভরূপে পূজা করতে সাহস করে'…

…স্বামীজী বলছিলেন, 'যারা কর্মী, ভাবের উচ্ছ্বাস তাদের কর্মশক্তি নষ্ট করে দেয়, সেজন্য তাদের কাছে উমা মহেশ্বর ভিন্ন আর কোনো দেবদেবীর কথা বলি না। তবু রাধা কৃষ্ণ…ভগবানের প্রতি উন্দাম প্রেম…সেই পাগল-করা ভালবাসা…কি অপরূপ!' তিনি গাইতে লাগলেন তাঁর বন্ধু নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের গান…'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী, / প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, / করে মোহন বাঁশরী, / বাঁশী বলচে রে সদাই, / প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই, /

কারু যেতে মানা নাই! / ডাকছে বাঁশী, আয় পিয়াসী, জয় রাধে নাম গান করে।' ...তিনি পারসিক কবিতার আলোচনা করছিলেন...'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরখন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত'—আবৃত্তি করতে-করতে উৎসাহে বলে উঠলেন, 'দ্যাখো, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝতে পারে না, তার কানাকড়ি মূল্যও আমার কাছে নেই'...

...স্বামীজী বলে চললেন, 'বুদ্ধ! বুদ্ধ! নিশ্চয়ই তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। নিজের জন্য একটি নিঃশ্বাসও তিনি নেন নি। তিনি কখনো পূজা চান নি।...তিনি পতিতা অম্বপালীর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। নিজের প্রাণনাশ হবে জেনেও অচ্ছুতের ঘরে ভোজন করেছিলেন; তারপর মৃত্যুশয্যা থেকে তাকে বলে পাঠালেন—ধন্যবাদ তোমাকে, তুমি আমার মহা-পরিনির্বাণের নিমিত্ত হলে। বোধিলাভের পূর্বেও তাঁর কী প্রেম আর করুণা—নিজে রাজপুত্র, এবং সন্ন্যাসী হয়েও একটা ছাগশিশুর প্রাণের জন্য রাজার কাছে নিজের মাথা পর্যন্ত বলি দিতে চেয়েছিলেন।...তিনি—বুদ্ধ—আমার ঘরে এসেছিলেন—যখন বালক আমি। আমি তাঁর পাদমূলে লুটিয়ে পড়েছিলুম—বুঝেছিলাম, স্বয়ং প্রভুই এসেছেন'...

...হিমালয়ে সদ্য সূর্যোদয় হয়েছে। ঊষার অরুণ আলোয় রঞ্জিত চির-তুষারপুঞ্জ। উমা ও মহেশ্বরের কথা বলতে-বলতে স্বামীজী আঙুল তুলে দেখালেন—'ঐ যে ঊর্ধ্বে শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরিশিখর—ঐ হল শিব। আর ওঁর উপরে যে-আলোকবর্ষণ হয়েছে—উনি উমা, জগন্মাতা। ঈশ্বরই জগৎ। বলা হয়, তিনি জগতের অন্তর্গত বা বাহিরে অবস্থিত—না, তিনি তা নন; আবার জগৎও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নয়। না—ঈশ্বরই জগৎ, যা-কিছু আছে সবই ঈশ্বর'...

...স্বামীজী সেদিন নাজারেথের যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে বলছিলেন। অমন বক্তৃতা কখনো শুনিনি। বক্তৃতার সময়ে, মনে হলো, তাঁর আপাদমস্তক আলোয় ভরা। একেবারে স্পষ্ট জ্যোতি। আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়লাম যে, বক্তৃতাশেষে যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করি নি, পাছে যে-বিরাট চিন্তায় তিনি নিমগ্ন তা ব্যাহত হয়। হঠাৎ স্বামীজী আমার দিকে ফিরে বললেন—'এইবার বুঝেছি, কি ক'রে ওটা হয়!' আমি বললাম—'কি হয়?' স্বামীজী বললেন—'বুঝলে না, মুলিগাটানি স্যুপ—কিভাবে তা বানায় বুঝতে পেরেছি। ওরা ঐ স্যুপের মধ্যে 'বে'পাতা দিয়ে দেয়—বুঝলে?'...

...স্বামীজী নিউইয়র্কে আমাদের অতিথি। একদিন কি-একটা কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে একেবারে চুপ, ভাবনায় মগ্ন, কয়েক ঘণ্টা মুখে কথা নেই। শেষে থাকতে না পেরে আমি বলেছি, স্বামীজী, কিছু ঘটেছে কি? কী হয়েছে

আপনার ? এত চুপচাপ ! তিনি তখন বললেন, 'আজ একটা এমন দৃশ্য দেখেছি যা কেবল আমেরিকাতেই দেখা সম্ভব। আমি ট্রাম গাড়িতে আসছিলাম। আমার একদিকে বসেছে হেলেন, অন্য দিকে কে জানো ? একটি নিগ্রো ধোপানি, তার কোলের উপরে চাপানো কাচা কাপড়ের ডাঁই। এ জিনিস আমেরিকা ছাড়া কোথাও সম্ভব নয়।…হ্যাঁ, তোমরা হলে সত্যকারের 'সক্রিয় বৈদান্তিক', তোমরা যখন কোনো কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করো সেটাকে কাজে পরিণত করো, কেবল তার স্বপ্ন দ্যাখো না'…

…স্বামীজী অস্থির…ছটফট করে বলছিলেন, 'তুমি আমেরিকা ! তাহলে তুমিও একই চরিত্রের !!' আমেরিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর শেষ অভিজ্ঞতা যন্ত্রণা-দায়ক।…ধনতন্ত্র, শোষণ…পীড়ন…। 'না, আমেরিকা জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না…সমাধান আসবে হয়ত চীন বা রাশিয়া থেকে…কে জানে কোথা থেকে'…

…নৈনিতালের রাস্তা দিয়ে সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়ে স্বামীজী চলেছেন …শত শত লোক সমবেত…স্বামীজী এগোচ্ছেন, আর সামনে তারা চলেছে ফুল পাতা ছড়াতে ছড়াতে…যীশুখ্রীস্ট যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন তখন তো ঠিক এই রকমই করা হয়েছিল…তাহলে এটা প্রাচ্য রীতি…

…১৮৯৫ সালে আমি আর আমার দিদি আছি একটি হোটেলে ; মিঃ লেগেটের সঙ্গে স্বামীজী অন্য হোটেলে। মিঃ লেগেটের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত লোকটি স্বামীজীকে সর্বদাই রাজা-মহাশয় বলত। স্বামীজী প্রতিবাদ করতেন, 'আরে আমি মোটেই রাজা নই, আমি হিন্দু সন্ন্যাসী।' লোকটি নিজের ধারণায় অটল। 'আপনি নিজের সম্বন্ধে ওকথা বলতে চান বলুন, কিন্তু আমি রাজ-রাজড়া অনেক ঘেঁটেছি, রাজা দেখলেই আমি চিনতে পারি।' লোকে স্বামীজীর মর্যাদাময় রূপের উল্লেখ করলে তিনি আর কি করবেন, অগত্যা বলতেন, 'ও ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই—রয়েছে কেবল আমার চলাফেরার ভঙ্গির মধ্যে'…

…স্বামীজী ভারতে আছেন। দুজন মিশনারিকে পাঠানো হয়েছে তাঁর প্রভাব ধ্বংস করতে। তাঁরা একবার মুখোমুখি স্বামীজীকে যাচাই করে নিতে চান। স্বামীজীর সন্ধানে এলেন। স্বামীজী তখন ভিতরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যানশেষে যখন বেরিয়ে এলেন— তাঁর সর্বাঙ্গে এমন আলোকদ্যুতি যে, এঁরা স্তম্ভিত। অভিভূত মিশনারিরা বললেন, "সত্যের সন্ধান কোথায় পাবো ?" স্বামীজী বললেন, "সত্য তো আপনাদের মধ্যে সদা বর্তমান।" তাঁরা স্বামীজীর শিষ্য হয়ে গেলেন…

…আমেরিকায় স্বামীজী ক্যাম্প পার্সিতে আছেন। একদিন সকালে খুব স্ফূর্তির ভাবে দিদিকে বললেন, 'মাদার, খুব ভালো করে ব্রেকফাস্ট বানাবে, আমি বাগানে একটু ঘুরে আসছি।' তারপর অনেকক্ষণ হয়ে গেল, স্বামীজী আর ফেরেন না। দিদি বাগানে তাঁর সন্ধানে গেলেন। একটু পরেই দৌড়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন—'স্বামীজী আর নেই, স্বামীজী মারা গেছেন।' কি হয়েছে, কি হয়েছে, বলে আমরা দিদি যেদিক থেকে এসেছেন সেদিকে ছুটলুম। গিয়ে দেখি, একটা বিরাট গাছের তলায় স্বামীজী বসে আছেন। চোখ বন্ধ, একেবারে নিস্পন্দ, শ্বাস-প্রশ্বাস নেই, বুকের কাছে জামাটা অনেকখানি ভিজে আছে। দিদি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মিঃ লেগেট স্থির দাঁড়িয়ে, তাঁর চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে। মিঃ লেগেট এরপর স্বামীজীকে পরীক্ষা করবার জন্য এগিয়ে গেলেন—আমি চেঁচিয়ে বারণ করলুম। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন—'যদি ধ্যানের সময়ে আমার ঐ ধরনের অবস্থা হয়, ভয় পেয়ো না, আর ঐ অবস্থায় আমাকে ছুঁয়ো না। ভয় নেই, আমি তোমাদের দেশে মরব না।' এইভাবে কিছুক্ষণ কেটেছে। হঠাৎ স্বামীজীর সমস্ত শরীর নড়ে উঠল—একটা মস্ত শ্বাস ফেললেন—তারপর ধীরে চোখ মেললেন। ভালো করে চোখ খুলে দেখেন—আমরা সকলে সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা তিনি বুঝে নিলেন, একটু অস্বস্তিতে বললেন, 'আমি দুঃখিত'—তারপরেই খাড়া দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল গলায় দিদিকে বললেন, 'মাদার, চলুন চলুন, উঃ খিদেয় মরে গেলুম—আচ্ছা করে খাওয়াতে হবে কিন্তু'…

…মৃত্যু! মৃত্যুর কথায় স্বামীজী হাসতেন, ভারি খুশি হতেন। কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর ধারে গোধূলিবেলায় স্বামীজী হঠাৎ দু'টুকরো পাথর হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'সুস্থ অবস্থায় আমার মন এটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে, মনে হতে পারে আমার সংকল্পের জোর কমে গেছে, কিন্তু যেই কিছু যন্ত্রণা এল, অসুখ এল, ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হলাম, অমনি'—স্বামীজী হাতের দু'খানি পাথরকে সজোরে ঠুকলেন—'ঠিক এইরকম শক্ত হয়ে যাই, কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি'…

…এক সন্ধ্যায় স্বামীজীর ভাষণ যেন অলৌকিক হয়ে উঠেছিল। কথা বলতে-বলতে তাঁর স্বর মৃদু থেকে মৃদুতর—মৃদুতম হয়ে এসেছিল—যেন এক অতি দূর অপরিচিত স্বর কোনো এক অজ্ঞাত বেদনার চেতনায় শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলেছিল—বক্তৃতা-শেষে চলে যাবার আগে তারা বক্তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেও ভুলে গিয়েছিল—

দিদি পাশের ঘরে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন। একি—কাঁদছে কে?

অজ্ঞেয়বাদী একটি মহিলা কাঁদছিলেন—তাঁর বুদ্ধির পরাজয়ের লজ্জায়—তাঁর বোধির উদ্বোধনের যাতনায়—'লোকটি আমাকে অনন্ত জীবনে তুলে দিয়েছে। না না, ওঁর কথা আর আমি শুনতে চাই না'…

এইরকম কাহিনীর পর কাহিনী। অনেক কাহিনীই জো বলে যেতেন। একই কাহিনী বার বার বলতেন। শুনতে-শুনতে এই পরিবারের অন্তশ্চেতনায় এক বিশেষ ধরনের বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

"দেশভ্রমণ করে ফিরে এসে সেইসব দেশের অদ্ভুত জিনিস ঘরে সাজিয়ে রাখলে যেমন তারা বাড়ির পরিচিত দৃশ্যকে বিচিত্র বিদ্রূপে নিরীক্ষণ করে—জো-র কাহিনীগুলি তেমনি যেন আমাদের পরিবারের মধ্যে ঠেলে ঢুকে পড়ে পরিবার-দৃশ্যকে নিরীক্ষণ করত। কাহিনীর অনেকগুলিই দারুণ ডায়ন্যামিক —আর সবগুলির মধ্যে ছিল ঐকান্তিক বাস্তবানুভূতির শক্তি"—ফ্রান্সেস লেগেট লিখেছেন।

জো-র মহিমান্বিত মূর্তি, যার বিস্তারিত চিত্রণ করেছেন ফ্রান্সেস লেগেট—তা কিন্তু তাঁর বিচারবোধকে স্থগিত রাখে নি। জো-র স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন।

বিবেকানন্দের দেহত্যাগে জোসেফিন সর্বস্বহারা হয়ে লুটিয়ে কেঁদেছিলেন—তারপর একদিন স্থির করেছিলেন—না, আর কাঁদব না—

ফ্রান্সেস লেগেটের প্রশ্ন :

সেই সময় থেকেই কি জো বদলে গেলেন? সেই সময় থেকেই কি তিনি সেই ভাব-ভঙ্গি নিলেন, বা নিজের উপর সেই আচ্ছাদন টেনে নিলেন, যা তাঁকে বহু বিষয়ে অপার্থিব অমানবিক করে তুলেছিল? প্রথম দিকের চিঠিপত্রে যে জো-কে পাওয়া যায়, কিংবা বিবেকানন্দের প্রথম-দেখা প্যারিস-পোশাকে মোড়া তরুণী মহিলাটি, কিংবা বিবেকানন্দের দেহান্ত-পরে কয়েক বছরের ভগ্ন-হৃদয়া নারী—তাঁরা আর নেই। এখন জো নির্ধারিত জীবনোদ্দেশ্যসম্পন্ন এক মহীয়সী নারী। এ সকলই কি ঘটেনি যখন থেকে জো কান্না থামিয়ে দিয়েছিলেন?

ফ্রান্সেসের আরও মথিত জিজ্ঞাসা :

এই ভূমিকা কি বিপজ্জনক নয়—নিজের প্রকৃতির বাইরে বাঁচার চেষ্টা? বিপজ্জনক নয় কি এমন শক্তির বশবর্তী হওয়া, যা যাতনা-বোধের, নিরুপায় ক্রন্দনের প্রয়োজনকে ঠেলে সরিয়ে দেয়? জো জেদ ক'রে বলতেন—আমি তাঁর শিষ্যা নই। যদি তা হতেন তাহলে কি আরও ভালো হতো না? যদি সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টিন, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার প্রভৃতির মতো তিনি ত্যাগ ও আনুগত্যের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসতেন? তা কি করে হবে, জো কখনই তাঁর শিষ্যা নন—জো স্বয়ং তিনি!! সুতরাং 'তিনি'-তে আবিষ্ট জো সর্ববন্ধন-মুক্ত সন্ন্যাসীর মতো কাজ ক'রে চলেন। সন্দেহ নেই, এটা জো-র মেজাজের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তাঁর ম্যাকক্লাউড-নস্ট্যালজিয়া, তাঁর পিতার অদম্য ধর্মবাতিক, সেইসঙ্গে স্বদেশীয় নারীদের সজাগ বিদ্রোহ, এবং 'সর্বদা তৈরি থাকাই আসল ব্যাপার'—এই দর্শন—এ-সবই বেদান্তের সঙ্গে মিলেছিল ভালো।

প্রাচীন প্রজ্ঞার সর্বাত্মক উৎস বেদান্তের সঙ্গে সংস্রবের ফলে জো তাঁর স্বাভাবিক অধীরতাকে একটি চলমান মতাদর্শে নবরূপ দান করতে পেরেছিলেন। এক ধরনের যাযাবর প্রয়োগবাদকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন, যা বলে—কোনো এক-জায়গায় স্থির থাকা সীমাবদ্ধতার লক্ষণ—কোনো বিশেষ ধারার চর্চা করা সংকীর্ণতার পরিচয়।

ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ প্রশ্ন ফ্রান্সেসের :

বিবেকানন্দ নামক অসাধারণ অলৌকিক স্মৃতির ঐশ্বর্য যাঁর, কেন তিনি সারা জীবন অশ্রান্ত বেগে ঘুরে বেড়াবেন ? কেন স্থির ধ্যানে নারীর হৃদয়কে বিছিয়ে প্রাপ্তির অর্চনা করে যাবেন না ? বিবেকানন্দের মতো স্মৃতিই তো সর্বগ্রাসী বিষাদের মধ্যে আলোকরেখা। অমন কোমল মধুর, নিত্য অর্থে অঙ্কিত স্মৃতিই তো অজ্ঞাতপূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য সেতু নির্মাণ করে দেয়। আহা, জো, যদি তা জানতেন! যদি শুধু তাকেই ধরে থাকতেন! আর নারীর হৃদয়কে বলতে দিতেন তার গহন কথা!

অপরিমেয় তিনি…অনির্ণেয়…

না, জো-র সব কথা ফ্রান্সেস জানতে পারেন নি। জো জানতে দিতেন না। শিষ্যা তিনি নিশ্চয়ই, কারণ স্বামীজীর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রটি পাবার পরে মিস ম্যাকলাউড বলেন, 'না স্বামীজী, আমার দ্বারা ও-কাজ হবে না।' স্বামীজী বললেন, 'ঠিক আছে। ভাবনার কিছু নেই।' তারপর বহু বছর কেটে গেছে, জো বেলুড়-মঠে আছেন, হঠাৎ একদিন স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্রটি ভিতর থেকে উছলে উঠল ঝঙ্কার দিয়ে। সকালে প্রতিদিন ধ্যানে বসলেই সেই মন্ত্র বেজে উঠত।

এ সব কথা মিস ম্যাকলাউড নিজেই ভরত-মহারাজকে বলেছেন।

যতই গোপন করার চেষ্টা করুন তিনি মাঝে-মধ্যে ধরা পড়েছেন। যেমন—

বৃদ্ধা জো তখন বেলুড়ে অতিথি-ভবনে আছেন। দোতলায় থাকতেন। তরুণ সজীব সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দকে তিনি খুবই ভালবাসেন। বিজয়ানন্দ এক দিন সন্ধ্যার সময়ে কি-একটা প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সামনের ঘরে তাঁকে দেখতে না পেয়ে পিছনের বারান্দার দিকে গেলেন। সেখানে দেখেন বিচিত্র দৃশ্য—কুলুঙ্গিতে ছিল স্বামীজীর স্ফটিকমূর্তি—তার সামনে ধূপ দেওয়া—আর বৃদ্ধা এক হাতে নিজের স্কার্টের একটি ধার একটু তুলে এধারে-ওধারে অল্প দুলে আরতিনৃত্য করছেন। অন্য কেউ নন, ট্যান্টিন পূজা করছেন—নাচছেন—দেবমূর্তির সামনে !!—ট্যান্টিনের দেবদাসী মূর্তি !!! অকল্পনীয় দৃশ্য বটে! বিজয়ানন্দ গিয়ে আর ফিরে আসতে পারছেন না, পাছে এই একান্ত পূজা বিঘ্নিত হয়। বিঘ্নিত হলোই। চমকে পিছন ফিরে বৃদ্ধা তাঁকে দেখলেন। দ্রুত কাছে এসে চাপা তীব্র স্বরে বললেন—"হু কেয়ারস্ ফর দ্যাট নীগার ?"

বিজয়ানন্দ বললেন, "ইয়েস, হু কেয়ারস্!" তখন বৃদ্ধা বিজয়ানন্দের মাথা বুকে টেনে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, (অনেকদিন পরে কাঁদলেন!), আর বলতে লাগলেন, "মাই বয়, হি ওয়াজ্ নট গড্, হি ইজ্ গড্।"—না না, তিনি একদা ছিলেন, নয়—তিনি আছেন, আছেন—।

নিজের ঝোঁকে জো বলে চললেন—"তিনি 'ছিলেন' কখনো বলো না—তিনি আছেন—আছেন—।"

কিছুটা সামলে বললেন, "বৎস, আজ তুমি আমার একটা বড়ো গোপন রহস্য জেনে ফেলেছ।"

ফ্রান্সেস লেগেট জানতেন কিনা জানিনা, মিস ম্যাকলাউড যে-জীবন যাপন করেছেন, তার অধিকার স্বামীজীই তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ এই পৃথিবীতে তাঁর স্বভাবের অনুরূপ একজন নারীই দেখেছিলেন—সে ইনি। তাই মিস ম্যাকলাউডের চিঠিপত্র, এবং তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতি থেকে মূলগত বিবেকানন্দকে আমরা খুঁজে পাই। মিস ম্যাকলাউড লেখিকা নন, কিন্তু তিনি সেই জীবন যাপন করেছেন, মহৎ সাহিত্য যাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। ওই জীবনই মাঝে মাঝে এমন সব বাক্য উচ্চারণ করায় যা কেন্দ্রীয় অগ্নির অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়।

> "বিবেকানন্দ আমাকে অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন, [মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন] অনন্তে অবস্থিত আমি—তার পরিবর্তন নেই, বিকাশ নেই, চিরন্তন তা।
>
> "ডায়ন্যামিক তাঁর অস্তিত্ব, প্রচণ্ড তাঁর জীবনীশক্তি।"
>
> "অপরের মধ্যে যে-সাহস তিনি সঞ্চার করে দিতে পারতেন, তাই তাঁর নিজ শক্তির অখণ্ড প্রমাণ।"
>
> "অসাধারণ ও বিস্ময়কর তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতা, যা তাঁর চার-পাশে ব্যাপ্ত বিশ্বশক্তির উৎসদ্বার উন্মোচন করে দিত।"

চিঠির পর চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দের বিদ্যুৎশিখার মতো উক্তি চয়ন করেছেন। তারই অংশ :

> "তুমি কী পরিমাণে যাতনা সয়েছ বলো, আমি বলে দেব তুমি কত মহৎ।"
>
> "আমরা অধ্যাত্ম-পৃথিবীতে সর্বদা মুক্ত, কিন্তু মানসিক ও শারীরিক জগতে মুক্ত নই—তাই এত সংগ্রাম।"
>
> "যেখানেই রয়েছে কলুষ, পতন, অজ্ঞান, সেখানেই আমি আছি।"
>
> "দোষের বিরুদ্ধে লড়াই না ক'রে শ্রেষ্ঠতর কিছুতে নিজেকে পূর্ণ করে নাও।"

"সব অস্তিত্বের পিছনে কারণ আছে—সেটিকে খুঁজে বার করো।"

জো-র চেতনায় বিবেকানন্দের নিত্য অধিষ্ঠান। তিনি লিখেছেন :

"স্বামীজী এই মূল সত্যটি বলেছিলেন—স্বাধীনতায় স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসই সকল প্রকার যুক্তিবোধের ভিত্তি। স্বামীজীর ঐ কথা আমি বিশ্বাস করি। সে স্বাধীনতা নিশ্চয় কেবল রাজনৈতিক নয়।...আমি অনুভব করি, যে-জাতি বিবেকানন্দের জন্ম দিতে পারে, সে গভীর প্রাণশক্তি-সম্পন্ন। সে জাতির সাহায্যের জন্য যা-কিছু করি, আনন্দেই করি। এই প্রিয় গঙ্গার ধারে (বেলুড়ে গেস্ট হাউসে) বাস করা অবিরাম সুখের কারণ।...এখানে এক সুদীর্ঘ পূজা ও প্রার্থনার ধারা বয়ে চলেছে রামকৃষ্ণের অভিমুখে। সন্ন্যাসীরা কেউ কেউ সারাদিন ধ্যানে কাটিয়ে দেয়। এই ধ্যান, তারা অনুভব করে—জীবন ও মৃত্যুর যোজক। তাই ধ্যানে জীবন ও মৃত্যু মিলিত হয়ে যায় চির বর্তমানে।"

"নির্ধারিত বিরাট ভূমিকা আমাদের গ্রহণ করতে হবে—কিন্তু কিভাবে কোথায়—তা জানি না, জানতেও চাই না। তবে স্বামীজীর সান্নিধ্যে বৃথা থাকি নি, বা বৃথা তাঁকে ভালবাসি নি। আমাদের কর্মপথে তাঁর সুমহান প্রকাশ ঘটবেই। যদি তা নাও ঘটে—তাঁকে জানা আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার পাওয়া একই কথা।"

"সাত বছর ধরে আমি মহাশক্তির এক ভুবনে বাস করেছি। সেই শক্তির প্রচণ্ড স্পন্দন আমাকে পূর্ণ করেছে অন্তরে-বাহিরে।...ভারত যদি ঐ প্রকার অতিকায় আধ্যাত্মিক পুরুষ সৃষ্টি করে যেতে পারে, তার বিনাশ নেই।"

বিবেকানন্দ-সত্যের অসামান্য প্রকাশ এই রচনায় :

"স্বামীজীর যে-জিনিসটি আমাকে বেঁধে রেখেছে তা হলো তাঁর অসীমতা। তার নিম্ন-ঊর্ধ্ব-পার্শ্ব—কোনো কিছুতে পৌঁছতে পারি না।...এই ধরনের চরিত্র অপরকে মুক্তি দেয়। চিরন্তনের উপরে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। হাঁ হয়েছে—চূড়ান্তভাবে। ও-জিনিস আমার অঙ্গাঙ্গি সত্য—যাকে আমি স্বামীজীর মধ্যে দেখেছি—তাই আমাকে মুক্তি দিয়েছে। সেইজন্য কোনো মানুষের ত্রুটির দিক আমার কাছে এত তুচ্ছ মনে হয়। ঐ সামান্য অসম্পূর্ণ জিনিসগুলিকে মনে রাখা কেন—যখন সত্যের সমুদ্রকে ক্রীড়াস্থলীরূপে কেউ পেয়ে যাচ্ছে। আমাকে 'স্বাধীনতা' দিতেই স্বামীজীর আগমন। নিবেদিতাকে 'ত্যাগ' দান করা, কিংবা প্রিয় মিসেস সেভিয়ারকে 'অভেদ' দান করা যেমন স্বামীজীর মিশনের অন্তর্ভুক্ত—আমাকে 'স্বাধীনতা'

দেওয়াও তাই। হাঁ, জানি, ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে ভারতের মহান আধ্যাত্মিক দান। তাই ভারতের জন্য আত্মনিবেদিত কর্মী নিবেদিতা বলত—দিবারাত্র আমার কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে (স্বামীজীর) একটি শব্দই —'ত্যাগ ! ত্যাগ ! ত্যাগ !'···আমি কোনো ত্যাগকে পাইনি, কিন্তু স্বাধীনতাকে পেয়েছি—ভারতকে দর্শন করার, তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করার। ঐ আমার কাজ—ঐ কাজকে কী-না ভালবাসি। এই-যে অগ্নিময় আদর্শবাদী গোষ্ঠীটিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি—কী আনন্দ আমার ! জীবন-নামক অরণ্যকে পুড়িয়ে নির্গমনের নতুন পথসন্ধান এরা করছে। আমি অনুভব করি, স্বামীজী হলেন একটি প্রস্তরভিত্তি যার উপর দাঁড়াতে পারি। অন্যের পূজা করা আমার কাজ নয়, বন্দনাগান করাও নয়—আমার প্রয়োজন নিম্নে একটি দৃঢ় ভূমিলাভ—যার উপর দাঁড়িয়ে জীবনের নতুন পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারি। নিজের স্বভাবকে উন্মোচন করতে পারাই স্বর্গলাভ—তুমিও কি তা অনুভব করো না ?"

···এবং অতুলনীয়···

বেলুড়ে অতিথিশালায় দোতলার হল-ঘরে মেঝেয় কার্পেটের উপর একটি বালক বসে আছে। সেই ঘরে দ্বিতীয় মানুষ জোসেফিন ম্যাকলাউড। ক্ষীণ চোখে সযত্নে চশমাখানা বসিয়ে, সরু লম্বা চিবুক তুলে, মুঠি শক্ত ক'রে পাকিয়ে, বৃদ্ধা দৃঢ়স্বরে বলছিলেন—

"আমি স্বামীজীকে বলেছিলাম—স্বামীজী, আমি কী হব ? স্বামীজী গম্ভীরভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—

"Joe ! Be your Self ! Joe ! Be your Self !"

বৃদ্ধা বালকটির দুটি হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলতে লাগলেন,

"দ্যাখ, বিবেকানন্দ যেমন সত্য, আমিও তেমন সত্য, তুইও তেমনি সত্য, আমরা সবাই তেমনি সত্য।"

বৃদ্ধার কণ্ঠে এবার আবেগের সুর লাগল—

"এই দীর্ঘ জীবনে সারা পৃথিবীতে কেবল বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ বলে ছুটি কেন জানিস ? কারণ—আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে বড় মানুষ চোখে পড়ে নি। যেদিন দেখতে পাবো, সেদিন তোদের বিবেকানন্দকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে মানবো।"

বৃদ্ধা এবার হেসে ফেললেন—

"না, এত বছরেও তাঁর চেয়ে বড় মানুষের দেখা মিলল না।"

বৃদ্ধার পৃথিবীর আকার কিন্তু সত্যই বৃহৎ। খুব কম মানুষই এত বছর পৃথিবী ঘুরেছেন, এবং পৃথিবীর প্রধান-প্রধান মানুষকে অন্তত ৬০ বছর ধরে জেনেছেন। বার্নার্ড শ'কে তাঁর ৮৮ বছরের জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে

মিস ম্যাকলাউড লিখেছিলেন—

"এখন আমরা দু' জনেই আশির কোঠায়। তুমি এখনো ব্যায়ামাদি ক'রে চলেছ, অথচ আমি একটুও নয়।"

বার্নার্ড শ' অবিলম্বে উত্তর দিলেন,

"প্রিয় জোসেফিন, তোমার চিঠি পেয়ে স্ফূর্তির শেষ নেই। গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বিপত্নীক। তার অল্প দিন আগে আমরা একদিন তোমার কথা বলছিলাম, তোমার তল্লাশ নেই কেন ভাবছিলাম। তুমি আমাদের বিশেষ রকমের বন্ধু। আবার হলস্-ক্রফটে আমরা মিলিত হতে পারব, এমন আশা সর্বদাই করি।"

পৃথিবীর বিখ্যাত আরও কত মানুষকে তিনি জেনেছেন—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ, গেডেস, উইলিয়ম জেমস, এইচ জি ওয়েলস, রোমা রোলাঁ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর মা, পত্নীর জন্য রাজ্যত্যাগী অষ্টম এডওয়ার্ড—অগণিত অভিজাতপুরুষ, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানী গুণী—কিন্তু তবু তাঁর কাছে বিবেকানন্দই শিখরাসীন দেবদেব।

"স্বামীজী ও তাঁর বাণী চিরন্তন", তিনি ৫ ডিসেম্বর, ১৯২৩, লিখেছিলেন, "কবি [রবীন্দ্রনাথ] যেন ঐ বাণীর চারিপাশে অলঙ্করণ মাত্র। কবিকে আমি সমাদর করি, ভালবাসি—অনুভব করি যে, তিনি প্রতিদিন সূক্ষ্মতর, শুভ্রতর হচ্ছেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য তিনি যে এখনো জীবিত আছেন, তার জন্য কত গর্ববোধ করি। স্বামীজীর ধরন—অধিকতর ঋষি-সুলভ ; অধিকাংশ বিদগ্ধ মানুষের কাছে তিনি বোধগম্য নন, কিন্তু জনগণ তাঁকে বোঝে, কারণ তারা শিশুদের মতোই সংস্কারবশে মূল বস্তুর হৃদয়ে প্রবেশ করে যায়—যেমন আমরা, নারীরা, তা করতে পারি। আর স্বামীজী বলেছিলেন—'হৃদয়ই তোমার জীবন-নদী—মস্তিষ্ক ঐ নদীর উপরে সেতু—সর্বদা হৃদয়কে অনুসরণ করো'।"

১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ-আশ্রমে গিয়ে তিনি আনন্দবোধ করেছিলেন এই জেনে যে—"শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'বাস্তবিকই স্বামীজীকে (আলিপুর জেলে, ১৯০৯ সালে) আমি দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। ওটা ভিশনমাত্র হলে আমি বিশ্বাস করতাম না'।" মিস ম্যাকলাউড অতঃপর লিখেছেন, "স্বামীজী ১৯০২ সালে দেহত্যাগ করেন ; তার সাত বছর পরে তিনি অরবিন্দ ঘোষের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার কাছে এটা গভীর তৃপ্তির কারণ—স্বামীজীর ঐ মহান উত্তরাধিকারী বর্তমান আছেন।"

স্বামীজীর উত্তরাধিকার বা স্বীকৃতির কোনো চিহ্ন দেখলেই তিনি চূড়ান্ত আনন্দিত।

"মিঃ হোমার লেন আমাকে বলেছেন [লর্ড স্যাণ্ডউইচকে জো লিখেছেন] —তিনি আমার এই কথায় সম্পূর্ণ সায় দেন যে, এই পৃথিবীতে এতাবৎ আবির্ভূত বৃহত্তম আধ্যাত্মিক শক্তি হলেন স্বামীজী।"

"মিঃ হোমার লেন বললেন—স্বামীজী তাঁর জন্য এই কাজটি করেছেন—

তিনি সবকিছুকে পবিত্র ক'রে দিয়েছেন—সমগ্র জীবনকে, সমস্ত চেষ্টা-চরিত্র, কাজকর্ম, হাসি-খেলা, পূজা-প্রার্থনাকে।"

"সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিভিংটন কমফর্ট বলেছেন, 'বিবেকানন্দের সঙ্গে যুক্ত যাকেই তিনি দেখেছেন, তারই চারিদিকে আলোকচ্ছটা।' "

"স্ট্রানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে দীপ্ত প্রতিভার এক তরুণ হিন্দু রয়েছে, ২২ বছর বয়স, দর্শনের সহকারী অধ্যাপক—স্বামীজীর আগুনে সে জ্বলছে।"

"আলোয়ারের তরুণ মহারাজের সঙ্গে আলাপ করতে আমি খুবই উৎসুক, কারণ সে স্বামীজীর নামে পাগল।"

"এডওয়ার্ড লী মাস্টার্স, ম্যাকমিলানকে (যে-প্রকাশক ভদ্রলোক স্বামীজীর যোগ-চতুষ্টয় ছাপাতে অস্বীকার করেছেন) লিখেছেন—'স্বামীজীর এইসব রচনার ভাবকে আত্মসাৎ করার উপরই পৃথিবীর আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে'।"

বিবেকানন্দই সবকিছু। কেবল বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে নয়, নিজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কও বিবেকানন্দ-যোগেই।

"আমরা সকলেই স্বামীজীকে চিনেছিলাম এবং ভালবেসেছিলাম [মিস ম্যাকলাউড অ্যালবার্টাকে লিখেছেন]—তুমি এবং হলি (হলিস্টার), একইভাবে মাদার (মিসেস লেগেট; দিদিকে জো 'মাদার' বলতেন), ফ্রান্সি (মিঃ লেগেট), এবং আমি। এই ক্ষেত্রটিতে আমরা সবাই সানন্দে একত্র হয়েছি—অন্য ক্ষেত্রগুলিতে যতই পৃথক হই না কেন! আমাদের দেখা সর্ববৃহৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্র তিনিই—তাঁর অন্তর্ভুক্ত আমরা সকলেই। আমরা সবাই নিজের নিজের বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী পথ ধরেছি—কিন্তু চলার পথে আমরা কেউই সেই অধ্যাত্ম-শক্তির আদি অন্ত করতে পারি না। অনিঃশেষ ও-জিনিস।"

মিস ম্যাকলাউডের একই চিঠি থেকে জেনেছি—রিজলিতে স্বামীজীর গুরু-ভাই তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে একই ঘরে থাকলেও খাটে শুতেন না, মেঝেয় শুতেন, কারণ স্বামীজীর সঙ্গে সমস্তরে থাকা সম্ভব নয়।

একই চিঠিতে পাই, লেডি স্যান্ডউইচ তাঁকে লিখেছিলেন,

"স্বামীজী বৃথাই আমাকে আশীর্বাদ করেন নি বা মিছে আমাকে শিক্ষা দেন নি। তিনি আমাকে বসে-বসে কাঁদতে শেখান নি। আমি লুটিয়ে পড়তে পারি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়ব।"

মিস ম্যাকলাউড জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। ১৮৯৫ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর—এই ৫৫ বছরের নবজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল নিত্য তীর্থযাত্রার। তার প্রতিটি মুহূর্তে ছিল জিজ্ঞাসা—সন্ধান—শিক্ষা। সেইসঙ্গে খেলা—

"মনে রেখো, এ পৃথিবী তোমার নয়, আমারও নয়। এ পৃথিবী তাঁর, তাঁরই খেলা, তাই আমাদেরও খেলা।"

"এই যে জীবনকে দেখছি—বড় সুন্দর শোভাযাত্রা—চলেছে চলেছে—খুব

উপভোগ করছি—কিন্তু মনের গভীরে জানছি, শত-শত সাম্রাজ্য ওঠে আর পড়ে—চিরন্তন কেবল ঈশ্বর। স্বামীজী বলতেন-না, আগে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলো, তারপর যেভাবে ইচ্ছা খেলে যাও। ঐ 'বুড়িই' আসল।"

"৪১ বছর আগে, যখন প্রথম স্বামীজীকে দেখি ও তাঁর কথা শুনি—কিভাবে যেন আমি এই শরীর-মন-স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়েছিলাম।"

"জীবন হলো তরঙ্গ—আমরা দেখে যাব। তার শিকার হয়ো না—সাথী হও।"

"নানা রূপ ধরে মানুষ আমার কাছে আসুক, তাই চাই। তারা ঠিক যেমনটি তাদের ঠিক সেইভাবেই নেব, কাজে লাগাব, (না, নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে নয় অবশ্য), আমার দিগন্তকে প্রসারিত করে নেব। তাকে অবশ্য গভীরতর করা সম্ভব নয়, কারণ স্বামীজীর সঙ্গে থেকে গভীরতমকে আমি জেনেছি।"

বাঁচো এবং শেখো। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯, বয়স যখন ৮১, মিস ম্যাকলাউড লিখলেন :

"আমার সমাধিফলকে লেখা থাকবে, 'সদা প্রস্তুত আমি'—যদি সত্যই আমার জন্য কোনো সমাধিফলক নির্মিত হয়।"

তিন সপ্তাহ পরে লিখলেন, "যা কিছু নতুন দেখি. তাকেই নেড়ে-চেড়ে দেখতে চাই—এতেই আমার মধ্যে চির বিস্ময় বজায় থাকে।...সর্বদাই মনে হয়, সদ্যোজাত আমি।"

মিস ম্যাকলাউড তাঁর অতি শৈশবের একটি ঘটনা স্মরণ করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ, তখন স্বপ্ন দেখেন—যদি বাগান খোঁড়েন সোনা পেয়ে যাবেন। পরদিন সত্যই বাগান খুঁড়ে তিনি একটা সোনার দুল পেয়েছিলেন। ঘটনাটি তাঁর কাছে ভবিষ্যৎলিপি বলে মনে হয়েছিল।

"আমি তাই কেবল খুঁজছি আর খুঁড়ছি, আর অপরূপকে পেয়ে যাচ্ছি। যদি আমি আবার নিউইয়র্কে যাই—তা যাব অজানিতকে পাবার জন্যই। অজানিত আমাদের ঈশ্বর—তিনি কত রূপ ধরে ছলনা করছেন—আর আমাদের কেবলই আকাঙ্ক্ষায় ও বিস্ময়ে অধীর করে রাখছেন।"

এর এক মাস পাঁচ দিন পরে লিখলেন—

"দেরী নয়, দেরী নয়। আজই সেই নির্ধারিত দিন।"

"Don't delay. To-day is the appointed day."

জীবনে তিনি জাগ্রত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মৃত্যুতেও জাগ্রত থাকতে পারবেন।

"জীবন একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার ; বিরাটতর অ্যাডভেঞ্চার—মৃত্যু। তাই যখন আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হবো, তখন আমি চাই না আমার পরিবারের মানুষ বা বন্ধুদের মুখোমুখি থাকতে। আমি চাই আসা ও যাওয়ার স্বাধীনতা।"

একথা যখন লেখেন বয়স তখন আশি। তাঁর বড় প্রিয় কিটি মার্জেসন (লেডি কুশেনডন) মারা গেলেন এবং বান্ধবী ইসাবেল মার্জেসন পা বাড়িয়েই আছেন—তখন, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯, লিখেছেন,

"আমি ঐ সব চিন্তায় ব্যাপৃত নই। পৃথিবীর এই জীবন একটা বিরাট সুযোগ—শুধু শিখে যাও আর শিখে যাও দিবারাত্র—এইটুকু মনে জাগিয়ে রাখো—পৃথিবীতে যা-কিছু আমরা শিখব তা এখানে বা অন্যত্র ব্যবহার করতে পারব, কারণ আত্মার বিনাশ নেই।"

আত্মার বিনাশ নেই—একথা বিবেকানন্দই তাঁকে অনুভব করান। ২১ জানুয়ারি ১৯৪৩, তিনি লিখলেন, "পরের ২১ জানুয়ারি আমার বয়স হবে ৪৮—তবে শারীরিক ভাবে ৮৪।" একই বছরের ২৯ আগস্ট লেখেন, "শরীরত্যাগ পর্যন্ত সজীব থাকার চেষ্টা করা ভালো। তবে আত্মা চিরন্তন—সুতরাং শরীর নিয়ে ব্যস্ত কেন?"

এর বহুকাল আগে তিনি লিখেছিলেন,

"আমি অনুভব করতে শুরু করেছি—'বর্তমান' যখন গভীর হয় তখনই তা চিরন্তন হয়ে যায়। একটি নতুন ডাইমেনশনের সৃষ্টি হয়, আইনস্টাইন যা বলেছেন। সে যাই হোক, ডার্লিং, একথা সত্য জেনো, আমাদের জীবনে বিবেকানন্দ-ঘটনা চিরন্তন ব্যাপার। সুতরাং এসো, খেলাটা খেলে যাই।"

একদিন মিস ম্যাকলাউড সন্ধ্যায় কলকাতায় গঙ্গার ধারে অপেক্ষা করছিলেন—বেলুড়ে যাবার ফেরীর জন্য।

"কী সুন্দর কাব্যিক সেই অর্ধ ঘণ্টা! প্রদোষে আচ্ছন্ন, ইতস্তত গতিশীল নৌকার লণ্ঠনের চকিত আলোকে রেখাঙ্কিত—এখানে কেউ আমাকে জানে না, আমিও তাদের জানি না—কী শান্ত সুকোমল ব্যাপ্ত গভীরতা।"

অব্যাহত শান্তি নিয়ে তিনি দেখে যেতে লাগলেন সবকিছু, তার মধ্যে অপূর্ব লাগল এক ধ্যানমগ্ন তরুণ সাধুকে, আপাদমস্তক রক্তগৈরিকে আবৃত, অসাধারণ শারীরিক সৌষ্ঠব আর পবিত্র সৌন্দর্য, যেন দান্তের জগতের একটি মানুষ। অকস্মাৎ মিস ম্যাকলাউড নিজের মনেই হেসে ফেললেন,

"একটা লোক, রামকৃষ্ণ তার নাম, যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি—সে চুম্বকের মতো আমাকে ভারতে টেনে আনল, যেখানে থাকতে আমার এত ভাল লাগে! কেন? কেন?"

মিস ম্যাকলাউড উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন,

"কখনো-কখনো মানুষকে ঘিরে ফেলে চিরন্তন। কেন—তার উত্তর নেই। শুধু আছে—শুধু আছি।"

…জীবনের অ্যাডভেঞ্চার…মৃত্যুরও…

৩১ মে, ১৯৪৪ তারিখের এক চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড দু' বছর আগেকার এক গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণীর কথা লিখেছিলেন—তাঁর জীবনের "সেরা সাত বছর সময় আসছে।" বিস্ময়কর, সে কথাটা মিস ম্যাকলাউড গভীরভাবে বিশ্বাস

করেছিলেন—৮৪ বছর বয়স থেকে তাঁর জীবনের সেরা সময়ের শুরু!! এই চিঠিতে তিনি বলেন, "তাহলে পৃথিবীতে আরও পাঁচ বছর আয়ু আমার আছে।"

সেকথা সত্য হয়েছিল। সত্যই পাঁচ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। বহু দিন আগে নিবেদিতা, ১৯১০ সালের ২৬ ডিসেম্বর, এক চিঠিতে এই আশা প্রকাশ করেছিলেন, "তুমি ভালো হয়ে ওঠো, এবং ৯০ বছর বাঁচো।" নিবেদিতার ইচ্ছাও পূরণ হয়েছিল। ১৯৪৯, ১৪ অক্টোবর, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড বেদান্ত-মঠে, মিস ম্যাকলাউডের দেহান্ত হয় ৯১ বছর বয়সে।

ঘুরে বেড়িয়ে বিবেকানন্দ-বিতরণের ক্ষমতা যখন হারিয়ে ফেলেছেন—তখনকার বছরগুলিকে মিস ম্যাকলাউড কেন তাঁর জীবনের সেরা সময় বলে মনে করতে চেয়েছিলেন? তা কি এইজন্য নয়—এবার শুধুই 'তাঁতে' অবস্থান? মিসেস লেগেট স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনে শেক্সপীয়ারের মেয়ের বাড়ি হলস্ ক্রফট্ কিনে নিয়ে বিখ্যাত শেক্সপীয়ার-বিশেষজ্ঞ স্যার ফ্রাঙ্ক বেনসনকে দিয়ে সেটি সাজিয়েছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিত হতেন পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষ। বাড়িটির উত্তরাধিকার মিস ম্যাকলাউডে বর্তেছিল। পূর্বোক্ত ৩১.৫.১৯৪৪-এর চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড অনুরোধ করেছিলেন—যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন সে বাড়ির কোনো আসবাবপত্র যেন বিক্রয় করা না হয়। বিচিত্র হল, এঁরা কেনার আগে থেকেই ঐ বাড়িতে একটি ঘর ছিল, যার নাম 'প্রফেটস্ চেম্বার।' সে ঘরটি মিস ম্যাকলাউড নিজের মতো করে সাজিয়েছিলেন। সেখানে মিসেস ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা এবং মিসেস অ্যাডামসের ক্ষুদ্রাকার ছবি টাঙানো হয়েছিল। কিন্তু আসল জিনিস ছিল ম্যাকলাউডদের নিজস্ব প্রফেটের মূর্তি। "যখন ৩০ বছর আগে আমরা বাড়িটি কিনি [মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন] তার আগে থেকেই প্রফেটস্ চেম্বার উৎসর্গীকৃত ছিল। সুতরাং আমরা আমাদের প্রফেটকে দেওয়ালে লম্বিত ক'রে দিলাম—স্বামীজীর পাতলা রিলিফ মূর্তিটি। ...তার পিছনে জানালা, ফলে তাঁকে ঘিরে জ্যোতির উদ্ভাস।"

শেষের বৎসরগুলিতে মিস ম্যাকলাউড নিজেই 'প্রফেটের কক্ষ' হয়ে উঠে-ছিলেন, যেখানে চির দীপ্যমান বিবেকানন্দ। এই কালে তিনি তাঁর নিউইয়র্কের আবাসস্থল থেকে বহু সহস্র মাইল পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অপর প্রান্তে ক্যালি-ফোর্নিয়ার বেদান্তমঠে প্রায়ই চলে যেতেন, কারণ সেখানে আছে, 'বিবেকানন্দ হোম'—তাঁর নিজ নিকেতন। সেখানে আছে সুন্দর মন্দির—যার সামনেই শুভ্রোজ্জ্বল একটি—'ওঁ'—যে-মন্ত্র স্বামীজী তাঁকে দিয়েছিলেন। আর দিয়ে-ছিলেন ঐ মন্ত্রেরই ভাষ্য—

"মনে রেখো জো, ঘটনাচক্রে তুমি আমেরিকান, ঘটনাচক্রে তুমি নারী, কিন্তু স্বরূপে ঈশ্বর-সন্তান। দিবারাত্র নিজেকে বলো—তুমি কী, তুমি কী! কদাপি ভুলো না তুমি কে।"

কয়েক বছর যাতায়াতের পরে, মৃত্যুর অল্পদিন আগে মিস ম্যাকলাউড 'ওয়ান-ওয়ে রেলওয়ে টিকেট' কিনে হলিউড আশ্রমে চলে এলেন। বললেন,

"আমি এখানে মৃত্যুর জন্য এলাম।"

"জীবন এ্যাডভেঞ্চার। মৃত্যু আরও বড় অ্যাডভেঞ্চার।" যতদিন জীবনে ছিলেন, প্রচণ্ড শক্তিতে তার তরঙ্গে সন্তরণ করেছেন। এবার কিন্তু শান্ত—গভীর শান্ত। এই ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ একদা তাঁকে লিখেছিলেন,

> "তাঁর ইচ্ছাস্রোতে এখন আবার গা-ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য নির্মল কিরণ বিস্তার করছে, পৃথিবী চারদিকে শ্যামহিল্লোলে শোভা পাচ্ছে, দিনের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থ নিস্তব্ধ স্থির শান্ত। আর আমিও ধীর-স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত-পা নেড়ে এ-প্রবাহের গতি ভাঙতে প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি ভেঙে যায়।"

ক্যালিফোর্নিয়ায় বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়নি, কিন্তু দেহের মধ্যেই নির্বাণ-লাভ করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর পরে, যিনি মধ্যবর্তী বৎসরগুলির বড় অংশে বিবেকানন্দকে বহন ক'রে পৃথিবীর পথে-পথে ঘুরেছেন—ক্যালিফোর্নিয়াকে তিনি বেছে নিলেন নিজের দেহ-নির্বাণের ক্ষেত্ররূপে। এইভাবেই তিনি বিবেকানন্দে চরম বিলীন হলেন।

তার আগে কী করেছেন ?
চল্লিশ বছর আগে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন,

> "তিনি ছিলেন বুদ্ধ এবং শঙ্কর। না—প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে তিনি স্বয়ং আলোকস্বরূপ। সেই আলোককে (অপরের জীবনে) অনির্বাণ রাখতে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়েছ। সে আলোক জ্বলুক, জ্বলুক সেই বাতায়নে যেখানে তুমি তাকে স্থাপন করেছ অনন্তকালের জন্য।"

‘দেববাণী’র লিপিকর
মিস সারা এলেন ওয়ালডো

॥ ১ ॥

১৯০৭ সালের মে মাসে আমেরিকার ক্যাটসকিল পর্বতাঞ্চলে জেওয়েট নামক জায়গাটিতে যাবার জন্য সিস্টার দেবমাতা যদি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে আমন্ত্রণ না পেতেন—যদি সেখানে তাঁর অবস্থানস্থলের আধমাইল দূরে এক খামারবাড়িতে গ্রীষ্ম কাটাবার জন্য মিস ওয়ালডো না থাকতেন—যদি সিস্টার দেবমাতার সঙ্গে মিস ওয়ালডো-র পূর্ব-পরিচয় না থাকত—এবং যদি এখানে উভয়ের মধ্যে পুনশ্চ দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপচারী না হতো—

তাহলে কী হতো?

তাহলে কী হতো তার অনেক লঘুগুরু উত্তর সম্ভব। গুরুতর—গুরুতম উত্তর হলো : পৃথিবী কিছু অংশে দরিদ্র থেকে যেত, কারণ 'দেববাণী' প্রকাশিত হতে পারত না।

বিবেকানন্দের দেববাণী সহস্র দ্বীপোদ্যানের পর্বতশীর্ষে উচ্চারিত। সে দেববাণী কী, সে-প্রসঙ্গে দেবমাতা বলতে চেয়েছেন :

"যাঁরা স্বামীজীকে বক্তৃতামঞ্চে কেবল দেখেছেন তারা তাঁর শক্তিমহিমার অতি অল্পই জেনেছেন ('দিব্য অধিকারে তিনি বাগ্মী'—তথাপি !!)—স্বামীজীকে অনেক বেশি জানা যেত ঘরোয়া পরিবেশে, নির্বাচিত বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে। মুদ্রিত বক্তৃতায় বন্ধু, আচার্য এবং স্নেহময় গুরু বিবেকানন্দের দর্শন মেলে না। সে সৌভাগ্য নির্ধারিত ছিল তাঁদেরই জন্য যাঁরা তাঁর চরণতলে বসবার বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন।" তাঁরা দেখেছেন, "তখন তাঁর অন্তরাগ্নির অপূর্ব ঝলক, বাণীর সর্বোচ্চ উর্ধ্বায়ন, গভীরতম প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি।" সিস্টার দেবমাতা বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন, "বিবেকানন্দের বিরাট অধ্যাত্ম প্রতিভার চকিত প্রকাশ তাঁর পত্রাবলীতে দেখা গেলেও ব্যাপক ও গভীর প্রকাশ দেখা গেছে 'দেববাণী'-র মধ্যেই।"[১]

দেবমাতার কথায় সায় দিয়েছেন মিস ম্যাকলাউডও।

"আমার কাছে 'দেববাণী' স্বামীজীর রচনার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বস্তু, [মিস ম্যাকলাউড বলেছেন] কারণ সেগুলি অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কথিত।...সহস্র দ্বীপোদ্যানের দিনগুলিতে যেভাবে তিনি আত্ম-উন্মোচন করেছিলেন তেমন আর কখনো করেছেন বলে মনে করি না।"[২]

বিবেকানন্দের তেজস্বী এবং মনস্বী গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, বিবেকানন্দের কথা রাখতে যিনি পাঁজর ঝাঁঝরা করে রক্ত ঢেলেছেন (কথাটা প্রায় আক্ষরিকভাবে সত্য ; স্বামীজীর নির্দেশ মান্য করে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে মঠ তৈরি করতে চলে যান, সেখানে কঠোর পরিশ্রমে রামকৃষ্ণ-মঠ স্থাপন করেন, কিন্তু কয়েক বৎসরের নিদারুণ শ্রমে যক্ষ্মারোগ ধরে এবং রক্তবমনে মৃত্যু নেমে আসে দ্রুত)—তাঁর স্বীকৃতির মূল্য সর্বাধিক, কারণ তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য—আর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী-শিষ্যের চেয়ে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে মন্তব্য করবার অধিক অধিকারী পুরুষ কে হতে পারেন, বিশেষত তিনি যদি ত্যাগী ও তপস্বী,

মনীষী ও লেখক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ হন !!

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 'দেববাণী'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার সূচনায়, 'একালের পৃথিবীতে বেদান্তের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ও সম্মোহক বাগ্মী বিবেকানন্দ', একথা বলার পরে লিখেছেন :

"দেববাণীতে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁর ন্যায়পদ্ধতিভিত্তিক দৃঢ় অকাট্য যুক্তি, সম্মোহক ব্যক্তিত্ব, জটিলতম বিষয়কে প্রাঞ্জলতম উপায়ে ব্যাখ্যা করার বিরল ক্ষমতা, এবং ঝঞ্ঝাময় বাগ্মিতার দ্বারা সমালোচনা-উন্মুখ বিশাল জনতাকে জয় করার অভিপ্রায় নিয়ে দণ্ডায়মান নন। এখানে তিনি রয়েছেন ইতিমধ্যেই বিজিত তাঁর কয়েকজন নির্বাচিত শিষ্যের মধ্যে, যাঁরা তাকে অজ্ঞান ও দুঃখের পরপারে নিয়ে যাবার একমাত্র কাণ্ডারীরূপে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। এখানে তিনি নিজ উপলব্ধির পূর্ণজ্যোতির মধ্যে অধিষ্ঠিত, সুমধুর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে সর্বদিকে বিকীর্ণ করছেন মঙ্গলালোক, তারই মৃদুকোমল স্পর্শে উত্তোলিত ও উন্মীলিত করে দিচ্ছেন একান্ত ভক্তগণের হৃদয়পদ্ম।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আরো বলেছেন :

"সব-কিছু উড়িয়ে নিয়ে যান যে ঝঞ্ঝাময় সন্ন্যাসী, তিনি এখানে নেই। পরিবর্তে আছেন—ব্যাকুল ও প্রস্তুত কয়েকটি প্রাণের কাছে শান্তি ও দিব্যানন্দের বাণীকে মৃদু স্থির কণ্ঠে উচ্চারণ করবার প্রশান্ত ঋষি। সে কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে আলোক ও আশ্বাসের বাণী—সেগুলি অন্ধকারকে ছিন্ন করে পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূত, তা বায়ুকম্পিত আনন্দঘন উজ্জ্বলরাগ অরুণ ঊষার তুল্য। যদি তাঁর বাণী সেদিন কয়েকটি প্রাণকে আশ্বাস দিয়ে থাকে তাহলে অন্য সকল প্রাণকেই আশা ও শান্তি দেবার শক্তি তাদের আছে।"

দেববাণীর অমৃতধারাকে যিনি লেখনীপুটে কিছু অংশে অন্তত ধারণ করে রক্ষা করেছিলেন, সেই মিস ওয়ালডো-র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখেছিলেন :

"ধন্য হোক সেই শিষ্যার মাতৃহৃদয় যিনি ত্রাণকারী শব্দগুলিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন—মহাকালের অতল গহ্বরে অদৃশ্য হতে দেননি। হরিদাসী মাতার (মিস ওয়ালডো-কে স্বামীজী-প্রদত্ত নাম) কাছে সমস্ত পৃথিবী ঋণী—তাঁরই জন্য স্বামীজীর এই প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ বাণীগুলির দর্শনলাভ সম্ভব হলো। এই গ্রন্থের তুল্য অন্য কোথাও মানবসমাজের পক্ষে অধিক হিতকর বন্ধু, অধিক মহৎ পথনির্দেশক মিলবে না। এর অমৃত পান করলে মানুষ অনুভব করবে—মৃত্যুর কর্তৃত্ব নেই তার উপরে। যে-প্রাণ আলোক চায়, বিশ্রাম ও শান্তি চায়—সে যেন আশ্রয় নেয় এই গ্রন্থের।"

॥ ২ ॥

দেববাণীর 'শ্রোত ঋষি' মিস ওয়ালডো কি স্বামীজীর জীবনীতে যথোচিত

গুরুত্ব পেয়েছেন ? স্বামীজীর যে রচনাবলী আজ পৃথিবীর সামনে দীপ্তরূপে বর্তমান, তার অনেকখানি অংশের সঙ্গে (কেবল দেববাণীর নয়) যাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই মিস ওয়ালডো-কে কি স্বামীজী প্রসঙ্গে যথেষ্ট স্মরণ করা হয় ? স্বামীজীর রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর 'পুত্র' গুডউইনের কথা বিশেষভাবে বলবার সময়ে কি তাঁর 'কন্যা' মিস ওয়ালডো-র ভূমিকা প্রায়শ অনুচ্চারিত থাকে না ? আমরা কি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের সুর টেনে মিস ওয়ালডো-কে স্বামীজীর জীবনীতে উপেক্ষিতা বলবার প্রলোভনে ধরা দেবো ?

না, প্রলোভন থেকে দূরে থাকাই ভাল। স্বীকার করে নেওয়া উচিত, এ-যুগের মহত্তম আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি মাত্র ৩৯ বৎসর ধরাধামে ছিলেন, যাঁর বহির্গত কর্মজীবন ভারত ও পৃথিবী মিলিয়ে ৯ বৎসরের মতো (যার মধ্যে অসুস্থতার বিরতি যথেষ্ট), পাশ্চাত্ত্য কর্মজীবনের আকার অল্পাধিক তিন বৎসর—সেই জীবনের মধ্যে মিস সারা এলেন ওয়ালডো-র ভূমিকা এমন কী বৃহৎ ছিল যে তা জীবনীর মধ্যে উল্লিখিত স্থানের বেশি দাবি করতে পারে ? যে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের রাজসভায় সমবেত ছিল অগণ্য চরিত্র—সেখানে মোটামুটি একটা সম্মানের আসনের বেশি মিস ওয়ালডো আর কী পেতে পারেন ?

কী পেতে পারেন, তা স্বামীজীর রচনাবলী ও জীবনী-পাঠকেরা স্থির করবেন। লুইস্ বার্ক তাঁর মহাভারততুল্য ৬ খণ্ডের বিবেকানন্দ গবেষণা-গ্রন্থে এলেন ওয়ালডো-র ভূমিকা বিষয়ে অনেক সংবাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন স্মৃতিকথাতে মিস ওয়ালডো-র কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তার থেকে ওঁর ভূমিকার মূল্য নির্ধারিত হতে পারে। সে-প্রসঙ্গে আসার আগে একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া উচিত—মিস ওয়ালডো কিন্তু নিজের জন্যে কোনো কিছু দাবি করেন নি। যতখানি করার তিনি করেছেন, যতখানি দেবার তিনি দিয়েছেন—তারপর নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এমন আত্মবিলয় কদাচিৎ দেখা যায়। সেজন্য আমরা না-জানি তাঁর বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয়-পূর্ব জীবনের পূর্ণ কাহিনী, না-জানি স্বামীজীর দেহান্ত-পরে তাঁর জীবনকথা। অথচ মানুষ হিসাবে তিনি মোটেই নত বেপথু চরিত্রের ছিলেন না। তাঁর মধ্যে রীতিমতো কাঠিন্য ছিল, এমনকি বলা যায় এক-ধরনের শীতলতা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মনস্বিতা ও কর্মপটুতার শক্তিতে সমৃদ্ধ তিনি—অনেককেই বিরক্ত ও বিচলিত করেছেন। স্বামীজীর জীবনের একাংশে কিছুদিন যিনি অপরিহার্য চরিত্র ছিলেন, যাঁর বুদ্ধিমত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, প্রকাশক্ষমতা এবং চারিত্রিক শুদ্ধতা সম্বন্ধে স্বামীজীর উচ্চ ধারণা ছিল—এ-হেন মিস ওয়ালডো-কে কিন্তু স্বামীজী কখনই ভারতে গিয়ে কাজ করবার অনুরোধ জানান নি। "মিস ওয়ালডো আমাকে বলেছেন [সিস্টার দেবমাতা লিখেছেন] স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকলেও বিচিত্র ব্যাপার হলো, ত্যাগব্রত গ্রহণের কথা আমার মনে কখনো ওঠে নি। আর আমি কখনই ভারতবর্ষে তাঁর কাছে যাবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করি নি। আমি যেন আমেরিকারই। অথচ এমন কোনো কাজ ছিল না যা আমি তাঁর জন্য করতে পারতাম না।"[৩]

স্বামীজী নিশ্চয় জানতেন, তাঁর অনেক মন্দির—আর প্রতি মন্দিরেই আছেন

পূজারী ও পূজারিণীরা। এঁরা সকলেই কিন্তু ভ্রাম্যমান নন। মিস ওয়ালডো স্বামীজীর এক বিশেষ মন্দিরের নিত্যসেবার দীপধারিণী।

॥ ৩ ॥

ইতিকথায় নেমে আসা যাক। ঠিকভাবে বলতে গেলে, ১৮৯৫-৯৬ সালে স্বামীজীর নিউইয়র্ক-জীবনে কয়েক মাস এলেন ওয়ালডো-কে স্বামীজীর কাজে সক্রিয় দেখেছি। স্বামীজীর অন্যত্র অবস্থানকালেও তিনি ১৯০০ সাল পর্যন্ত কিছু সময় বেদান্ত প্রচারের কাজকর্ম করেছেন।

স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময় তাঁর চিন্তাভাবনা মোড় ফিরে নতুন খাতে বইতে শুরু করেছিল। তার আগে, চিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত এবং সহসা সাফল্য-শিখরে উত্থিত বিবেকানন্দ, ভারতীয় কাজের অর্থসংগ্রহের জন্য একটি বক্তৃতা-ব্যুরোর সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হয়েছেন, তাঁকে অপূর্ব কিন্তু কার্যত 'আজব জীব' হিসাবে আমেরিকার নানা জায়গায় ঘোরানো হয়েছে, আঘাত এসেছে তাঁর পূর্বতন স্বপ্নাচ্ছন্ন, ধ্যানাচ্ছন্ন চরিত্রের উপর। সে অতি কণ্টকর সময়। "পাশ্চাত্ত্যভূমে বিজাতীয় চিন্তার সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ, অসংখ্য প্রশ্নবাণ এবং মুহুর্মুহু ক্ষুরধার বাক্যের আদান-প্রদান, তাঁর মধ্যে ভিন্ন সত্তার জাগরণ ঘটিয়েছে ; যে পৃথিবীর মধ্যে তিনি এখন নিজেকে নিক্ষিপ্ত দেখছেন—তারই মতো করে সদাসতর্ক সজাগ ও প্রস্তুতও হয়ে উঠেছেন।"[৪] বিবেকানন্দ অতঃপর সজোরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন বক্তৃতা-ব্যুরো থেকে, প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও। না—বহুসংখ্যক মানুষকে বাগ্মিতায় মুগ্ধ করা তাঁর কাজ নয়—কিছুসংখ্যক মানুষকে চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর জীবনাদর্শ।

বক্তৃতা-ব্যুরো ছেড়ে দিয়ে স্বামীজী ১৮৯৪-এর গোড়ার দিকে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেছেন, গ্রীষ্মে চলে গেছেন গ্রীনএকার কনফারেন্সে, সেখানে নানা বিচিত্র ভাবে উন্মুগ্ধ কিছু মানুষকে নিকট থেকে দেখেছেন, পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদার দৃঢ়চেতা ডঃ লুইস জি জেনসের সঙ্গে, ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে বক্তৃতা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তারপর—আরো আরো সাফল্যের আকর্ষণ ছিঁড়ে ফেলে নিউইয়র্কের এক দীন পল্লীতে সামান্য আবাসে (৫৪ ওয়েস্ট এন্ড ৩৩ স্ট্রীট) শুরু করেছেন ক্লাস, মাত্র ৩-৪ জন শ্রোতা নিয়ে। কিন্তু বিবেকানন্দ নামক বনস্পতির বীজ থেকে বৃক্ষে বৃদ্ধি হিসাবের পথ ধরে ঘটে না। ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করে ফেলেছেন (আমেরিকায় স্বামীজী-স্থাপিত সেই প্রথম বেদান্ত সোসাইটি), তাঁর ক্লাসের জনপ্রিয়তার চাপে তেতলার ক্ষুদ্র ঘরটি ছেড়ে নতুন করে ভাড়া নিতে হয়েছে নীচের তলার প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরটি, মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তাঁর কিছু অভিজাত বন্ধুর আশঙ্কা—নোংরা পল্লীতে তাঁর কাছে 'ঠিক মাপের লোকেরা'

আসবে না—এবং সত্য প্রমাণিত হয়েছে এই কথাটি—ঈশ্বরপুত্র যেখানে অবস্থিত সেই মন্দিরে তীর্থযাত্রীর অভাব হয় না।

॥ ৪ ॥

১৮৯৪ সালের শেষ ভাগ থেকে স্বামীজী যখন পাকাপাকিভাবে আগ্রহী-মহলে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করলেন, তখন দেখা গেল, এলেন ওয়ালডো সর্ব-প্রকারে তাঁর সহায়িকা। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় বেশি দিনের নয়। কিন্তু ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৪ তারিখে স্বামীজীর ভাষণ শুনে অবিলম্বে তিনি অনুভব করেছিলেন—এতদিনে সত্যই প্রার্থিতের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

সারা এলেন ওয়ালডো (১৮৪৫-১৯২৬) স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা ১৮ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ, অবিবাহিত, মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন, ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তায় আগ্রহী, চিন্তার খোরাক সংগ্রহের জন্য বহু বৎসর ধরে কয়েকজন সম-মন মানুষের সঙ্গে (তার মধ্যে তাঁর বান্ধবী রুথ এলিস এবং ডঃ ওয়াইট ছিলেন) বক্তৃতা-সভায় যোগদান করেছেন, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁর চর্চার মধ্যে ছিল, স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের আগেই বেদান্তদর্শন অল্প-বিস্তর তাঁর মনের পরিধির মধ্যে এসে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি এতদিন শুধু বক্তাদেরই পেয়েছেন, আচার্য পাননি। বিবেকানন্দের মধ্যে আচার্যের দর্শন পেয়ে জীবনের কোন্ দিকপরিবর্তন হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে দেবমাতার বর্ণনা এই-প্রকার :

"নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের ক্লাস ও বক্তৃতার সভাগুলিতে যাঁরা যোগদান করতে শুরু করেছিলেন তাঁরা অচিরে এক দীর্ঘাঙ্গী, ভারী চেহারার মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেতেনই—দেখা যেত, মহিলাটি ঘুরে-ফিরে সব-কিছু কাজ করে চলেছেন। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে জেনে গেলাম, উনি মিস এলেন ওয়ালডো—দর্শন-জগতে এবং বৃহত্তর সংস্কৃতিক্ষেত্রে ব্যাপক খ্যাতিসম্পন্ন র‍্যালফ্ ওয়ালডো এমার্সনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। স্বামীজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'হরিদাসী'। সুনির্বাচিত নামটি! কারণ তিনি যথার্থই ছিলেন হরির দাসী—তাঁর সেবা অব্যাহত এবং অক্লান্ত। রান্নাবাড়া, ঘরদোর পরিষ্কার, শ্রুতিলিখন, প্রকাশিতব্য রচনার সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, পাঠদান এবং অভ্যাগতদের মোকাবিলা—সবই তিনি করছেন।"[৫]

যিনি হরিদাসী, তিনি হরি-পুত্রেরও দাসী। 'ম্যয়নে চাকর রাখো জী।' মিস ওয়ালডো-র সেবিকা-ভূমিকার এক চমৎকার কথাচিত্র দেবমাতার রচনা থেকেই উপস্থিত করা যাক :

"স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিউইয়র্কে প্রথম আসেন, তখন কঠোর বর্ণ-বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তিজীবনে ও জনজীবনে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। তার একটি—উপযুক্ত বাসস্থান সংগ্রহ করতে অত্যন্ত

অসুবিধা। ল্যান্ডলেডীরা অবধারিতভাবে শুনিয়ে দিত: 'না না, আপনার সম্বন্ধে আমার মনে কোনোই বিরূপতা নেই, তবে কিনা, যদি কোনো এশিয়া-বাসীকে ঠাঁই দিই তাহলে অন্য আবাসিকরা সরে পড়বে।' এরই জন্য স্বামীজী নীচু ধরনের বাসস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই রকমের নোংরা এক আবাসে রাত কাটাবার পরে তিনি মিস ওয়ালডোকে বলেন, 'এখানকার খাবার কী যে অপরিষ্কার তা বলার নয়। তুমি কি আমার জন্য রেঁধে দিতে পারবে?' মিস ওয়ালডো অবিলম্বে ল্যান্ডলেডীর কাছে গিয়ে রান্নাঘর ব্যবহারের অনুমতি আদায় করে নিলেন। পরদিন সকালেই তিনি নিজের ঘর থেকে বাসনপত্র, মসলাপাতি এবং অন্য জিনিস নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

"মিস ওয়ালডো ব্রুকলিনের দূর প্রান্তে বাস করতেন। যোগাযোগের একমাত্র উপায় ঝাঁকানি-দেওয়া ঘোড়ার গাড়ি—যাতে করে ৩৮ স্ট্রীট নিউইয়র্কে স্বামীজীর আবাসে পৌঁছতে দু-ঘণ্টা লেগে যেত। একটুও না দমে তিনি সকাল আটটা কি তারো আগে প্রতিদিন স্বামীজীর আবাসে হাজির হতেন এবং রাত্রি আটটা কি নয়টার সময় নিজের বাড়ির দিকে ফিরতি-যাত্রা শুরু করতেন। অবসরের দিনে ভূমিকার বদল হতো। তখন স্বামীজী উঠে পড়তেন ঝাঁকানি-দেওয়া ঘোড়ার গাড়িতে, দু-ঘণ্টা সেই অবস্থায় থেকে মিস ওয়ালডোর বাড়িতে পৌঁছে রান্না করতেন। মিস ওয়ালডো-র সাদামাঠা বাড়ির স্বাধীন ও শান্ত পরিবেশে স্বামীজী সত্যকার হাত-পা ছড়ানো বিশ্রামের সুখ পেতেন। বাড়ির একেবারে উপরতলায় রান্নাঘর, তার সামনে রোদে আলোয় ভরা খাওয়ার ঘর, তাতে ছোটখাট টবে বাহারে চারা গাছ। স্বামীজী নতুন নতুন খাবার তৈরিতে খুবই উৎসাহী, পাশ্চাত্য খাদ্য নতুনভাবে তৈরির নানা পরীক্ষাও চালাতেন, সে সময়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোট ছেলের মতো দৌড়াদৌড়ি করতেন।"[৬]

বিবেকানন্দ সম্পদ। বর্ণবিদ্বিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আমেরিকায় বিপজ্জনক সম্পদও বটে। সেই বিপদের কথাও পাই দেবমাতার বিবরণে:

"স্বামীজী প্রথম যখন নিউইয়র্কে আসেন তখন গেরুয়া পোশাক পরে সব জায়গায় ঘোরাফেরা করবেন বলে জেদ ধরেন। ব্রডওয়ে ধরে ঐ প্রকার বর্ণোজ্জ্বল পোশাকধারীর পাশে হাঁটা কম সাহসের পরিচয় ছিল না। মিস ওয়ালডো আমাকে বলেছেন, 'রাজকীয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে স্বামীজী হেঁটে চলেছেন, হাঁপাতে-হাঁপাতে আমি ঠিক তাঁর পিছনে চলেছি—তখন আশেপাশের প্রতিটি চোখ আমাদের দিকে, প্রতিটি ঠোঁটে একই প্রশ্ন: এই চীজ্ দুটি কে? পরে আমি স্বামীজীকে পথে চলবার সময় আর-একটু মানানসই মাঠো পোশাক পরতে প্রণোদিত করেছিলাম'।"[৭]

॥ ৫ ॥

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি গঠিত হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে মিস ওয়ালডো-কে সেখানে কর্মী হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। তারপরে বেশ কয়েক মাস

প্রধান কর্মীও হয়ে উঠেছিলেন। তখন তাঁকে যে, সব রকমের কাজে সক্রিয় দেখা যেত, তার উল্লেখ আগেই করেছি। কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হয়নি। কর্মীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল, কর্মপদ্ধতি নিয়েও মতভেদ ছিল, ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঘটছিল—যার পরিণতিতে ক্রমে মিস ওয়ালডো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সরে যান। লুইস বার্কের **'Swami Vivekananda in the West'** বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এ-সব বিষয়ে অনেক সংবাদ আছে।

বেদান্ত সোসাইটির গোড়ার দিকে পরিচালনা ব্যাপারে লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গের আধিপত্য ছিল। তাঁর সঙ্গে অন্য কর্মীদের সংঘাত ঘটলেও মিস ওয়ালডো-র আনুগত্য তিনি কিছু সময় পেয়েছিলেন। মিসেস ওলি বুলের প্রতিনিধি হিসাবে মিস হ্যামলেন এই বেদান্ত সোসাইটির খানিক তত্ত্বাবধান করছিলেন। তাঁর কাছে মিস ওয়ালডো তখন (মিসেস বুলকে লেখা মিস হ্যামলেনের ২৪-৪-১৮৯৫ তারিখের চিঠিতে দেখা যায়) 'ঈশ্বর ও মানবসমাজের প্রতি প্রেমে পূর্ণ-প্রাণ চরিত্র', 'অতি উত্তম নারী।' মিস হ্যামলেন ছিলেন সাদা-মাঠা মানুষ, বুদ্ধিদীপ্ত নন, একটু বেশি উৎসাহী, নিজের কাজের তারিফ চাইতেন। স্বামীজীর ক্লাসের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর ও মিস ওয়ালডো-র মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মিস ওয়ালডো-র মতো ব্যক্তিত্বশালী, কর্মপটু এবং মনস্বিতা-সম্পন্ন নারীর পক্ষে মিস হ্যামলেনের খবরদারি সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এর পরিণতিতে সোসাইটি পরিচালনার দায় তিনি এবং তাঁর বান্ধবী রুথ এলিসের উপর এসে পড়ল। স্বামীজীর ইচ্ছাতেই মিস হ্যামলেনের কাছ থেকে তিনি কর্মভার নিয়ে নিয়েছিলেন। (কাজের ঝঞ্ঝাট কম ছিল না: টিকেট ছাপা, ঠিকানা অনুযায়ী নিমন্ত্রণ-চিঠি পাঠানো, সভার নোটিশ দেওয়া, চেয়ার ভাড়া ও আগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানানো, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

১৮৯৬ সাল থেকে বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় গুডউইন সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কাজের ক্ষেত্রে স্বামীজীর ক্লাস-নোট ও বক্তৃতাদির প্রকাশ ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে ওঠে। বেদান্ত সোসাইটির পাবলিকেশন কমিটি হয়েছিল, তা ছিল মিসেস বুলের কর্তৃত্বে। এখানে দু-ধরনের সংঘাত দেখা দিল। প্রথমত নিউইয়র্ক ও বস্টনের সংঘাত, দ্বিতীয়ত নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের সংঘাত। এর সঙ্গে ইংরেজ ও আমেরিকান সংঘাতও জড়িয়ে গেল। মিসেস বুল বস্টন থেকে স্বামীজীর রচনা-প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছিলেন। গুডউইন তাঁর সমর্থনে ছিলেন। অপরদিকে মিস ওয়ালডো, মিস ফিলিপস্ প্রমুখ নিউইয়র্কের কর্মীরা তা পছন্দ করেন নি। এধারে মিস ওয়ালডো স্বামীজীর রাজযোগের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন তার কপি চলে যায় ইংল্যাণ্ডে ই টি স্টার্ডির কাছে এবং তিনি বিনা অনুমতিতে তা লণ্ডন থেকে প্রকাশ করে দেন। এই ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-র আশাভঙ্গ ও মর্মবেদনার সীমা ছিল না, কারণ 'রাজযোগ' প্রস্তুত করার পিছনে তাঁর কঠিন শ্রম ও অনন্ত স্বপ্ন জড়িত ছিল। নিউইয়র্ক থেকে না বেরিয়ে সেই বই লণ্ডন থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় তিনি প্রবঞ্চিতের অন্তর্দাহ অনুভব করেছিলেন। অথচ মিসেস বুল ও গুডউইন

স্টার্ডির কাজকে সমর্থন করেন। এই সময়ে এঁদের লেখা একাধিক পত্রে এই সংঘাতচিত্র ফুটে উঠেছে।

গুডউইনের সঙ্গে মিস ওয়ালডো-র সংঘাতের অন্য ক্ষেত্রও ছিল। গুডউইন স্বামীজীর অবর্তমানে নিউইয়র্কে বেদান্ত-প্রচার ব্যাপারে আধিপত্য করতে চাইছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী, স্বামীজীর একান্ত অনুগত, দ্রুত লেখায় পারদর্শী, দ্রুত কাজ করতেও। তাঁর মধ্যে একটা বেপরোয়া, খামখেয়াল এবং অস্থিরতা ছিল। স্বামীজীর প্রাণভরা স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন—একনিষ্ঠ সেবার জন্য এবং স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত বাণীপ্রবাহকে সংকেতলিপিতে তুলে নিয়ে মানবসমাজের কাছে উপস্থাপন সম্ভব করার জন্যও বটে। স্বামীজী নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন—তাঁর বাণী বস্তুতপক্ষে, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর গুরুর বাণী, নিত্য বাণী! সেকথা তিনি বলেছেনও—'বাণী তুমি,···বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।' তদুপরি, গুডউইন স্বামীজীর কাছে 'পুত্র'—তাঁর বাঁধন-ছেঁড়া স্বভাবের জন্যই হয়তো। দুরন্তের প্রতি স্বামীজীর দুর্নিবার স্নেহ। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর মৌল জীবনোদ্দেশ্য যে বেদান্তপ্রচার সেখানে অনধিকারীর হস্তক্ষেপ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না—অথচ সেই কাজ করতেই গুডউইন শুরু করেন! স্বামীজী তাঁর রচনা প্রস্তুত করার ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-র অনন্য প্রয়াসের মূল্য স্বীকার করেও, যেহেতু পাবলিকেশন কমিটির ভার ছিল মিসেস বুলের উপর, তাই সে-ক্ষেত্রে তিনি মিসেস বুল এবং তাঁর দ্বারা সমর্থিত গুডউইনের সিদ্ধান্ত বা কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু গুডউইন যখন নিজের সীমা ছাড়িয়ে বেদান্তপ্রচার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দের সমালোচনা পর্যন্ত করতে আরম্ভ করলেন, তখন স্বামীজী কোথায় কার সীমা, তা সমঝে দিয়েছিলেন। এক প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামী সারদানন্দ রাজযোগের প্রাণায়াম কিভাবে করতে হয় সে-বিষয়ে আলোচনা করেন। তাতে গুডউইন চটে অস্থির হন। তাঁর বক্তব্য, এসব সকলের সামনে আলোচনা করার বিষয় নয়। এই সঙ্গে তিনি স্বামীজীর অনুরূপ অভিমতের কথাও জোরের সঙ্গে বলেন (মিসেস বুলকে ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ তারিখে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে)। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন—স্বামী সারদানন্দ তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করছেন, অথচ 'পলিসি' ব্যাপারে সারদানন্দকে পরিচালিত করার ভার স্বামীজী তাঁকে দিয়েছেন, ইত্যাদি। গুডউইন অভিযোগ করেন, বেদান্তপ্রচার ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-ও তাঁর অধিকারের মর্যাদা স্বীকার করছেন না।

গুডউইন এতই রেগে গিয়েছিলেন যে, হঠাৎ সব দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ডে প্রস্থান করেন। এটা চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা বলে নিউইয়র্ক-কর্মীদের মনে হয়েছিল। মিস ফিলিপস্ ৭ অক্টোবর ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে গুডউইনকে ঝাঁঝালো ধারালো ভাবে লিখলেন: "বেদান্ত আন্দোলনটা বুঝি এমনই তুচ্ছ ব্যাপার যে, ইচ্ছামতো তাকে তুমি গড়বে এবং ভাঙবে ভেবেছ? বেদান্তের মতো সুগভীর একটা ধর্মীয় আন্দোলন কি ছেলে-ছোকরাদের ফাজলামির বিষয়? আমাদের প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপ্ত বাণী বুঝি মজা করার জিনিস?

স্বামীজী অজস্র বাধাবিপত্তির মধ্যে কঠিন পরিশ্রমে, অসাধারণ ধৈর্যে, নিউইয়র্কে বেদান্তকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন—সেই ধারা বজায় রাখতে পারেন একমাত্র স্বামী সারদানন্দের মতো সন্ন্যাসী—আর তুমি কিনা তাঁকে শীতকালে বস্টনে থেকে যেতে এবং নিউইয়র্কে না-আসতে বলে দিলে—সে-বিষয়ে নিউইয়র্ক কেন্দ্রে কোনো কথা জানাবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করলে না? এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ অনুরক্ত তুমি, তোমার কথায় আমাদের কতই-না বিশ্বাস ছিল, অথচ তুমি বিশ্বাসভঙ্গ করলে!"[৮]

স্বামী সারদানন্দ আসছেন না—নিউইয়র্কে তাহলে বেদান্তপ্রচার করবেন কে? অ-সন্ন্যাসী দু-একজন ভারতীয় প্রচারকের কথা উঠল। স্বামীজীর কাছে সংবাদগুলি অল্পবিস্তর পৌঁছচ্ছিল। মিস ওয়ালডো-কে লণ্ডন থেকে স্বামীজী ৮ অক্টোবর তারিখে লেখা এক চিঠিতে স্থির দৃঢ় ভাষায় গোটা ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। এর মধ্যে একদিকে রামকৃষ্ণ-শিষ্য সন্ন্যাসী সারদানন্দের আধ্যাত্মিক অধিকারের সমুচিত স্বীকৃতি ছিল, অন্যদিকে মিস ওয়ালডো-র শাস্ত্রজ্ঞান, প্রচার-দক্ষতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতার বিশেষ প্রশংসাও ছিল।

স্বামী সারদানন্দ কোথায় প্রচার করবেন বা না করবেন, সে-বিষয়ে গুডউইনের খবরদারির সূত্রে স্বামীজী ঐ পত্রে লিখলেন:

"স্বামী সারদানন্দ কেন বস্টন ও নিউইয়র্ক দু-জায়গাতেই কাজ করবেন না, তার কোনো কারণ দেখছি না। বস্টনে তো ক্লাস অল্পস্বল্পই, তাও খিচুড়িতে মসলা দেওয়া ধরনের। ভুললে চলবে না, বেদান্তপ্রচারই সারদানন্দের কর্তব্য। মিসেস বুলকে এ-বিষয়ে লিখব। ইতিমধ্যে আঁচ পাচ্ছি, বস্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে কিছু কিছু পারস্পরিক ঈর্ষার ভাব জেগে উঠেছে। তুমি যদি ব্যাপারটা সহজ করে দিতে পারো তাহলে তোমার জন্য আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ—আর তোমার মুক্তির গতিও তাতে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাবে।"

জনৈক তরুণ ভারতীয়কে দিয়ে (যিনি নিউইয়র্কে উপস্থিত হয়েছিলেন) রাজযোগ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় কিনা, মিস ওয়ালডো প্রমুখের এমন জিজ্ঞাসা ছিল। তার উত্তরে স্বামীজী অধিকারী ও অনধিকারী প্রশ্নটি স্পষ্ট ভাষায় নির্ধারণ করে দেন:

"আমি জেনে আনন্দিত যে, রায় পদবীর যুবকটি অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছেছে। সে স্টার্ডি ও আমার কাছে এসেছিল দলভুক্ত হবার জন্য। কিন্তু তাকে পোষণের মতো টাকা আমার নেই। আর স্টার্ডি কোনো থিয়জফিস্টকে কোনমতে কাছে ঘেঁষতে দিতে রাজি নয়। টাকাকড়ি করা বিষয়ে ছোকরাটির কিছু বাসনাও আছে। যার বৈরাগ্য নেই তার বেদান্তপ্রচারে কোনো অধিকারই নেই। তবে সে অল্পস্বল্প সংস্কৃত, গীতা ইত্যাদি এবং সহজ উপনিষদগুলি পড়াবার যোগ্য। সে বাঙালী, এইটুকু ছাড়া তার বিষয়ে বিশেষ-কিছু জানি না। আর তুমি তো আমার স্থির ধারণার কথা জানোই—'কাম-কাঞ্চন' জয় করতে পারে নি এমন কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। তত্ত্বমূলক বিষয় শেখাবার কাজে

তাকে লাগাতে পারো, কিন্তু রাজযোগ শিক্ষা দেওয়া থেকে তাকে দূরে রাখবে। যাদের ও-ব্যাপারে রীতিমতো অনুশীলন নেই তাদের পক্ষে ও-বস্তু নিয়ে খেলা করা বিপজ্জনক।”

সারদানন্দের অধিকার প্রসঙ্গ :

“কিন্তু সারদানন্দ সম্বন্ধে কোনোই ভয় নেই—আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীর আশীর্বাদ সে পেয়েছে।”

মিস ওয়ালডো-র অধিকার প্রসঙ্গ :

“তুমি নিজে শিক্ষা দিতে শুরু করছ না কেন? সাহসের সঙ্গে লেগে পড়ো। জগন্মাতা তোমাকে সর্বপ্রকার শক্তি দান করবেন—হাজার-হাজার মানুষ তোমার কাছে আসবে। ঝাঁপ দাও। একে ধরা, ওকে ধরা আর নয়। রামকৃষ্ণের সন্তানেরা যেখানেই সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে সেখানেই তিনি তাদের সঙ্গী। তুমি ঐ রায় ছোকরাটির থেকে হাজার গুণ বেশি দর্শন জানো। বেদান্তের বিষয়ে তুমি কী-না জানো? যুক্তিতর্কসহ বেদান্তকে তুমি ঐ রায় ছোকরার চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি ভালভাবে উপস্থিত করতে পারবে। ঝাঁপিয়ে পড়ো। পৃথিবী টলিয়ে দিতে পারবে—নিজের সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস রাখো। ক্লাসের নোটিস বার করে নিয়মিত ক্লাস নাও, বক্তৃতা করো। গুডইয়ার এবং অন্যান্যরা তোমাকে সাহায্য করে যাবে। কোনো হিন্দু, এমনকি সে যদি আমার গুরুভাই হয়ও, আমেরিকায় সাফল্য অর্জন করছে দেখলে আমি যত-না খুশি হব, তার চেয়ে তোমাদের মধ্যে কারো সাফল্যে আমি হাজার গুণ বেশি আনন্দিত হব। ‘মানুষ জয় চায় সর্বত্র, কিন্তু পরাজয় মাগে নিজের সংতানের কাছে।’ আমি আজ থেকে তোমাদের সকলের জন্য শক্তিশালী চিন্তা প্রেরণ করতে শুরু করব। জ্বালাও জ্বালাও—চারিদিকে আগুন লাগাও।”

মিস ওয়ালডো ঝাঁপ দিয়েছিলেন—অন্তত ১৮৯৬ সালের শেষ তিন মাসের জন্য। মিসেস বুলকে চিঠি লিখে ত্রুটিস্বীকারের ভঙ্গিতে ভুল-বোঝাবুঝি মিটিয়েও নিয়েছিলেন (২৭ অক্টোবর ১৮৯৬)। মিসেস বুল তাঁর পত্রের উত্তরে বলেন, “আমি একান্তই আশা করি, (তোমার বিষয়ে) বিবেকানন্দের কথাগুলি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার উক্তি বলে প্রমাণিত হবে।” মিসেস বুল তাঁর ঈষৎ জটিল ভাষায় আরো লেখেন, “আমি বিশ্বাস করি, এমন সময় আসতে পারে যখন স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভক্তি এবং উত্তম সেবার মনোভাব আমাদের সকলের স্থিরসঙ্কল্প আনুগত্যে আত্মপ্রকাশ করবে, যাতে থাকবে অভিব্যক্তির ঐক্য এবং পারস্পরিক বিবেচনাশীলতা।”

অচিরে মিস ওয়ালডো-র সাফল্য ঘটেছিল। লুইস বার্ক একটি আমেরিকান সংবাদপত্রের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন :

“স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব-ধর্মসভায় আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। ইংল্যান্ডে (প্রচারকাজে) যাওয়ার পর থেকে তিনি এখানের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য মিস ওয়ালডো-কে প্রণোদিত করেছেন,

কেননা তাঁর বিবেচনায় ইনিই এদেশে তাঁর সর্বাধিক সামর্থ্যসম্পন্ন এবং শ্রেষ্ঠ-অনুশীলিত ছাত্র। স্বামীজীর আগমনের পূর্বে মিস ওয়ালডো দর্শনের নানা শাখা সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন, ম্যাক্সমূলারের রচনাদির অভিনিবিষ্ট পাঠক। গত চার বৎসরের ঐকান্তিক ও অধ্যবসায়যুক্ত পাঠাদির পরে তিনি এখন নিজস্ব-ভাবে শিক্ষাদান করবেন।...তিনি র‍্যালফ্ ওয়ালডো এমার্সনের আত্মীয়া, তাঁর রচনাদির ঘনিষ্ঠ অনুশীলনকারী।"

মিস ওয়ালডো-র সাফল্যের বিষয়ে মিস ফিলিপস্ সোৎসাহে মিসেস বুলকে চিঠি লেখেন (১৪ নভেম্বর, ১৮৯৬)। তার মধ্যে পাই: "স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে লিখেছেন, যতক্ষণ না আমেরিকানরা বেদান্তশিক্ষা দিচ্ছে ততক্ষণ বেদান্ত আমেরিকায় সাফল্য অর্জন করবে না, আর তাঁর শতসংখ্যক স্বদেশবাসী ভ্রাতার সাফল্যে তিনি যত-না গর্ববোধ করবেন তারও বেশি গর্বিত হবেন তাঁর নিজের কোনো ছাত্রের সাফল্যে। দৃঢ়তম ভাষায় তিনি মিস ওয়ালডো-কে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করতে বলেছেন। মিস ওয়ালডো অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশেষে স্বীকৃত হয়েছেন।...বক্তৃতাশেষে ঘণ্টাখানেক প্রশ্নোত্তর চলে, দেখে মনে হচ্ছিল শ্রোতারা বাড়ি ফিরতে অনিচ্ছুক।...আপনার মনে থাকতে পারে, মিঃ এবং মিসেস এডওয়ার্ড মোরান-এর স্টুডিওতে আমরা একবার কিছু-সময় কাটিয়ে-ছিলাম—তাঁরা মিস ওয়ালডো-কে তাঁর সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি এবং বিষয়কে যুক্তিসিদ্ধভাবে উপস্থিত করার জন্য অভিনন্দন জানান। সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি হলেও বৈঠকখানা লোকে ভর্তি ছিল।"[৯]

'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৩ মার্চ ১৮৯৭ তারিখের সংখ্যায় আমেরিকা থেকে প্রেরিত পত্রে উপরে উদ্ধৃত আমেরিকান সংবাদপত্রের অনুরূপ সংবাদ ছিল (মিস ওয়ালডো-র এমার্সন ও ম্যাক্সমূলারের রচনাচর্চা, তাঁর প্রচারসাফল্য ইত্যাদি)। সেই সঙ্গে আরো পাই: "মিস ওয়ালডো গত গ্রীষ্মে 'মনস্লাবত স্কুল অব কমপ্যারেটিভ রিলিজিয়নস্'-এ এবং ইলিয়ট মেইনের গ্রীনএকার-এ স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হন এবং প্রধানত তাঁরই প্রভাবে নিউইয়র্কের ছাত্ররা এই শীতঋতুতে স্বামী সারদানন্দের মূল্যবান সহায়তা লাভ করতে পেরেছে।"[১০] 'ব্রহ্মবাদিন'-এ আরো কয়েকবার মিস ওয়ালডো-র কার্যাবলীর খবর বেরিয়েছিল।

॥ ৬ ॥

না, ক্লাস-ঘরে শিক্ষাদান বা মঞ্চে বক্তৃতাদানের জন্য মিস ওয়ালডো আমাদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় নন! তাঁর অসাধারণ ভূমিকার গৌরব অন্যত্র—স্বামীজীর বাণীপ্রবাহকে কিছু অংশে অন্তত রচনাপুটে রক্ষা করার সামর্থ্যে। বৃহৎ সভায় বাগ্মী ভূমিকা থেকে বহুলাংশে নিজেকে গুটিয়ে এনে স্বামীজী যখন নির্দিষ্টভাবে অভিনিবিষ্ট ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, তার সূচনা-বৎসর ১৮৯৫ সালে আমরা একমাত্র মিস ওয়ালডো-কেই পাই সেইসকল অনন্য উচ্চারণের কিছুটা রক্ষা করার কাজে। নিকট ছাত্রদের কাছে স্বামীজীর

অপূর্ব শিক্ষাদানের দিনগুলির স্মরণে মিস ওয়ালডো লিখেছেন :

"সেই প্রথম ক্লাসগুলি! কী গভীরভাবে প্রাণ-মনোহারী তারা। সেসব শোনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা কি কখনো ভুলতে পারবে? স্বামীজী—তিনি যেমন মর্যাদাময় তেমনই সহজ-সরল—আর কী-না সাবলীল-প্রবাহিত বাণীময়। তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্রগোষ্ঠী সকল অসুবিধা সহ্য করে, শ্বাস বন্ধ করে, প্রতিটি শব্দ নিঃশেষে পান করতে চাইত।"[১১]

স্বামীজীর কর্মজীবনে ১৮৯৫ সালের গুরুত্ব সম্বন্ধে লুইস বার্কের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "১৮৯৫ সালে স্বামীজীর কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে এমন অজস্র ক্লাস, যাদের উল্লেখ পাই না, যেগুলি অপরপক্ষে নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যে তাঁর মূল শিক্ষাদানের অংশবিশেষ। কিন্তু এই বৎসরে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার অতি অল্প অংশই মুদ্রিত আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।...এই পর্বে স্বামীজীর ক্লাস ও বক্তৃতা সংরক্ষণের কোনো চেষ্টা হয়েছিল বলে মনে হয় না। ইতস্তত যেসব উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে সন্দেহ থাকে না যে, নিউইয়র্কের ক্লাসগুলিতে তিনি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর নিউইয়র্ক বক্তৃতার মাত্র পাঁচটির নাম আমরা জেনেছি, কিন্তু সেই পাঁচটি থেকেই অনেক কিছু বেরিয়ে আসে। সেগুলি হলো : 'বেদান্ত ফিলজফি', 'সায়েন্স অব রিলিজিয়ন', 'র‍্যাশনেল অব যোগ', 'হোয়াট ইজ বেদান্ত' এবং 'হোয়াট ইজ যোগ'! স্পষ্টত, স্বামীজী বেদান্তদর্শন এবং বেদান্তসাধনা সম্বন্ধে তাঁর সুমহৎ শিক্ষাদান শুরু করে দিয়েছিলেন, যা ঠিক পরবর্তী মরশুমে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে স্থায়ী আকার ধারণ করবে। লন্ডনে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতার নাম 'সেলফ্ নলেজ'—যা একই প্রকার অর্থদ্যোতক।"[১২]

অপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে শ্রীমতী বার্ক একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেছেন, "ক্ষীণকায় কিন্তু অমূল্য ইন্‌সপায়ার্ড টক্‌স্ (দেববাণী) গ্রন্থটি", যে-গ্রন্থ কেবল ১৮৯৫ সালে প্রাপ্ত সম্পদ নয়, স্বামীজীর সমগ্র কর্মজীবনের অনন্য সম্পদ—সে-বিষয়ে স্বীকৃতি আমরা আগেই দেখেছি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের রচনা থেকে। ১৮৯৫ সালের শূন্যভূমিতে এই 'অমূল্য' রত্নটি অধিক ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান।

শ্রীমতী বার্ক মিস ওয়ালডো-র দ্বারা সংগৃহীত আর একটি সম্পদের উল্লেখ করেছেন এবং তার দ্বারা মিস ওয়ালডো নবতর গৌরবে ভূষিত হন। শ্রীমতী বার্ক লিখেছেন : "নিউইয়র্ক ক্লাসের প্রথম পর্যায়ের কোনো নোট আমরা পাই নি, এমন একটা ধারণা বলবৎ আছে। কিন্তু স্বামীজীর 'কমপ্লিট ওয়ার্ক‌স্'-এর অষ্টম খণ্ডে নয় ভাগে বিভক্ত 'ডিসকোর্সেস্ অন জ্ঞানযোগ'-এর বেশি অংশ মিস ওয়ালডো ১৮৯৫-এর গোড়ার দিকে ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩ স্ট্রীটে টানা হাতে লিখে নেন, এমন সম্ভাবনা খুবই আছে। **তা যদি সত্যই হয় (ধরে নেওয়া যাক তাই সত্য) তাহলে আমরা স্বামীজীর প্রথমদিকের জ্ঞানযোগ ক্লাসের চমৎকার বিবরণ পাচ্ছি।**"[১৩]

'কমপ্লিট ওয়ার্ক‌স্'-এর অষ্টম খণ্ডে (৩য় সংস্করণ, ১৯৫৯) এই ডিসকোর্স-গুলির মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যা কিছু-বেশি ৩২। সেখানে পাদটীকায় আছে :

"এই আলোচনাগুলি প্রথমত লিখে নেন স্বামীজীর বিশিষ্ট আমেরিকান শিষ্যা মিস এস ই ওয়ালডো। স্বামী সারদানন্দ আমেরিকায় থাকাকালে (১৮৯৬) এগুলি মিস ওয়ালডো-র নোট বই থেকে কপি করে নেন।"

এই আলোচনাগুলি সত্যই স্বামীজীর প্রথম সংগৃহীত ক্লাস-নোট কিনা, সে-বিষয়ে শ্রীমতী বার্ক বিচার করেছেন, এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন : (ক) এই আলোচনা ১৮৯৫-এ করা হয়েছে, ১৮৯৬ সালে করা হয়নি, (খ) ব্রুকলিনে প্রদত্তও নয়। তবে প্রথম লিখিত ক্লাস নোট কী, সে-সম্বন্ধে ভিন্নতর একটি সম্ভাবনার কথাও বলছেন। 'কমপ্লিট ওয়ার্কস্'-এর অষ্টম খণ্ডে 'সিক্স লেসেন্স্ অন রাজযোগ' বলে যে ক্ষুদ্র গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার আলোচনাগুলি ১৮৯৪ ডিসেম্বরে ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজে কৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই 'সিক্স লেসেন্স্'-ই পাশ্চাত্ত্যভূমে স্বামীজীর প্রথম ক্লাস-নোট।[১৪]

এই বিচার শ্রীমতী বার্ক অধ্যায়শেষে সংযোজিত নোট-এর মধ্যে করেছেন। কিন্তু রচনার মূল অংশে মিস ওয়ালডো-র 'ডিসকোর্সেস্ অব জ্ঞানযোগ'-ই প্রথম সম্ভাবিত ক্লাস-নোট, এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করেছেন।

বিবেকানন্দ-বাণীর ধারকরূপে মিস ওয়ালডো-র ভূমিকা এখানেই শেষ নয়। ঠিক পরের ১৮৯৬ সালকে 'স্বর্ণশস্যের বৎসর' রূপে চিহ্নিত করে শ্রীমতী বার্ক লিখেছেন :

"এই পর্বে স্বামীজী তাঁর প্রথম পাশ্চাত্ত্য সফরের আদি বাণী প্রকাশক প্রায় সকল রচনাই দান করেছেন। এই পর্বের অমূল্য রত্নাবলীর মধ্যে আছে 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'রাজযোগ' এবং 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থগুলি। এর উপরে সম্পূর্ণ রচনাবলীতে ১৮৯৬ সালে আমেরিকা ও লণ্ডনে প্রদত্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও ক্লাস-নোট রয়েছে। যথা নিউইয়র্ক-ক্লাসে সাংখ্য ও বেদান্তের উপরে প্রদত্ত আটটি বক্তৃতা, যা পরে 'দি সায়েন্স অ্যাণ্ড ফিলজফি অব রিলিজন' নামে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে আছে ভক্তিযোগের উপরে ক্লাসে-প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতা, 'দি বেদান্ত ফিলজফি' নামে হার্ভার্ড বক্তৃতা, 'বেদান্ত অ্যাণ্ড প্রিভিলেজ' ইত্যাদি লণ্ডনের ক্লাসে প্রদত্ত অনেকগুলি বক্তৃতা (যা জ্ঞানযোগের অন্তর্ভুক্ত হয়নি) এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে দুটি বক্তৃতা (যে-দুটি সম্পূর্ণ রচনাবলীতে আছে এবং একত্র করে 'মাই মাস্টার' নামে বেরিয়েছে)।"[১৫]

কোনো সন্দেহ নেই, ১৮৯৬ সালের গোড়া থেকে স্বামীজীর কাজে নিযুক্ত জোসিয়া গুডউইনের পরিশ্রমের ফলেই এই বৎসরের রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে—কিন্তু প্রকাশিত রচনাসমূহের কিছু অংশের সঙ্গে সরাসরি ভূমিকায় এবং বাকি বড় অংশের প্রকাশ ব্যাপারে সহায়কের ভূমিকায় আমরা মিস ওয়ালডো-কে পাই। মিস ওয়ালডো অবশ্য মূল গৌরব গুডউইনের উপরই অর্পণ করেছেন। গুডউইনের সঙ্গে বেদান্ত সোসাইটির ব্যাপারে মিস ওয়ালডোর পূর্ব-কথিত সংঘর্ষের পটভূমিকায় অত্যন্ত উদারতার পরিচায়ক তাঁর নিম্নোক্ত কথাগুলি :

"এই সময়ে (১৮৯৬-এর গোড়ার দিকে) একজন অসাধারণ সামর্থ্যযুক্ত

স্টেনোগ্রাফারকে নিযুক্ত করা গিয়েছিল, পরবর্তী কালে যিনি নিজের (বৃত্তিনির্ভর) কাজকে অনুগামী ভক্তের সেবায় রূপান্তরিত করেন। স্বামীজী ও তাঁর শিক্ষার প্রতি ওঁর এমনই আকর্ষণ জন্মায় যে, কোনো পরিশ্রমের কাজের ব্যাপারে কখনো পেছপাও হন নি। পরে উনি স্বামীজীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও ভারতে যান এবং সম্পূর্ণত ওঁর প্রয়াসেই ঐসব দেশে স্বামীজীর বক্তৃতাবলী সংরক্ষিত করা গেছে। নিউইয়র্কে থাকাকালে ওঁর পরিশ্রমের ফল—রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ গ্রন্থগুলি—তাছাড়া রবিবারের বক্তৃতা থেকে প্রস্তুত পুস্তিকাগুলি। নিউইয়র্কে প্রদত্ত জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি কিন্তু কখনই প্রকাশিত হয় নি, যদিও তারা স্বামীজীর সর্বোত্তম বক্তৃতাবলীর মধ্যে পড়ে। 'জ্ঞানযোগ' নামে যে-গ্রন্থ প্রচলিত তা ইংল্যাণ্ড ও ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংকলন!"[১৬]

এই কথাগুলি মিস ওয়ালডো-র ১৯০৬ সালের গোড়ায় লেখা এক রচনার অংশ। তারও আগে, স্বামীজীর দেহান্তের অল্প পরে, আমেরিকার 'অ্যানুবিস' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মিস ওয়ালডো অনুরূপ কথা লিখেছিলেন।[১৭] নিউইয়র্ক থেকে মিস ওয়ালডো-র ১৯০৮ সালে পাঠানো যে-লেখাটি 'দেববাণী'র প্রস্তাবনা-রূপে গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যেও গুডউইনের ভূমিকার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায়। প্রায় চরম কথা তিনি বলেছেন গুডউইনের সংকেতলিপিতে গৃহীত স্বামীজীর ১৮৯৬ সালে নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে :

"এই পুস্তকগুলি এবং সাধারণ সভায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা থেকে প্রস্তুত পুস্তিকাগুলি, স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় কাজের স্থায়ী স্মারকরূপে এখন বর্তমান। **আমাদের মধ্যে যাঁদের সেইসকল বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা অনুভব করেন—স্বামীজী যেন এই সব মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি থেকে জীবন্ত আকারে বেরিয়ে এসে কথা বলছেন—এমন নিখুঁতভাবে স্বামীজীর উক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যিনি সে-কাজ করেছেন তিনি স্বামীজীর অত্যন্ত অনুরক্ত শিষ্য হয়ে পড়েন। আচার্য এবং শিষ্য—উভয়েরই কার্য নিষ্কাম প্রেমময়—তাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ সে কার্যে ন্যস্ত।"**

গুডউইনের কাজের মূল্য অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। কিন্তু স্মর্তব্য, যোগগ্রন্থগুলি প্রস্তুতের ও প্রকাশের ব্যাপারে মিস ওয়ালডো স্বভাব অনুযায়ী নিজ ভূমিকার কথা গোপন করেছেন।

স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীতে পাদটীকায় মিস ওয়ালডো-র সাহায্যের কিছু উল্লেখ আছে। তার মধ্যে 'ডিসকোর্সেস অন জ্ঞানযোগ'-এর কথা আগেই জানিয়েছি। স্বামীজী ৩০ মার্চ ১৯০০ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লিখেছেন, "সংযোজনসুদ্ধ কর্মযোগ সম্পাদনার ঠিক যোগ্য মানুষ হলো মিস ওয়ালডো।"[১৮] মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর ২০ জুলাই ১৯০০ এবং ২৪ জুলাই ১৯০০ তারিখের পত্রে বইয়ের ব্যবস্থাপনা যে মিস ওয়ালডোর উপরই ন্যস্ত, এমন কথা অছে।[১৯] শ্রীমতী লুইস বার্ক স্বামীজীর গ্রন্থাদি সম্পাদনা

ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-র কাজের বিষয়ে আরো সংবাদ দিয়েছেন। দেখা যায়, মিস ওয়ালডো নিউইয়র্কে স্বামীজীর গ্রন্থের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে (এবং পরেও) সেখানে সকলেই কর্মব্যস্ত স্বামীজীর পুস্তক ও পুস্তিকা সম্পাদনা নিয়ে। "টাইপ করছেন গুডউইন (যা তিনি সংকেত-লিপিতে ধরেছেন), সম্পাদনা করছেন মিস ওয়ালডো, দেখে দিচ্ছেন স্বামীজী ; পুনশ্চ টাইপ হচ্ছে, প্রুফ দেখা চলছে, ছাপাখানা থেকে পাণ্ডুলিপি (ও প্রুফ) আসছে যাচ্ছে।"[২০] পুস্তিকার পর পুস্তিকা বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কর্মযোগ' বই সম্বন্ধে আমরা জেনেছি, লণ্ডন থেকে স্টার্ডি নিউইয়র্কে প্রদত্ত স্বামীজীর কর্মযোগ বিষয়ে বক্তৃতাবলী বই হিসাবে বার করে দিয়েছিলেন। সেজন্য নিউইয়র্ক থেকে মিস ওয়ালডো সম্পাদনা করে যে 'কর্মযোগ' বার করলেন, তাতে স্বামীজীর অনুমতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়েছিল। কর্মযোগের নতুন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে মিস ওয়ালডো-র সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দকে স্বামীজী ১৯ মে ১৯০০ তারিখে চিঠিতে সংবাদ দিয়েছেন। নিউইয়র্ক এবং লণ্ডনে প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী-প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা একসঙ্গে জুড়ে 'মাই মাস্টার' নামে প্রকাশ করার ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-র কাজের কথাও আগে বলেছি। ২৪ জুন ১৯০০ তারিখে স্বামীজী 'মাদার ওয়ারশিপ্' বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তার সংক্ষিপ্ত রূপ নিবেদিতা প্রকাশ করেছেন তাঁর 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে—মিস ওয়ালডো-র নোট থেকেই তা করেছিলেন। মিস ওয়ালডো স্বামীজীর জ্ঞানযোগ বিষয়ে বাড়তি বক্তৃতার দ্বারা যে-বইটি প্রস্তুত করেছিলেন, তার শেষ সম্পাদনার ভার তিনি ১৯০১ সালে দেবমাতার উপর দিয়ে দেন—কারণ ইতিমধ্যে তাঁর চোখের শক্তি এমন কমে গিয়েছিল যে, আর চোখ ডুবিয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

গ্রন্থ সম্পাদনার বিষয়ে মিস ওয়ালডো-র প্রধান 'কীর্তি' স্বামীজীর 'রাজযোগ'। এইটিই পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বামীজীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রচারিত বই। সাধারণ মানুষ থেকে সর্বোচ্চস্তরের মনীষীদের পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে বইটি। দার্শনিক উইলিয়ম জেমস, বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক গেডেস, সাহিত্যিক টলস্টয়—সকলেই এই গ্রন্থের মহিমায় অভিভূত। এর প্রারম্ভিক কয়েকটি বাক্য তো নিত্য ধর্ম সম্পর্কে সর্বোত্তম উক্তির মধ্যে পড়ে। টলস্টয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "রাজযোগ গ্রন্থটি অসাধারণ। এর থেকে আমি অনেক কিছুই শিক্ষা করেছি। এর মধ্যে প্রকাশিত বিশুদ্ধ, সমুচ্চ এবং স্বচ্ছ জীবনদর্শন থেকে মানবসমাজ প্রায়ই পিছিয়ে পড়েছে কিন্তু কদাপি একে অতিক্রম করতে পারে নি।"

শ্রীমতী বার্ক স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য অনুরাগীদের পত্র এবং অন্য তথ্যসূত্র থেকে 'রাজযোগ' সম্পাদনা এবং প্রকাশের বিষয়ে মিস ওয়ালডো-র পরিশ্রম, যত্ন এবং উৎকণ্ঠার নানা সংবাদ দিয়েছেন। ১৮৯৬ ফেব্রুআরির শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্ক ত্যাগের আগে স্বামীজী খুবই ব্যস্তভাবে রাজযোগের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেন। তারপর সেটি ধরিয়ে দেন মিস ওয়ালডো-র হাতে। ফলে কিছুটা

বিপাকে পড়ে মিস ওয়ালডো ৬ মার্চ ১৮৯৬, মিসেস বুলকে লেখেন : "রাজযোগ নিয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখন কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। স্বামীজী এর শেষের অংশ এত তাড়াহুড়ো করে সংশোধন করেছিলেন যে, তাকে সন্তোষজনক আকার দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আহা, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে ছাপতে দেবার আগে আপনাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিতাম। এই বইটির বিষয়ে একলা সিদ্ধান্ত নেওয়া অতি গুরুতর দায়িত্বের কাজ বলে মনে হচ্ছে।"

এর পর 'রাজযোগ' কিভাবে ছাপা হবে, বিভিন্ন বিষয়ে কত খরচ হবে, কী তার আকার দাঁড়াবে, এসব সম্বন্ধে অনেক দিন চিন্তাভাবনা করে, গোটা ব্যাপারটা যখন মিস ওয়ালডো সমাধা করে এনেছেন, ঠিক তখনই দেখা গেল, স্টার্ডি ইংল্যান্ড থেকে বইটি বিনা অনুমতিতে বার করে দিয়েছেন। এতে মিস ওয়ালডো-র অপরিসীম মর্মযাতনার কথা আগেই বলেছি। এই সময় তাঁর লেখা নানা চিঠিপত্রে তার পরিচয় আছে। তিনি কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো অভিযোগ করেন নি, সবই সহ্য করেছিলেন। তবে তাঁর অনুরক্ত-ভক্ত সিস্টার দেবমাতা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ১৯৩২ মে সংখ্যার রচনায় ক্ষোভ না জানিয়ে পারেন নি :

"রাজযোগের পাণ্ডুলিপি শেষ হবার পরে মিস ওয়ালডো-র উপর তার প্রকাশের ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশের পূর্বে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা মানসিক দুঃখভোগ তাঁর বরাতে ছিল। স্বামীজীর আর এক অনুরাগী ভক্ত সেই পাণ্ডুলিপি লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে প্রকাশ করে দিলেন, যেহেতু তাঁর মনে হয়েছিল, ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হলে স্বামীজীর স্বার্থরক্ষা হবে। ফলে কিছু সময়ের জন্য আমেরিকান সংস্করণের প্রকাশ বন্ধ রাখতে হয়। পরে অপরিচিত শব্দের অর্থ ও অন্য নানা বস্তু যোগ করে তবে আমেরিকান সংস্করণের স্বত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। সেই 'সংশোধন ও সংযোজনগুলিকেও' স্বত্ব-সংরক্ষিত করা হয়।"

'রাজযোগ' গ্রন্থটি মিস ওয়ালডো-র জীবন ও অনুভূতির সঙ্গে কোন্ নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত তা দেবমাতার স্মৃতিকথন ভিন্ন বোঝা সম্ভব ছিল না। একই রচনায় তিনি লিখেছেন :

> "আমেরিকায় স্বামীজীর প্রথমবারের অবস্থানকালেই 'রাজযোগ' রূপ-লাভ করে। এর বড় অংশ স্বামীজী বলে যান আর মিস ওয়ালডো টানা-হাতে লিখে নেন। কাজের সেই প্রহরগুলি ছিল মিস ওয়ালডো-র কাছে পরম বাঞ্ছিত নিবিড় সুখের সময়। সে দিনগুলির কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। প্রতিদিন স্বামীজীর খাবার তৈরি করে, রান্নাঘরের কাজ সেরে, তিনি পিছনের বসার ঘরে চলে আসতেন, স্বামীজী সেখানেই থাকতেন। মিস ওয়ালডো টেবিলে বসতেন, টেবিলে থাকত খোলা দোয়াতদানি, তাতে কলম ডুবিয়ে নিতেন। শুরু থেকে সেইদিনের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি কলমের কালি কখনো শুকোতে দিতেন না, অত্যন্ত

সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতেন স্বামীজীর কণ্ঠোৎসারিত দ্রুত প্রবাহিত বাক্যরাজিকে ধরে নিতে—যা হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে আসত স্বামীজীর ভিতর থেকে স্রোত-ধারায়। কখনো-বা স্বামীজী সূত্রবিশেষের সংস্কৃত শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ চিন্তাকালে তীক্ষ্ণ মনঃসংযমের নীরবতায় নিষ্কম্প হয়ে যেতেন—তখনো কলম কালিতে ডোবানো থাকত—কেননা যে-কোনো মুহূর্তেই ঝলসে উঠতে পারে শব্দাবলী।"

আমেরিকায় বিবেকানন্দ-সাহিত্য ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-র কর্মকৃতিত্বের স্বীকৃতি আছে স্বামী অভেদানন্দের ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখের ডায়েরী নোটে :

"মিস ওয়ালডো বয়স্ক মাতৃভাবাপন্ন মহিলা, পাশ্চাত্যদর্শনে সুশিক্ষিত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত শিষ্যা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেছেন। তিনি অদ্যাবধি অবিবাহিত, বয়স প্রায় ৪৫। (না, যথার্থত ৫২)। তিনিই স্বামী বিবেকানন্দের সকল বক্তৃতা পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করেছেন—সেগুলি পরে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে।"[২১]

॥ ৭ ॥

মিস ওয়ালডো কিন্তু অমরতার বসনপ্রান্ত স্পর্শ করেছেন অন্য একটি ক্ষেত্রে—যার উল্লেখ আগেই করেছি—দেববাণীর গণেশ-লেখক তিনি। দেববাণী কোন্ পটভূমিকায় উচ্চারিত, আমেরিকার সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর কোন্ অবাধিত অধ্যাত্ম ভাব-উন্মোচন দেখা গিয়েছিল—সেই কাহিনী তাঁর জীবনীতে বিস্তারিত মূল্যযুক্ত। সকল বিবরণেই দেখি, স্বামীজী দ্বীপোদ্যানে প্রায় দুই মাসের অবস্থানকালে নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পেয়েছিলেন। আর বিবেকানন্দের নিজেকে ফিরে পাওয়া মানে নিছক উৎস-স্নান নয়—স্বয়ং উৎসবারিতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া।

বছর খানেকের উপর আমেরিকায় একটানা নিদারুণ পরিশ্রম, পুরাতন পোশাক ফেলে দিয়ে নূতন বর্মের অঙ্গসাজ, যুদ্ধধ্বনি এবং বাস্তব যুদ্ধ—বিবেকানন্দকে ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত করে ফেলেছিল। মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক স্তরে আত্মনিগড়ে বদ্ধ পাশ্চাত্য মানুষদের কঠিন প্রতিরোধের বিরুদ্ধে তাঁর কঠিনতম একক সংগ্রাম। এখন কিছু বিরতি চাই—যখন ধাবিত অগ্নি-শিখা না হয়ে স্থিরজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হতে পারবেন।

সেই সুযোগ এসে গেল। তাঁর এক ছাত্রী, মিস মেরী এলিজাবেথ ডাচারের একটি ক্ষুদ্র বাড়ি ছিল—সেণ্ট লরেন্স নদীতে হাজারখানেক ছোট-ছোট দ্বীপের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ—'সহস্রদ্বীপোদ্যানে।' আমন্ত্রণ স্বীকার করে সেখানে যাবেন—স্বামীজী স্থির করলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত কয়েকজনকে সেখানে যোগদান করার আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল। স্বামীজী সেই দ্বীপে পৌঁছলেন

১৮ জ্বন ১৮৯৫—সেখানে অবস্থান করেন ৬ অগস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত। ৭ অগস্ট সেই দ্বীপখণ্ড ছেড়ে আসেন। সেখানে স্বামীজী কোন্ আকারে বর্তমান ছিলেন তা সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যায় তাঁর ইংরেজী জীবনী থেকে (সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬):

> "সেণ্ট লরেন্স নদীর ধারেই একদিন স্বামীজী ধ্যানকালে চরম ভাবোন্মাদনায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ করেন—যা আগে কাশীপুরে থাকার পুণ্যময় দিনে তাঁর জীবনে একবার ঘটেছিল। যদিও এই সময়ে এই ব্যাপারে তিনি কাউকে কিছু বলেন নি, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে নিজ জীবনের সর্বোচ্চ অনুভূতিসমূহের অন্তর্গত মনে করতেন। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে আধ্যাত্মিক ভাবোন্মাদনার উল্লাসময় যে ঘূর্ণা-প্রবাহ একদা ভক্তগণের হৃদয় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—তাই যেন আবার নবপ্রবাহে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সহস্র দ্বীপোদ্যানের ভক্তদের প্রাণমনকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা এবং স্বামীজীর উপলব্ধি এই ভূমিতে বিশাল অগ্নিকুণ্ডের মতো নিরন্তর প্রজ্বলিত থেকে দগ্ধ করেছিল অজ্ঞান-অন্ধকারকে।"

এখানে উপস্থিত ভক্তগণের সকলেই জন্মসূত্রে অন্তত খ্রীস্টান। দুটি ঘটনা এঁদের কাছে রূপকার্থ লাভ করেছিল। এক, মিস ডাচারের বাড়িটি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। তাই এখানে প্রদত্ত উপদেশ—'শৈলোপরি প্রদত্ত উপদেশ।' দুই, আমন্ত্রণপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে দশজন প্রথমে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে দেখা গেল, আরো দুজন (ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল এবং মেরী ফাঙ্ক) অনিমন্ত্রিত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছেন। ফলে 'দ্বাদশজন শিষ্য উপস্থিত।' (পিটার ও জুডাসের ছায়া পরে দলের দু'জনের উপরে পড়েছিল)

সহস্র দ্বীপোদ্যান গ্রীষ্ম-ঋতুতে অবসর বিনোদনকারীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত। তবু এঁদের জন্য রক্ষিত ছিল মহামৌনের প্রচ্ছদ—গুহাহিত বাণীর নির্গমনের পরিবেশ রচনা করতে। বাড়িটির বর্ণনা মিস ওয়ালডো এইভাবে করেছেন:

"আদর্শ স্থানটি! উচ্চভূমিতে স্থাপিত, সেখান থেকে দেখা যায় অতি সুন্দর নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি, তার মধ্যে দূরে অবস্থিত দ্বীপগুলি। অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা যেত ক্লেটন; উত্তরদিকে, নিকটতর ও বিস্তৃততর কানাডা উপকূলের তটবন্ধন। কুটিরটি পাহাড়ের এক ধারে অবস্থিত। তার পরেই উত্তর-পশ্চিম দিকে খাড়া ঢাল নেমে গেছে নদীতটে—এবং যে-নদীখাড়ি ভিতরে ঢুকে এসে ক্ষুদ্র হ্রদের আকার নিয়েছে—তারই প্রান্তে বাড়িটি, আক্ষরিক-ভাবে 'পর্বতোপরি নির্মিত।' চারিদিকে ছড়ানো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর। [স্বামীজীর জন্য] নবনির্মিত অংশটি পাহাড়ের খাড়াই অংশের উপর অবস্থিত, তিনতলা উঁচু, তার সামনে দুইতলা, পিছনের অংশে তিনদিকে জানালা—তার

ফলে পিছনের অংশ বিরাট বাতিঘরের মতো দেখাত।"

স্বামীজী যে-দিকটায় উপরতলায় থাকতেন, তার লাগোয়া বারান্দায় 'সান্ধ্য কথোপকথন হতো।' এই বারান্দাটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায় রেখাঙ্কিত।

"এইখানে নিত্য কক্ষদ্বারের নিকটে বসে প্রিয় আচার্যদেব আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধ্যায় কথাবার্তা বলতেন, অন্ধকারে আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম আর তৃষিতচিত্তে পান করতাম তাঁর দিব্যবাণী। স্থানটি সত্যসত্যই পুণ্যনিকেতন। নিম্নে বিস্তীর্ণ বৃক্ষরাজি, তা বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে সবুজ-সমুদ্রের রূপ ধরত—সমস্ত জায়গাটি ঘন বনে আচ্ছন্ন। বৃহৎ গ্রামটির কোনো বাড়িই সেখান থেকে দেখা যেত না। তাই মনে হতো, আমরা যেন লোকালয় থেকে বহুদূরে কোনো নিবিড় অরণ্যের কেন্দ্রে রয়েছি। বৃক্ষশ্রেণীর শেষে সেণ্ট লরেন্স নদীর বিপুল বিস্তার, মাঝে-মাঝে বিন্দুচিহ্নের মতো দ্বীপগুলি, তাদের কোনো-কোনোটিতে হোটেল বা বোর্ডিং-হাউসের উজ্জ্বল আলোকের ঝিকিমিকি। সে সকলই এত দূরবর্তী যে, মনে হতো, ওরা বাস্তব নয়—নিতান্তই আঁকা ছবি। আমাদের এই নির্জনবাসে বাইরের কোনো মানবকণ্ঠ প্রবেশ করত না; আমরা শুধু শুনতাম কীটপতঙ্গের অস্ফুট স্বর, পাখিদের মধুর সঙ্গীত, বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসের মৃদুমর্মর। এই দৃশ্য কিছু সময় মৃদুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্‌ভাসিত ছিল—নীচে সমুজ্জ্বল জলরাশির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হতো চন্দ্রমুখ। এহেন মায়ালোকে আমরা প্রিয় আচার্যদেবের সঙ্গে পরমপুণ্যের সাত সপ্তাহ কাটিয়েছি, শুনে গেছি তাঁর বাণী। সে সময়ে আমরা জগৎকে ভুলেছিলাম, জগৎও আমাদের ভুলেছিল।"[২২]

এই সহস্র দ্বীপোদ্যানেই স্বামীজী তাঁর যে-হৃদয়রত্নকে বিরূপ পাশ্চাত্ত্য-পরিবেশে এতদিন গোপন করে রেখেছিলেন, তাকে সুকোমল ভক্তির আলোকে উন্মোচন করে দেখান। "এইসব কথোপকথন কালেই স্বামীজী সর্বপ্রথম আমাদের কাছে তাঁর মহান্ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।" রামকৃষ্ণের অপরিমেয় জীবনের ভিতর থেকে উত্থিত বিবেকানন্দকে যখন এঁরা কথা বলতে শুনেছিলেন, তখন এঁদের মনে হয়েছিল,

"যেন তাঁর গুরুদেবই সূক্ষ্ম শরীরে তাঁর কণ্ঠ অবলম্বন করে আমাদের কাছে কথা বলছেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটিয়ে দিচ্ছেন, দূর করে দিচ্ছেন সকল ভয়-ভাবনা। অনেক সময়ে স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতি ভুলে যেতেন—তখন পাছে তাঁর চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়ে ফেলি, আমরা সেই আশঙ্কায় যেন শ্বাসরোধ করে থাকতাম। তিনি আসন থেকে উঠে বারান্দার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করতে

করতে অনর্গল কথা বলে যেতেন,...তিনি যেন, তখন মনে হতো, নিজের আত্মার সঙ্গে কথা বলছেন, শিষ্যরা শুধু শুনে যাচ্ছেন।"২৩

সহস্র দ্বীপোদ্যানের পূর্বে এবং পরে বিবেকানন্দকে নিকট থেকে শিক্ষাদানের কাজে নিরত দেখেছেন মিস ওয়ালডো। সর্বদাই স্বামীজী অনন্য। তবু মিস ওয়ালডো-র মনে হয়েছে, স্বামীজী এই দ্বীপোদ্যানেই দিবারাত্র প্রাণখুলে যা-কিছু শ্রেষ্ঠবস্তু তাই শিক্ষা দিয়েছেন। "আর কোনো ভাগ্যবান ছাত্রমণ্ডলী এমন প্রতিভাবান আচার্যলাভ করে নিজেদের ধন্য করার সুযোগ পেয়েছে কিনা সন্দেহ।"

তাই বলে শিক্ষার বিষয়গুলি মোটেই সহজ-সরল ছিল না। স্বামীজী যেখানে ভক্তির কথা বলেছেন, সেও 'নারদীয় ভক্তিসূত্র', যাতে দেখা যায়, সর্বগ্রাসী ঈশ্বরপ্রেম ভক্তকে উন্মাদ করে তোলে এবং এগিয়ে দেয় ঈশ্বরের সঙ্গে **তাদাত্ম্যলাভের পথে**। স্বামীজী ব্যাখ্যা করতেন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ ও ব্যাসের বেদান্তসূত্র। অত্যন্ত স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ বেদান্তসূত্রের নানা ভাষ্য পূর্বে রচনা করেছেন শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব। অসাধারণ তাঁদের প্রতিভা। কিন্তু স্বামীজী নির্ভয়ে দেখালেন, "কিভাবে প্রত্যেক ভাষ্যকার নিজের মতানুযায়ী সূত্রগুলির কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী। কিভাবে তাঁরা যা-কিছু নিজেদের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে, সেইরূপ অর্থ নিঃসঙ্কোচে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সূত্রের মধ্যে।" স্বামীজী সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ। বিষয়টি ছাত্রদের কাছে খুবই কঠিন ছিল। তাঁরা পছন্দ করতেন রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বিবেকানন্দ শুধুই ব্যাখ্যা করতেন—না-কি সৃষ্টি করতেন? সৃষ্টিই করতেন অধিক। তাঁর জ্যোতির্ময় মন আলোকিত করে তুলত অস্তিত্বের গভীর গহন অংশগুলি। প্রতি মুহূর্তে বাণীর বিদ্যুৎ-শর শ্রোতৃবৃন্দের অন্তশ্চেতনাকে বিদ্ধ করে শিহরিত করে তুলত।—

"পূর্ণস্বরূপ যিনি তিনি কখনো অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের মধ্যে থাকলেও অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

"অশুভ হলো লোহার শিকল, আর শুভ হলো সোনার শিকল—কিন্তু দুইই শিকল। মুক্ত হও। আর চিরদিনের জন্য জেনে রাখো—কোনো শৃঙ্খল নেই তোমার।"

"সমগ্র সমুদ্রকে দ্যাখো—তরঙ্গকে নয়। কীট ও দেবতার মধ্যে পার্থক্য দেখো না।"

"ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষেরা ধর্মপ্রচার করতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণের মতো অবতারেরাই কেবল ধর্ম দিতে পারেন। ধর্মদানের পক্ষে তাঁদের শুধু এক চাহনি বা শুধু স্পর্শই যথেষ্ট।"

"শাস্ত্রই শেষ কথা নয়—প্রত্যক্ষীকরণই ধর্মসত্যের একমাত্র প্রমাণ।"

"হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে তখন সে ভালবাসা ছাড়া আর সব-কিছু ভুলে যায়।"

"সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব, যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতি' হব—ততই আধ্যাত্মিক হয়ে উঠব। এই আত্মানন্দকেই বলা হয় ধর্ম।"

"এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—এটি হলো সত্যের ছায়া।"

"সৃষ্টি অনন্ত—তার শুরু নেই, শেষ নেই—অনন্ত হ্রদের উপর সদা গতিশীল তরঙ্গ।"

"জগৎটা আমার জন্য—আমি জগতের জন্য নই।"

"দ্বাদশ বৎসর সাধনার অন্তে দক্ষিণেশ্বরের প্রশান্ত মহাপুরুষ বিপ্লব ঘটিয়েছেন—কেবল ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে। এমন নীরব মহাপুরুষেরাই মহাশক্তির আধার—তাঁরা যাপন করে গেছেন জীবন, আর ভালবেসেছেন—তারপর সরে গেছেন বিশ্বমঞ্চ থেকে। তাঁরা কখনো 'আমি' 'আমার' বলেন নি, তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের যন্ত্র মনে করেই ধন্য বোধ করেছেন। এমন মানুষেরাই হলেন শাশ্বত বুদ্ধ ও খ্রীস্ট, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ একীভূত, শুদ্ধস্বরূপ, আকাঙ্ক্ষারহিত—নিরত নন কোনো সচেতন কর্মে। জগতে সত্যকার আলোড়ন এঁরাই আনেন, এই জীবন্মুক্ত, একেবারে নিঃস্বার্থ, অহংহীন, উচ্চাশাহীন পুরুষেরা। সাধারণ ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে এঁরা বিশুদ্ধ তত্ত্ব-বিগ্রহ।"

"আমাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখনো আসল মুখটাকে দেখতে পাই না, তার প্রতিবিম্বকে কেবল দেখতে হয়। আমরা স্বয়ং প্রেম কিন্তু তার বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। এতেই প্রমাণ হয়, আমরা যাকে জড় বলি সেটা চিৎ-এর বহিঃঅভিব্যক্তি-মাত্র।"

"অনন্ত উন্নতি মানে অনন্ত বন্ধন। তার চেয়ে সকল আকারের ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়। সর্বপ্রকার দেহ এমনকি দেবদেহ থেকেও আমাদের অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে।"

"বৈষম্যই সৃষ্টির মূল ; অভেদই ঈশ্বর।"

"কেবল সত্যের জন্যই সত্যের সন্ধান করো, আনন্দের জন্য সত্যের সন্ধান নয়। আনন্দ আসতে পারে, কিন্তু তা যেন সত্য সন্ধানের প্ররোচক হেতু না হয়।…সত্যের সন্ধানে নরকে যেতেও পেছ-পা হয়ো না।"

"মহান বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ ঘটে—স্বাধীনতা, শক্তি ও সাম্য।"

"যদি স্বাধীনতা তোমাকে আঘাত করে তাহলে যথার্থ স্বাধীন তুমি নও।"

"মূর্খ, শুনতে পাচ্ছ না—তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র ধ্বনিত হচ্ছে অনন্ত সঙ্গীত—সচ্চিদানন্দঃ সোঽহম্ সোঽহম্।"

"যাঁরা খুঁজতে জানেন তাঁদের কাছে সত্যযুগ তো বর্তমান রয়েছেই। আমরা নষ্ট করেছি নিজেদের, আর ভাবছি জগৎ নষ্ট হয়ে গেছে।"

"কাউকে বলো না—তুমি মন্দ। তাকে শুধু বলো—তুমি ভাল, কিন্তু আরো ভাল হও।"

"গীতাকারের মতো আশ্চর্য মস্তিষ্ক মানবসমাজ আর কখনো দেখবে না।"

"জগতে একটিমাত্র শক্তিই আছে—সেটাই কখনো ভালো কখনো মন্দরূপে অভিব্যক্ত। ঈশ্বর ও শয়তান একই নদী—কেবল বিপরীত দিকে প্রবাহিত।"

"ঈশ্বরকে ভালবাসার সময়ে আমরা নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করে ফেলি—'আমি' এবং 'আমার অন্তরাত্মা'—এবং 'আমি' ভালবাসি আমার 'অন্তরাত্মাকে'। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন আমাদের—আমরাও সৃষ্টি করেছি ঈশ্বরকে। ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি আমাদেরই আদলে। তাঁকে প্রভু হবার জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি—ঈশ্বর কিন্তু আমাদের দাস করে সৃষ্টি করেন নি। যখন জানব, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ···তখনই মুক্তি হবে। সেই অনন্ত পুরুষের সঙ্গে একচুলের ব্যবধান আছে চিন্তা করলেও তুমি নির্ভয় হবে না।"

"গ্রন্থ বা শাস্ত্র-উপাসনা সবচেয়ে নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা, তা আমাদের পদ শৃঙ্খলিত করে রাখে। সে কি—সব কিছুকেই শাস্ত্রের অনুগত হতে হবে—কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম, কি দর্শন? বিকটতম এই অত্যাচার—প্রোটেস্টাণ্টদের বাইবেলের অত্যাচার। খ্রীস্টান দেশে প্রতিটি মানুষের মাথার উপরে চাপান আছে প্রকাণ্ড এক গির্জা, তার চূড়োয় বাইবেল—তবু মানুষ বাঁচছে, বাড়ছে। এর দ্বারাই কি প্রমাণিত হচ্ছে না—মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ?"

"মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ ভূমি।"

"সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তারতম্য হয়, এইমাত্র। জ্ঞানের উৎস আমাদেরই ভিতরে—কেবল সেখানেই জ্ঞানলাভ সম্ভব।"

"যে-কোনো ঘৃণার অর্থ আত্মার দ্বারা আত্মার সংহার। তাই প্রেমই যথার্থ জীবননীতি।"

"স্বর্গ, কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়—তা আমাদের বাসনার সৃষ্টি—আর বাসনা সর্বদাই বন্ধন, অবনতির হেতু।"

"সৃষ্টির আদি আছে বললে সকলপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।"

"অভাববোধই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। কিন্তু আমরা কি ভিক্ষুক? আমরা রাজপুত্র।"

"অনন্ত জগৎকে যতই ভাগ করা যাক না কেন তা অনন্তই থাকে—তার প্রতিটি অংশই অনন্ত।"

"যতক্ষণ অপূর্ণ—ততক্ষণই ভোগ, কারণ ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পূর্তি।"

"দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে দাঁড়ায়, আর ধর্মবর্জিত দর্শন হয়ে দাঁড়ায় নীরস নাস্তিকতা।"

"আমরা যেন প্রদীপ—প্রদীপের জ্বলার নামই জীবন। অক্সিজেন ফুরিয়ে

গেলে প্রদীপ নিভে যাবে। আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি।"

"জ্ঞান উৎপাদন করা যায় না—তাকে কেবল আবিষ্কার করা যায়!"

"যে অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা আমরা জগৎপ্রপঞ্চের বাইরে যেতে পারি, সে শক্তি কেবল অদ্বৈতবাদীরাই ব্যবহার করতে সমর্থ। তাঁরা ব্রহ্মসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন। বিবেকানন্দ নামক মনুষ্য নিজেকে ব্রহ্মসত্তায় পরিণত করতে পারে, আবার সেখান থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরতেও পারে। তার পক্ষে তাই মৌল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, গৌণভাবে অপরের সমস্যার সমাধানও—কারণ সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌঁছবার পথ দেখাতে পারে। এইভাবে যেখানে দর্শনের শেষ সেখানে ধর্মের আরম্ভ।"

"ন্যায্য ক্রোধ বলে কোনো জিনিস নেই, কারণ সকল বস্তুতে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধের জন্ম।"

"কাজ চলুক, কিন্তু প্রতিক্রিয়া যেন না আসে। কার্যে সুখ হয়—দুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল।"

"আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকপক্ষে ধর্মের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ যে অখণ্ড, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। দার্শনিকরা যাকে আত্মা বলেন, বৈজ্ঞানিকরা তাকে বলেন বস্তু। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কারণ উভয়ই এক।"

"মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যসঙ্গী—তাকে অর্জন করতে হয় না, কেননা তা আত্মার যথার্থ স্বরূপ।"

"মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়—তার অর্থ মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।"

"ঈশ্বরলাভের জন্য আমরা যে-সকল উপায় অবলম্বন করি, সকলই সত্য। তা হল, ধ্রুব নক্ষত্র দেখবার জন্য তার আশপাশের নক্ষত্রের সাহায্য নেওয়া।"

"নিছক কিছু মতে বিশ্বাস আর নাস্তিকতা একই কথা।"

"ধর্ম নতুন কিছু দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দিয়ে নিজ স্বরূপ দেখতে দেয়।"

"ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে, ভ্রমই ভ্রমকে ভাঙে। একেই বলে মায়া।"

"অসম্পূর্ণতা বলে কিছু আছে, তা ভাবাই অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করা।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তিনি আত্মোন্নতির জন্য তোমাকে এই জগৎরূপ নৈতিক ব্যায়ামশালা দান করেছেন।"

"সত্যের ব্যাপারে কোনো আপস নয়। সত্যের শিক্ষা দাও; কোনো কুসংস্কারের পক্ষে সাফাই গেয়ো না। শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির স্তরে সত্যকে নামিয়ে এনো না।"

"ইহলোক ও পরলোক—দুইই স্বপ্ন। শেষেরটি আবার প্রথমটির ধাঁচে গড়া। ওই দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও।"

"চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে দেখতে পাবে—কোনো বস্তুতে কোনো গতি বা পরিণাম নেই।"

"ধাঁধার ভিতরে লুকানো ছবিটা যদি একবার দেখতে পাও, পরে তা সর্বদাই

দেখতে পাবে।”

“যীশু না জন্মালে মানবজাতির উদ্ধার হত না, একথা ভাবা ধর্মদ্রোহিতা। ঐভাবে মানব-স্বরূপের দিব্যতার কথা ভুলে যাওয়া কি ভয়ানক ব্যাপার!”

“মানব-স্বরূপের গৌরব কখনো বিস্মৃত হয়ো না। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের সর্বোচ্চ ঈশ্বর আমরাই। আমিই সেই অনন্ত সমুদ্র, খ্রীস্ট ও বুদ্ধের দল যার তরঙ্গমাত্র।”

“মার্টিন লুথার ধর্ম থেকে ‘ত্যাগ’ বাদ দিয়ে, তার জায়গায় ‘নীতি’ প্রচার করে, ধর্মের সর্বনাশ করেছেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিবাদী হতে পারে কিন্তু কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মলাভ করতে সমর্থ।”

“দুরাত্মারা মহাত্মাদের পবিত্রতার মূল্য শোধ করে। সেকথা স্মরণ রেখে তাদের ঘৃণা করা থেকে বিরত হও। দরিদ্রের শ্রমের মূল্যে যেমন ধনীর বিলাসিতা, তেমনি ব্যাপার আধ্যাত্মিক জগতেও ঘটে থাকে। বুদ্ধ, মীরাবাঈ ইত্যাদি মহাত্মাদের সৃষ্টির মূল্য দিতে গিয়ে ভারতের জনগণের ভয়ানক পতন ঘটেছে।”

“ধর্ম এবং জীবন যদি কোনো শাস্ত্র বা কোনো মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে, তাহলে চুলোয় যাক সকল ধর্ম ও সকল শাস্ত্র।”

“স্বাধীনতা এবং সর্বোচ্চ প্রেম—একত্র থাকা চাই। তাহলে এদের কোনোটাই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না।”

“এই দেহ যেন অন্ধকার ঘর। তার মধ্যে আমরা যখন প্রবেশ করি তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে।”

“ঈশ্বর যদি কখনো কারো কাছে এসে থাকেন, তাহলে আমার কাছেও আসবেন।...বিশ্বাসকে আমি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারি না—সেটা নাস্তিকতা এবং ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বর যদি দু'হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে থাকেন, তিনি আমার সঙ্গে আজকেও কথা বলতে পারেন। তা না-হলে আমি কি করে জানব যে, তিনি মরে যান নি?”

“বেদান্ত [বিজ্ঞানের চেয়ে] অগ্রসর হয়ে বলে, আমাদের শুধু সমগ্র মানবজাতির অতীত জীবনটা যাপন করলেই চলবে না, মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে। যিনি প্রথমটা করেন তিনি শিক্ষিত মানুষ, আর যিনি দ্বিতীয়টা করেন তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ।”

“সত্যকে সত্যের দ্বারাই যাচাই করতে হবে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। লোকহিত সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্যকে দেখবার জন্য মশালের দরকার হয় না। সত্য যদি সমগ্র জগৎ ধ্বংস করে তবু তা সত্যই।”

॥ ৮ ॥

গোমুখ থেকে নির্গত গঙ্গাধারাকে বহন করে জনসমাজে হাজির করার চিন্তা করেন না সেখানে উপনীত তীর্থযাত্রী। দর্শন ও স্পর্শনের মহাভাগ্য লাভ করে স্তব্ধ বিস্ময়ে নমস্কার করেন তাঁরা। তবু—সেই পুণ্যবারি কিছুটা সংগ্রহ করে

নিয়ে আসেনও তো অনেকে—সমতলের মানুষের জন্য !

মিস ওয়ালডো বলেছেন, "[সহস্র দ্বীপোদ্যানের] এই সব কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। সে-সব শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে গ্রথিত থেকে গেছে। আমাদের মধ্যে কেউই সেই পুণ্য প্রহরগুলিতে যে-তীব্র অধ্যাত্মজীবন লাভ করেছিলাম, তখন আমাদের সত্তার যে-ঊর্ধ্বায়ন ঘটেছিল, তা কদাপি বিস্মৃত হতে পারব না।"

কিন্তু তিনি, মিস ওয়ালডো, ধীর স্থির মননশীল, সেই সঙ্গে দায়িত্বশীল, স্রোতের মধ্যে প্রস্তরখণ্ডের মতো নিত্যকে শক্ত করে ধরে রেখে, তরঙ্গলীলা কিছুটা দেখবার মতো সামর্থ্যযুক্ত মানুষ। তাই দেখা যেত, ছোট একটা নোটবই তাঁর কাছে আছেই। মেরী ফাঙ্ক দ্বীপোদ্যান থেকেই মিস ম্যাকলাউডকে আশ্বাস জানিয়ে পত্রে লিখেছিলেন, "স্বামীজী যা-যা বলছেন আমরা কিন্তু তার নোট নেবার চেষ্টা করছি না—শুনতে-শুনতে একেবারে আত্মহারা হয়ে যাই—নোট নেবার কথা ভুলে যাই। অসামান্য সুন্দর সেই কণ্ঠস্বর—দিব্যসঙ্গীত—আত্মহারা না হয়ে উপায় থাকে না। তবে আমাদের প্রিয় মিস ওয়ালডো তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার বিস্তৃত নোট নিচ্ছেন—সেইভাবেই তা রক্ষিত হবে।"[২৪]

মিস ওয়ালডো 'বিস্তৃত নোট' নিতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। নেওয়া যে সম্ভব ছিল না, তা তো তিনি নিজেই বলেছেন, উপরে দেখেছি। শ্রীমতী বার্ক ঈষৎ ক্ষুণ্নভাবে বলেছেন, স্বামীজীর সান্ধ্য কথাবার্তার কিছু অংশই উনি কেবল লিখে রাখলেন, অন্য সময়ের কথার নোট তো বিশেষ রাখলেন না! সে যাই হোক, নোট নেওয়ার ব্যাপারে মিস ওয়ালডো-র বিশেষ সামর্থ্য ছিল, সে-বিষয়ে স্বীকৃতি সিস্টার ক্রিস্টিনের লেখাতেও আছে। দ্বীপোদ্যানে পৌঁছবার পরে তিনি ডঃ ওয়াইটের মুখে শুনেছিলেন—মিস ওয়ালডো, মিস রুথ এলিস এবং ডঃ ওয়াইট তিরিশ বছর ধরে দর্শন বিষয়ে কোনো বক্তৃতার কথা শুনলেই সেখানে হাজির হয়েছেন, "কিন্তু কদাপি এমন-কিছু শুনতে পান নি যা স্বামীজীর কথার দূর প্রান্তকেও ছুঁতে পারে।" "ওই বহু বৎসরের বক্তৃতা শোনার শক্তিতে [ক্রিস্টিন আরো লিখেছেন] মিস ওয়ালডো কোনো গোটা বক্তৃতার সারকে অল্প কিছু শব্দের মধ্যে ধরে রাখার সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন।"[২৫]

মিস ওয়ালডো-র এই বিশেষ ক্ষমতা স্বয়ং স্বামীজী স্বীকার করেছেন। সেজন্য সংকেতলিপি থেকে উদ্ধার-করা বক্তৃতার টাইপ-কপি স্বামীজী মিস ওয়ালডো-কে দিয়ে বলতেন 'এবার তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো।' নিজের কাজের ফল সম্বন্ধে স্বামীজীর ঔদাসীন্য এমনই ছিল যে, ভাষণের লিখিত রূপকে এক নজরে দেখতেও যেন অনিচ্ছুক ছিলেন। এসব কথার পরে সিস্টার দেবমাতা লিখেছেন :

"হৃদয় ও মস্তিষ্ক-সমন্বিত নিরন্তর বিশ্বস্ত সেবার দ্বারা শিষ্যার মন আচার্যের মনের সঙ্গে এমনই একতারে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল যে, সংকেতলিপি ছাড়াই তিনি স্বামীজীর শিক্ষাকে আশ্চর্যরকম নির্ভুল ও পূর্ণ আকারে লেখায় তুলে আনতে পারতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, স্বামীজীর চিন্তা তাঁর মধ্য

দিয়ে প্রবাহিত হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠাগুলিতে যেন লিখিত হয়ে যেত। একবার যখন তিনি, সহস্র দ্বীপোদ্যানে নবাগত কিছু মানুষের কাছে স্বামীজীর কথা-বার্তার নোট পড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন ঘরে স্বামীজী পায়চারি করছিলেন—আপাতত সেখানে কী ঘটছে সে-বিষয়ে যেন তাঁর খেয়ালই নেই। কিন্তু আগন্তুকরা প্রস্থান করার পরে তিনি ওয়ালডো-র দিকে ফিরে বললেন, 'আমার চিন্তাকে তুমি কী করে এমন নিখুঁতভাবে ধরতে পারলে! শুনে মনে হচ্ছিল, যেন নিজের কথাই নিজে শুনছি'।"[২৬]

দেখা গেল, ১৮৯৫ সালের জুন-অগস্ট মাসের সাত সপ্তাহে স্বামীজীর কথাবার্তার নোট নেওয়া হয়েছিল—তারপরে যদিও স্বামীজীর বক্তৃতা ও নোট থেকে প্রস্তুত করা অন্য অনেক বই বেরিয়ে গেছে—কিন্তু আশ্চর্য, ১২ বছরেরও বেশি সময়ে দ্বীপোদ্যান-নোটগুলির কোনো হদিশ ছিল না। তারা কোথায় কিভাবে আত্মগোপন করেছিল? কী ভাবেই বা ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে 'ইনস্পায়ার্ড টকস্' নামে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হল? সে ইতিহাস চমকপ্রদ। আমরা সেখানে পেয়ে যাই লুপ্ত রত্নোদ্ধারের বিস্ময়কর কাহিনী। এই ইতিহাসের সঙ্গে সিস্টার দেবমাতার বিশেষ সম্পর্ক আছে।

দেবমাতা খুবই অনুভূতিপ্রবণ আধ্যাত্মিক স্বভাবের নারী। তাঁর পূর্বনাম লরা গ্রেন। নিউইয়র্কে তিনি ১৮৯৫ সালেই স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছেন, সেখানকার বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ভারতে এসে তিনি শ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছেও শিক্ষা পেয়েছেন। জীবনের শেষ পর্বে স্বামীজী-শিষ্য স্বামী পরমানন্দের ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত-কেন্দ্রে যুক্ত থাকেন। অনেক-গুলি বই লিখেছেন। রচনা বর্ণময়, চিত্ররসযুক্ত এবং গভীররসাত্মক।

দেবমাতা ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে দ্বীপোদ্যানে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েও গ্রহণ করতে পারেন নি। সে দুঃখ তাঁর ছিল। ১৯০৭ সালের মে মাসে তিনি ক্যাটসকিল পর্বতমালার অন্তর্গত জেওয়েট নামক স্থানে যান (সে কথা আগেই বলেছি)। ভাবমগ্ন মানুষ তিনি, বনে-বনে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, ভগবদ্গীতা কণ্ঠস্থ করবার চেষ্টা করতেন, সঙ্গে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছোট ফটো। একদিন দুপুরে বেড়িয়ে ফেরার পরে দেখেন, কী দুর্ভাগ্য, ছবিটি নেই! তাহলে নিশ্চয় পথে কোথাও পড়ে গেছে! আহার ও বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা না করে তিনি ফিরতি-পথে হাঁটতে শুরু করেন। তাঁর মনে অতি যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা—বুঝি কেউ ছবিটি মাড়িয়ে ফেলল! বুঝি ঘোড়ার লোহার নালের ঘায়ে তা চূর্ণ হয়ে গেল! অনেক খুঁজেও ছবিটি পেলেন না। তখন ভাবতে চাইলেন, তাহলে হয়তো কোনো অকর্ষিত ভূমিতে, এতাবৎ অব্যবহৃত নির্জন পথে, যেসব জায়গা দিয়ে তিনি সবে একাকী হেঁটেছেন—ছবিটি পড়ে আছে। তাঁর মনে কিছুটা শান্তি ফিরে এল।

"সেইদিন থেকে জেওয়েট পর্বত আমার কাছে পবিত্র—তার ঘাসের জঙ্গলে

কোনো এক স্থানে ঢাকা আছে একটি পবিত্র মুখচ্ছবি।"

এর পরেই দেবমাতা যে-বাক্য লিখেছেন তার মধ্যে কিছু রহস্যময় তাৎপর্য আছে :

"যেন সেই পবিত্র মুখটির প্রতিধ্বনি শোনা যাবে আর একটি কণ্ঠস্বরে—যা ১২ বছর আগে বাঙ্ময় ছিল, কিন্তু এখন নীরব।"

বলাবাহুল্য প্রতিধ্বনি-ধরা কণ্ঠস্বরটি স্বামী বিবেকানন্দের।

দেবমাতা কেন ঐ নিগূঢ় বাক্যটি লিখলেন, কেন লিখেছেন যে, দ্বীপোদ্যানে যাবার ভাগ্য না হলেও সেখানে প্রদত্ত স্বামীজীর বাণী ও উপদেশকে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করার দায়িত্ব তাঁর উপরেই পড়েছিল ? সে কাহিনী দেবমাতার মুখ থেকে সরাসরি শোনাই ভালো :

"জেওয়েট থেকে চলে আসার চারদিন আগে মিস ওয়ালডো [যিনি দেবমাতার আবাসের আধমাইল দূরে এক খামারবাড়িতে গ্রীষ্ম কাটাচ্ছিলেন, সেখানে দেবমাতা তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে যেতেন] বললেন, 'আমার কাছে একটি অসমাপ্ত বস্তু আছে। যে-কটা দিন তুমি এখানে থাকবে আমি তোমাকে সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর কথার যেসব নোট নিয়েছিলাম সেগুলি পড়ে শোনাব।' এই নোটগুলির কথা তিনি আগে আমাকে কখনো বলেন নি। আমি তখনি বললাম, 'কালকেই শুরু হোক।' পরদিন বিকালে খামারবাড়ির সৌষ্ঠবহীন বারান্দায় বসে সেই শোনার কাজ শুরু হয়ে গেল। আমি বসলাম পাহাড়ের দিকে মুখ করে—যার বুকে ধরা আছে আমার হারানো শ্রীরামকৃষ্ণ-চিত্র। শুনতে-শুনতে আমার দৃষ্টি সঞ্চারিত হতে লাগল নির্মেঘ ঘননীল আকাশপটে স্থাপিত শৃঙ্গ-গুলির তরঙ্গায়িত প্রান্তরেখায়।

"ক্রমান্বয়ে তিনদিন বিকালে মিস ওয়ালডো পড়ে গেলেন আর আমি শুনে গেলাম। শেষ শব্দটি উচ্চারিত হবার পরে তাঁর কণ্ঠ যখন নীরব হয়ে গেল—আমি মিস ওয়ালডো-কে বললাম, 'আপনি ঘোর অপরাধী—এই নোটগুলিকে নিজের কাছে আটকে রেখেছেন! এ যে বিশ্বজগতের সম্পদ!' মিস ওয়ালডো উত্তরে বললেন, 'নোটগুলি প্রকাশের পক্ষে খুবই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ। সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজী ৬ সপ্তাহ ধরে যে-অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে এরা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করবে।' তিনি একমুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে পড়ে, আমার দিকে নোটগুলিসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বললেন—'যদি এগুলিকে সাজিয়ে তুমি প্রকাশ করতে চাও, আমি সানন্দে তোমাকে দিয়ে দেব। কিন্তু আমি যদি এদের সম্বন্ধে কিছু করতে চাই, সারাক্ষণই মনে হবে—তাঁর শিক্ষার এ কী ভাঙাচোরা চেহারা!

"পরদিন সকাল ৬টায় আমি নিউইয়র্কের ট্রেন ধরেছি, সেখানে গিয়ে আমার টাইপরাইটার বেঁধে নিয়ে, টাইপের কাগজসহ জেওয়েট-এ ফিরেছি। আমি অনুভব করেছিলাম, যে-কাজ করতে যাচ্ছি তার জন্য চাই নির্জনতা ও

নীরবতা। তাই গ্রামপ্রান্তে বিচ্ছিন্ন একটি বাড়ি ভাড়া করলাম। তাতে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা একলা বাস করতেন। তিনি দুই মেথডিস্ট পাদরীর বিধবা-পত্নী। [বলাবাহুল্য, বৃদ্ধার দুই বিবাহ এবং দুই স্বামীই গত] বৃদ্ধার দুই পুত্র। আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ওই চার জনের মানুষ-মাপের স্থূল ছবি—আমার দিকে তাকিয়ে থাকত যেন। মহিলাকে আমি কদাচিৎ দেখতাম। তিনি আমাকে নিজের মতো করে থাকার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিজেই রাঁধতাম, ঘর পরিষ্কার করতাম এবং নিজের ভাবে চলতাম। প্রতিদিন বিকালে ভগবদ্গীতা, মিস ওয়ালডো-র নোট, এবং কাগজ-পেনসিল নিয়ে পাহাড়ের নির্জনতায় চলে যেতাম। সেখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে নোটগুলির সম্পাদনার কাজ করতাম, কোনো বাধা-বিঘ্ন ছিল না, কেবল হয়তো পাখির ডাক কিংবা পাতা পড়ার শব্দ। মনে হতো যেন স্বামীজী আমাদের সঙ্গে কাজে বসে গেছেন—যেখানে আমি অর্ধসমাপ্ত বাক্যগুলিকে সমাপ্ত করছি কিংবা ভাঙা প্যারাগুলিকে জুড়ে পুরো মাপের করে দিচ্ছি।

"প্রতিদিন সকালে পূর্বদিনে তৈরি-করা নোটগুলি নিয়ে চলে যেতাম মিস ওয়ালডো-র বারান্দায়—সেখানে বসে টাইপ করতাম। মেসিন থেকে বেরিয়ে এলে পৃষ্ঠাগুলি উনি পড়তেন, তাঁর আনন্দ ক্রমেই বাড়ত—আরো আরো—তাহলে শেষ পর্যন্ত ওসব প্রকাশিত হতে পারবে !! নোটগুলির সঙ্গে পুনঃ সম্পর্কের কারণে তাঁর স্মৃতি উদ্দীপিত হতে লাগল। স্বামীজী অন্য যেসব কথা বলেছিলেন, বা আরো যেসব কাজ করেছিলেন, সে-সব তাঁর মনে পড়তে লাগল। ঘটনার পর ঘটনা তিনি বলে যেতে লাগলেন।

"জেওয়েট-এ এইভাবে ৬ সপ্তাহ থাকার পরে আবার আমি নিউইয়র্কের ট্রেন ধরেছি। আমার সঙ্গে চলেছে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। মিস ওয়ালডো নামকরণ করে দিয়েছিলেন—'ইনস্‌পায়ার্ড টকস্‌'। প্রকাশের ব্যাপারে তার বেশি কোনো অংশ নিতে তিনি রাজি হননি। এক্ষেত্রেও আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।"

কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং গ্রন্থাকারে তার প্রকাশের মধ্যে কালপর্ব কিসে পূর্ণ ছিল, তার কাহিনীও ভাবাত্মক ভাষায় দেবমাতা লিখেছেন :

"ছাপতে দেবার আগে আমি ভারতযাত্রা করলাম। ফলে পাণ্ডুলিপি আমার সঙ্গেই চলল, কারণ অন্য কাউকে এ-বস্তু ছাপতে দিতে মিস ওয়ালডো একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

"সেণ্ট লরেন্স নদীর ধারে সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ যেসব জ্যোতিদীপ্ত বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, যার সংকলিত রূপ ব্রুকলিনে এতদিন অজ্ঞাতবাস করছিল, যে-কোনো রেল স্টেশন থেকে ৯ মাইল দূরে ক্যাটসকিল পর্বতের অভ্যন্তরে একটি স্থানে যার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা

হয়েছিল—তা সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে, সাহারার মরু অঞ্চলের বালুকাস্তূপের পাশ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশ পেরিয়ে, মাদ্রাজের জ্বলন্ত আকাশের নীচে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থরূপ ধারণ করল! জেওয়েট-এর পার্বত্য অঞ্চল পবিত্র হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের হারানো ছবিকে বুকে নিয়ে—সেখানে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। আর মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ-মঠ পবিত্র হয়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পবিত্র উপস্থিতিতে—সেখান থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন কিনা জানি না। তিনি পড়ুয়া মানুষ ছিলেন না। তাঁর ভিতরে সদা-উজ্জ্বল আলো, তাকে পুনর্জ্বলিত করার জন্য কোনো পুস্তকের প্রয়োজন ছিল না। তিনি পড়ুন বা না-পড়ুন, বইটিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বিশেষ তাগিদেই আমি বইটির ভূমিকা লিখি। তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ করতে আমার দ্বিধা ছিল। মিস ওয়ালডো নোটগুলি দেবার সময়ে শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর নাম যেন এ-ব্যাপারে কোথাও উল্লিখিত না হয়। যদি তাঁর নাম ব্যবহৃত না হয় তাহলে আমার নাম তো হতেই পারে না, যেহেতু আমি স্বামীজীর ঐসকল বাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে গৌণ ভূমিকায় ছিলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তবু জোর করায় ভূমিকাটি লিখিত হয় এবং আমার স্বাক্ষরও থাকে। আমার আনুগত্যের জন্য, সেইসঙ্গে সম্ভবত ভূমিকাটি তাঁর মনঃপূত হয়েছিল বলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে আশীর্বাদী সুগন্ধি উপহার দেন। তার সুবাস বহুদিন আমাকে ভরিয়ে রাখে। বইয়ের আকার, টাইপ, বাঁধাই ইত্যাদি সম্পর্কে শেষ কথা তাঁরই!

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উৎসাহের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়েছেন। তিনি অনেকগুলি পাদটীকা যোগ করেছেন।...বইটি অবশেষে ছাপাখানা থেকে যখন বেরিয়ে এল—সাফল্য ঘটল অবিলম্বে। অনেকেই অনুভব করলেন, এখানে তাঁরা যে-পরিমাণে স্বামীজীর সাক্ষাৎ কণ্ঠস্বর পেয়েছেন, তাঁর অন্যত্র-প্রকাশিত রচনায় তা পান নি। কোনই সন্দেহ নেই, জেওয়েট-এর বারান্দায় বসে যে-নোটগুলি শুনেছিলাম সেগুলি সারা বিশ্বেরই সম্পদ।"[২৭]

॥ ৯ ॥

"'দেববাণী' গ্রন্থে 'প্রারম্ভিক বিবরণ' হিসাবে গৃহীত মিস ওয়ালডো-র রচনাটি অনবদ্য। এর মধ্যে কিন্তু কোথাও লেখা নেই, 'দেববাণী' সংকলন মিস ওয়ালডো-ই করেছেন। প্রারম্ভিক রচনাটি ১৯০৮ সালের। এর পরে ওয়ালডো যদিও আরো ১৮ বছর বেঁচেছিলেন—তিনি যেন হারিয়ে যান বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের দৃষ্টিপথ থেকে। (একমাত্র ১৯১২ সালে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর একটি চিঠির কথা আমরা জেনেছি।)

'দেববাণী'র ভূমিকায় মিস ওয়ালডো-লিখিত স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য জীবন-কথা বাদ দিলে উনি স্বামীজী সম্পর্কে আরো দুবার লিখেছেন দেখতে পাই। স্বামীজীর দেহান্তের অব্যবহিত পরে আমেরিকার অ্যানুবিস পত্রিকায় স্বামীজী

বিষয়ে যা লেখেন তা মাদ্রাজের 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ফেব্রুআরি ১৯০৩ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। উল্লেখযোগ্য এই লেখাটি, কেননা এতে স্বামীজীর সামগ্রিক জীবন ও কর্মের একটা সুলিখিত বিবরণ মেলে। স্বামীজীর কৈশোর জীবন, গভীর জীবনপ্রশ্ন, সংঘাত, শেষে গুরুলাভ, তারপরে সন্ন্যাসের কথা তিনি বলেছেন। কয়েকটি রেখায় সেই সন্ন্যাস-ভূমিকার গৌরব :

"এই ব্যস্ত পৃথিবীতে তাঁর পূর্বের নিজ ভূমি হারিয়ে গেল, স্খলিত হয়ে গেল পূর্ব-নাম, হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী, পবিত্রাত্মা পুরুষ, যাঁর কাছে পার্থিব প্রলোভনের ঠাঁই নেই। তাঁর জন্য গৃহসংসার, স্ত্রী-পুত্র নয়, খ্যাতি, ধনসম্পদ এবং ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। সে সকলই মূল্যহীন বলে সরিয়ে রাখা হলো—তার স্থানে সেই কিশোর বেছে নিলেন হিন্দু সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র, দণ্ড-কমণ্ডলু এবং ভিক্ষাপাত্র। তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি, তাঁর জীবনে নাম যশ কখনো আসবে—সাধারণ জীবন যাপন করলে যেখানে উপনীত হতেন তার থেকে বহু-গুণে বৃহত্তর হবে তাঁর জীবন।"

স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবন, এবং তাঁর আমেরিকায় প্রাথমিক দুর্গতির কথা বলার পরে, মিস ওয়ালডো স্বামীজীর দুটি বিশেষ শক্তির কথা বলেছেন, তার একটি ঐহিক, ইংরেজী ভাষায় পাকা দখল, অন্যটি আধ্যাত্মিক, একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরতা, যার ফলে যথাকালে সাহায্য ও আশ্রয় মিলেছে।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় সাফল্যের পরে বক্তৃতা-ব্যুরোয় যোগদান ও বিতৃষ্ণ হয়ে সম্পর্কচ্ছেদের প্রসঙ্গ-শেষে মিস ওয়ালডো বলেছেন,

"অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারে তিনি অতঃপর নিজেকে উৎসর্গ করলেন, উদাসীন থাকলেন শ্রোতাদের ধন্যধ্বনি সম্বন্ধে। বৃহৎ সভার শ্রোতারা এই মানুষটির প্রতিভাকেই কেবল সংবর্ধিত করছিল, কিন্তু তিনি যে-সত্য প্রচারের জন্য ব্যাকুল, সেই সত্য সন্ধানে তাদের আগ্রহ ছিল না।"

সেইজন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস শুরু, অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে দিনযাপন :

"সর্বোপরি শিষ্যরা তাঁর প্রতিদিনের জীবনে অংশ নেবার অপরিমেয় সুযোগ পেয়ে দেখল—তাঁর চরিত্রের সে কী অপরূপ সৌন্দর্য ও সরলতা।"

এই জনচক্ষুর অন্তরালবর্তী স্বামীজীর নিকট-মূর্তির কথা বলার পরে বহির্জগতে প্রকাশিত তাঁর মহিমান্বিত রূপের কথাও ওয়ালডো বলেছেন :

"তিনি এমন একজন মানুষ যিনি উপস্থিতির মহিমা, চমকপ্রদ সংলাপ, বৈদ্যুতিক বাগ্মিতা, সর্বোপরি অপার্থিব সরলতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য যে-কোনো পরিস্থিতিতে জাজ্বল্যমান থাকতেন।"

স্বামীজী সম্পর্কে মিস ওয়ালডো-র দ্বিতীয় রচনা পাই প্রবুদ্ধ ভারতের জানুআরি ১৯০৬ সংখ্যায় ('রেমিনিসেনসেস্' গ্রন্থে পরে সংকলিত)—যার বেশ কিছু অংশ এই রচনায় আগেই উপস্থিত করেছি।

তৃতীয় রচনা 'দেববাণী'র উল্লিখিত 'প্রারম্ভিক বিবরণ'।

শেষোক্ত রচনাকালে বলাবাহুল্য সহস্র দ্বীপোদ্যানে অবস্থিত বিবেকানন্দের ছবির পর ছবি মিস ওয়ালডো-র চোখের সামনে দিয়ে একে-একে সঞ্চরণ করেছিল

আনন্দের ঢেউ তুলে। অবিরত ভেবেছেন—কোন্ ভাগ্যে আমরা এই পরমাশ্চর্যের সাক্ষী হতে পেরেছিলাম! মনে পড়েছিল একটি রাত্রির কথা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও তাঁরা সান্ধ্য ভোজনের পরে উপরের বারান্দায় স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করেছেন। ঘরের দরজা খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে স্বামীজী নিজের আসনে বসেছেন। অন্যদিন তিনি দু'ঘণ্টা কি কিছু-বেশি সময় বাক্যালাপ করতেন। কিন্তু এইদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি, গভীর রাত্রি, কখন কেটে গিয়েছিল কেউ জানে না। বারান্দায় স্বামীজীর কণ্ঠে আলোর প্রবাহ, আর বাইরে পূর্ণিমা-পূর্ব চাঁদের আলোর হাসি। আরো একদিন। মধ্যাহ্নভোজনের পরে অধিবেশন। স্বামীজী বৈরাগ্যে জ্বলন্ত সন্ন্যাসীদের কথা বলতে-বলতে উঠে গেলেন নিজের ঘরে। দু'ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এলেন—হাতে ধরা একটি কাগজ, তাতে লেখা কবিতা—'সন্ন্যাসীর গীতি'। কী কবিতা! মুক্তিসন্ধানের উন্মত্ততা শব্দে শব্দে আলোড়িত, ব্যাকুল মানবাত্মার পাখার ঝাপটে ঝড় উঠেছে—ভাঙো-ভাঙো, শৃঙ্খল ভাঙো!

উচ্চভূমি থেকে বিবেকানন্দের স্বচ্ছন্দ অবতরণও মিস ওয়ালডো দেখেছেন। তিনি মজার গল্প বলছেন, হাসিতে ফেটে পড়ছেন, রান্না করছেন, আর রাশিকৃত লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে রান্না-করা সেই তরকারি শিষ্যদের খেতে দিয়ে কাণ্ডটা দেখছেন। অথচ এই সময়েও তিনি দিব্যতা হারাচ্ছেন না—দিব্যশিশু ছাড়া তিনি কিছু নন। গোটা অভিজ্ঞতাটিকে মিস ওয়ালডো দুই বাক্যে ধরে দিয়েছেন :

> "স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সঙ্গে বাস করা মানে অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই ভাবে—একই ঘনীভূত ধর্মভাবের রাজ্যে বাস করতাম।"

মিস ওয়ালডো আঘাতও পেয়েছেন। কিন্তু কে জানতো—'আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।'—

"একদিন সকালে স্বামীজী দেখলেন, মিস ওয়ালডো কাঁদছেন। কী ব্যাপার, এলেন? কিছু ঘটেছে নাকি?—স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোলেন। 'আমি আপনাকে কিছুতে সন্তুষ্ট করতে পারছি না,' মিস ওয়ালডো বললেন, 'অন্যরা আপনাকে বিরক্ত করলে আপনি বকেন আমাকেই।' স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আরে, ও-লোকগুলোকে আমি কি যথেষ্ট চিনি যে ওদের বকব? ওদের বকতে পারি না বলেই তো তোমাকে বকি। যদি নিজের লোকদের বকতে না পারি তাহলে কাকে বকব বলো?' মিস ওয়ালডো তখনি চোখের জল মুছে ফেললেন। তারপর থেকে তিনি বকুনি চাইতেন, কেননা তিনি যে আপনজন, ও তারই স্বীকৃতি।"[২৮]

স্বামীজীকে এত দেখেছেন তবু মিস ওয়ালডো একটা অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তা মন থেকে দূর করতে পারেন নি—না না না, মানুষ ত্রুটিহীন হতে পারে না, বিবেকানন্দও ত্রুটিহীন নন—আমি তা আবিষ্কার করবই। শিক্ষক ও বক্তাদের

সম্বন্ধে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। আগে কত শিক্ষকের পদতলে বসেছেন, এবং অবিলম্বে বা বিলম্বে তাঁদের কোনো না কোনো অসম্পূর্ণতা চোখে পড়েছে, সেক্ষেত্রে এই লোকটি পার পেয়ে যাবে ? তা হয় না, ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, ভালো করে নজর রাখলেই চোখে পড়বে।

মিস ওয়ালডো তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন, এবং একদিন যুগপৎ উল্লাসে ও বিষাদে দেখলেন—বিবেকানন্দ ধরা পড়েছেন।

> "তিনি ও স্বামীজী বসে আছেন নিউইয়র্কের এক ড্রইংরুমে।… ড্রইংরুমটি বাড়ির দোতলায়, অপ্রশস্ত কিন্তু দীর্ঘ। তার এক প্রান্তে উঁচু ভাঁজ-করা দরজা, অন্য প্রান্তে দুই বৃহৎ জানালা, মধ্যবর্তী স্থানে সিলিং পর্যন্ত উঁচু এক বিশাল আয়না। আয়নাটি যেন স্বামীজীকে একেবারে মোহিত করে ফেলেছে! তিনি তার সামনে বার বার গিয়ে দাঁড়ালেন, অতি নিবিষ্ট চোখে নিজেকে দেখতে লাগলেন, আর তারই ফাঁকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন—একেবারে চিন্তামগ্ন। মিস ওয়ালডো-র ক্ষুণ্ণ উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করে চলল—'হায়, তাহলে এবার বুদ্বুদটা সত্যই ফাটল! উনি ব্যক্তিগত অহংয়ে এত ভরপুর !!' হঠাৎ এরই মধ্যে স্বামীজী তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'এলেন, আমার কি হয়েছে বল তো ? কি অদ্ভুত কাণ্ড, আমি কিছুতে মনে করতে পারছি না—আমাকে দেখতে কেমন ? আয়নায় নিজেকে কতবার দেখছি, কিন্তু যেই পিছন ফিরছি অমনি নিজের চেহারা একদম ভুলে যাচ্ছি'।"[২৯]

পরাজয়ের গভীর আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলেন সারা এলেন ওয়ালডো।

মিস ওয়ালডো আকুল হয়ে কাঁদছিলেন। মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে তিনি স্বামীজীর চিঠি বদলাবদলি করে পড়তেন। তেমনি এক সুযোগে স্বামীজীর চিঠি পড়েছেন। তারপর মিস ম্যাকলাউডকে ৮ এপ্রিল ১৯১২ তারিখে লিখলেন :

> "আহা, পরম প্রিয় পত্রগুলি! উপরতলায় নিয়ে গিয়ে সেগুলি বারবার পড়লুম। ধন্য—পুণ্য—গুরু আমার! কী ভাগ্য, তাঁকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলুম! তাঁকে শুধু জানি নি, তাঁকে ভালবেসেছি, তাঁর কাছে শিষ্যার স্বীকৃতি পেয়েছি। ধন্য সেই দিন যেদিন আমার জীবনে তিনি পদক্ষেপ করেছিলেন।"

এলেন ওয়ালডোর জীবনের শেষ কথা পত্রশেষে আছে :

> "আমি যেন তাঁর প্রতি—তাঁর শিক্ষার প্রতি—চিরবিশ্বস্ত থাকি।"

আকর নির্দেশ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, 'ইনস্পায়ার্ড টক্স্'-এর সিস্টার দেবমাতা-লিখিত প্রস্তাবনা।
২। 'রেমিনিসেনসেস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে মিস ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা।
৩। সিস্টার দেবমাতা, 'মেমারিজ অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানস' (ধারাবাহিক রচনা), 'প্রবুদ্ধ-ভারত', মে ১৯৩২।
৪। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জানুআরি ১৯০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত মিস ওয়ালডো-র 'বিবেকানন্দ স্মৃতি'; 'রেমিনিসেনসেস্' গ্রন্থে সংকলিত এবং সেখান থেকে অনূদিত।
৫। প্রবুদ্ধ ভারত, মে ১৯৩২।
৬। তদেব।
৭। তদেব।
৮। লুইস বার্ক, 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি ওয়েস্ট', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২, ৭৫, ৮৩-৮৪; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭-২১, ৩২১, ৩৩১-৩৭।
৯। তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২, ৭৫, ৮৩-৮৪, ৩৪০, ৩৪২; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭-২১, ৩২১, ৩৩১-৩৩, ৩৩৬-৩৭।
১০। 'ব্রহ্মবাদিন', ১৩ মার্চ, ১৮৯৭ ('বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস্' গ্রন্থে, পৃ. ৫০৫, সংকলিত)।
১১। 'প্রবুদ্ধ ভারত', জানুআরি ১৯০৬। 'রেমিনিসেনসেস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে সংকলিত।
১২। বার্ক, 'স্বামী বিবেকানন্দ : হিজ সেকেণ্ড ভিজিট টু দি ওয়েস্ট', পৃ. ৬১২-১৩।
১৩। বার্ক, 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি ওয়েস্ট', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১।
১৪। তদেব, পৃ. ১০২।
১৫। বার্ক 'সেকেণ্ড ভিজিট', পৃ. ৬১২-১৩।
১৬। মিস ওয়ালডো, 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৯০৬), বিবেকানন্দ স্মৃতি, 'রেমিনিসেনসেস্' গ্রন্থে সংকলিত।
১৭। 'অ্যানুবিস' পত্রিকার রচনাটি 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ফেব্রুআরি ১৯০৩ সংখ্যায় সংকলিত হয়।
১৮। 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অব স্বামী বিবেকানন্দ', ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫০৭।
১৯। তদেব, পৃ. ৫২৭-২৮।
২০। বার্ক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২।
২১। তদেব, পৃ. ৪৬৩।

সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর 'রেমিনিসেনসেস্'-এ বলেছেন : "দেববাণী' মিস ওয়ালডো-র কল্যাণেই আমরা পেয়েছি। ...পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র উপর স্বামীজীর টীকা-ভাষ্যের শ্রুতিলিখন ইনিই করেন। স্বামীজীর 'কর্মযোগ', 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থগুলির প্রস্তুতি ও প্রকাশে ইনি সহায়তা করেছিলেন। এঁর যুক্তিসিদ্ধ অনুশীলিত মন এবং পূর্ণ আনুগত্য এঁকে আদর্শ সহকারিণী করেছিল।"

২২। 'দেববাণী' গ্রন্থের ভূমিকায় সংযোজিত মিস ওয়ালডো-র রচনা।
২৩। তদেব।
২৪। মেরী সি ফান্কি, 'রেমিনিসেনসেস্', পৃ. ২৬২।
২৫। সিস্টার ক্রিস্টিন, 'রেমিনিসেনসেস্', পৃ. ২৬১।
২৬। দেবমাতা, দেববাণীর ভূমিকা।
২৭। প্রবুদ্ধ ভারত, জুন ১৯৩২।
২৮। তদেব, মে ১৯৩২।
২৯। তদেব।

স্বরপক্ষিণী এমা কালভে

সুরের অপ্সরা কলকাতায়…

শুরু করা যাক কলকাতা থেকেই।

১৯১০ সালের শেষভাগ। তখনো কলকাতা ভারতের রাজধানী। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলকাতা—নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঘোড়-দৌড়ে, বল-নাচের ঘূর্ণিপাকে, শ্যাম্পেন-শেরীর পানোৎসবে মাতোয়ারা। অনেক দূরে ফেলে-আসা স্বদেশের স্ফূর্তির স্বপ্ন চোখে মাখিয়ে উদ্দাম উল্লাসে দেহ-মনের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে ব্যস্ত সাহেবগণ। তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠান, রঙ্গরস, বিলাস-ব্যসনের সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয় নীলরক্ত ইংরাজদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যানে'।

ইংলিশম্যান ২৩ নভেম্বর, ১৯১০, নিম্নের শিরোনামা নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল :

কলকাতায় মাদাম কালভে
সঙ্গীত-রাজ্ঞী ভারতে এসেছেন কেন
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সাক্ষাৎকার

প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল :

"কলকাতার নীরস ক্লান্তিকর জীবনের ঘূরপাকের মধ্যে, যেখানে কেবল শীত-ঋতুর আমোদ-প্রমোদে কিছু একঘেয়েমি কাটে, সেখানে সঙ্গীত-কুল-রাণীর আগমন সাধারণ ঘটনা নয়। স্বয়ং মাদাম কালভে কলকাতায় দেখা দিচ্ছেন—এই সংবাদ তীব্র প্রত্যাশায় উন্মুখ করেছে সকলকে। কলকাতায় তিনি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আছেন। গতকাল অপরাহ্নে ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি গায়িকা-প্রধানার মুখোমুখি হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।"

সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পৃথিবীর সর্বোত্তমা গায়িকার ব্যবহারের সৌন্দর্যে ও সরলতায় মোহিত। তিনি জেনেছিলেন, মাদাম পুরো গানের প্রোগ্রাম নিয়ে কলকাতা বা ভারতে আসেন নি, এসেছেন বিশ্রাম করতে আর ভারতকে জানতে, তার ধর্ম ও রীতি-নীতিকে। কলকাতায় আসার আগে তিনি মাদুরার মন্দির দেখে এসেছেন। সেই মন্দিরদর্শনের আনন্দ মাদাম এমন উজ্জ্বল উষ্ণ ও সঙ্গীতময় ফরাসিতে ব্যক্ত করলেন যে, শুনে সাংবাদিক বুঝতে পারলেন, ওঁর সঙ্গীত কোন্ আগুন জ্বালিয়ে তোলে। মাদাম এইসঙ্গে কিছু ভারতীয় সঙ্গীতের সুরও তুলে নিয়ে যেতে চান, যা তিনি আগামী মরশুমে লণ্ডনে গাইবেন। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই তিনি বুঝেছেন, ভারতীয় জনগণের আছে প্রকৃষ্ট সঙ্গীতচেতনা, এবং এখানকার গীতি-পদ্ধতি অনুশীলনের যোগ্য। বরোদার মহারাজা ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। ইউরোপীয় নোটেশনে ভারতীয় সঙ্গীতকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে—বরোদার মহারাজার কাছে এই কথা শুনে মাদাম তা পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহী।

সাংবাদিককে মাদাম কালভে তাঁর পৃথিবী-ভ্রমণের বিচিত্র কিছু অভিজ্ঞতার

কথা বলেন। কলকাতা তাঁর কাছে আকর্ষক ঠেকেছে : "সুন্দর শহর। অত্যন্ত সজীব। হাওড়া ব্রিজ থেকে সবচেয়ে চমকপ্রদ দেখায় তার প্রাসাদতুল্য ভবনগুলি, তার বর্ণময়তা, তার প্রাণ—।"

ইতালির সেরা এক টেনর* সিনর গালেও গাস্‌পারি এবং ফ্রান্সের উচ্চশ্রেণীর পিয়ানোবাদক মঁসিয়ে জাক্‌, মাদাম কালভের দলে আছেন। বৃহস্পতিবার এঁরা সকলে গীত-বাদ্যের আসরে অংশ নেবেন। ইংলিশম্যানের লেখকের মতে, ঐ দিনটি হবে কলকাতার ইতিহাসে এক মহাদিন :

"*We are justified, under the circumstances, in calling Thursday, the 24th instant, a red-letter day in the history of Calcutta.*"

২৪ তারিখের সেই 'মহাদিনে' কলকাতার 'থিয়েটার রয়ালে' হাজির হলেন অন্য কেউ নন—স্বয়ং ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ—লেডী হার্ডিঞ্জকে সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন পার্শ্বচরগণসহ গোয়ালিয়র ও বিকানীরের মহারাজারা। সেকালের ভাইসরয়—তাঁর গান-শোনা—সে তো মহারাজকীয়, মহাভারতীয় কাণ্ড! আর ভাইসরয় সদ্য এসেছেন কলকাতায়—কার্যত ধুলো-পায়ে গেছেন কনসার্টের আসরে। সে আসরে কিন্তু কলকাতা ভেঙে পড়ে নি, তার কারণ—ঐকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ। রাজনীতি তখন ঘূরপাক খাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে। স্বদেশী আন্দোলনের তোড়ে বঙ্গবিভাগ রদ করতে হবে, সেই ব্যবস্থা করতে লর্ড মিণ্টোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ; রাজধানীও স্থানান্তরিত হবে দিল্লীতে; সেখানে দরবারে উপস্থিত থাকবেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ; মাত্র এক সপ্তাহ আগে তা ঘোষিত হয়েছে; সুতরাং পরিস্থিতি সঙ্গীতের আসরের অনুকূল নয়। তাহলেও কালভের গানের আসরে শ্রোতারা পাগল হয়ে ছুটে আসে নি বলে ইংলিশম্যানের লেখকের মর্মপীড়ার অবধি ছিল না। সবিশেষ সঙ্গীতরসিক ইনি, কালভের গানের কিছু রসায়িত বর্ণনার দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন :

"মাদাম কালভের গানের বিষয়ে এমন কী বলা সম্ভব যা পুনঃ পুনঃ বলা হয় নি ইতিমধ্যে?…একালের কনসার্টের আসরে তাঁর সমতুল গায়িকা অল্পই আছেন।…তাঁর শিল্পপ্রতিভার অনায়ত্ত নয় কোনো অভিব্যক্তিই।… কালভের মতো গায়িকা শ্রোতাকে প্রতিদিনের জীবন থেকে সজোরে টেনে এনে একেবারে আত্মহারা করে দিতে পারেন—মঞ্চের সাদামাঠা আসবাবগুলিও যেন বদলে গিয়ে সুর-জগতের উপাদান হয়ে ওঠে, সৃষ্ট হয় রোমান্সের পরিবেশ—যা কখনো গাঢ় ট্রাজেডির, কখনো রাখালিয়া সরলতার।…ডেভিডের 'পার্ল অব ব্রেজিল' থেকে মিসোল্লি-সঙ্গীতগুলি গেয়েছিলেন আশ্চর্যজনক সহজতা ও মাধুর্যের সঙ্গে—সে সঙ্গীত দেখিয়ে দিল তাঁর স্বরের রেশমী মসৃণতা।… তারপরে গুনো-র সাফো-র বিদায়সঙ্গীত যখন গাইলেন তখন আবির্ভূত

* পুরুষ গায়ক, চড়া সুরে গান করেন। সাধারণত অপেরার প্রধান পুরুষ গায়ক।

হলো সেই অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর, যা ক্লাসিক ট্রাজেডির উচ্চশিখর ও নিম্ন গহনকে ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করতে সমর্থ।"

পরাধীন ভারতের মুখ্য রাজপ্রতিনিধি, কালভেকে সম্মান জানাতে তাঁর সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সম্মান কালভের জীবনে অভাবিত কিছু নয়, কারণ স্বয়ং সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ছিলেন কালভের গুণমুগ্ধ, উইণ্ডসর-প্রাসাদে ছিল কালভের প্রভূত সমাদর। কালভে কিন্তু কলকাতায় বিশেষভাবে চেয়েছিলেন একটি পরম প্রণামে নত হতে, তাঁর সমস্ত সঙ্গীতপ্রতিভা দিয়ে একটি প্রার্থনা-গীতিকে সত্য করে তুলতে : 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।'

কালভে গিয়েছিলেন গঙ্গার অপর পারে মৃদু দীপালোকিত একটি সমাধি-মন্দিরের সন্ধানে—এক সন্ন্যাসীর শেষ শয়নস্থলে। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দণ্ডের ছায়া একদিন পড়েছিল দুই গোলার্ধে, তাঁর কমণ্ডলুর বারিবিন্দু ঝরেছিল অনেক তৃষিত ওষ্ঠে। সে অমৃতবিন্দুতে কালভেও প্রাণ পেয়েছেন।

কিন্তু সে-কথা এখন নয়।

নানা আকাশের তারা…

হুররে হুররে হুররে। খট্-খটা-খট্ খট্-খটা-খট্। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়ার দল ছুটেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—ঘোড়ার পিঠে টেক্সাসের কাউ-বয় ছোকরারা —বাঁ হাতে টুপি তুলে ধরেছে, ডান হাতে সাঁই-সাঁই চাবুক কষাচ্ছে, মাঝে-মাঝে রেকাবে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠছে—মুখে দীর্ঘ কু-উ-উ—আর, হুররে কালভে! হুররে হুররে!

নিউইউয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরা-দল আমেরিকা সফর করছে। টেক্সাসের একটি ছোট স্টেশনে যখন ট্রেন এসে পেঁছিল তাঁদের নিয়ে, তখন কয়েক শো কাউ-বয় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ট্রেন ঘিরে ধরল—তারা গান শুনবে। টগবগে জ্যান্ত ছেলেগুলি। ম্যানেজার মঁসিয়ে গারু গায়িকাদের বললেন, "এদের অনেকেই ইংলণ্ডের বড় ঘরের ছেলে, অনেকদিন দেশছাড়া, এদের একটু আনন্দ দাও।" তখন 'সুর'-সুন্দরী মেল্‌বা কামরার পিছনের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে গান ধরলেন তাঁর নাইটিংগেল গলায়। পরিচ্ছন্ন স্থির বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল অপরূপ কণ্ঠস্বর—তিনি গাইছিলেন—'হোম, সুইট হোম্।' ঘরছাড়া ছেলেগুলির বুক কেমন করে উঠল, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপল, তারা পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদল।

মেল্‌বা'র গান শেষ হলে মঁসিয়ে গারু বললেন, "কালভে, এবার তোমার পালা। ওরা কেঁদেছে—ওদের হাসাও।" কালভে তখন লক্‌লকিয়ে উঠলেন—পাগল-করা, মাতাল-করা স্প্যানিশ সুর ধরলেন দ্রুত লয়ে—সেইসঙ্গে নৃত্যরঙ্গে

দুলতে লাগল শরীর। তার প্রতিক্রিয়া হল বটে—"মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।" তারপর গানশেষে উচ্চ হর্ষধ্বনি আর জয়ধ্বনির মধ্যে যখন ট্রেন চলতে লাগল তখন টুপি নড়ছে, রুমাল উড়ছে, আর চীৎকার চীৎকার। ট্রেনের সঙ্গে ছুটল ঘোড়সওয়ারেরা গতি ও শব্দের ঘূর্ণিঝড় তুলে। ঘোড়সওয়ারদের হারিয়ে দিয়ে শেষে ট্রেন যখন ছুটে বেরিয়ে গেল তখন পিছনে রইল, কালভে দেখলেন, পাক-খাওয়া ধূলির মেঘ।

সেই মেঘ সরে গিয়ে ফুটে উঠল আর একটি ছবি।

মেট্রোপলিটান অপেরা-পার্টি দীর্ঘ ভ্রমণের শেষ পর্বে পৌঁছেছে আটলান্টিকের ধারে পিটসবার্গে। গায়ক-গায়িকারা এখন চূড়ান্ত ক্লান্ত।

এক সন্ধ্যায় কালভে ও সালিনাক একসঙ্গে গাইবেন।

সালিনাক কালভেকে ডেকে বললেন, "দ্যাখো, আর পেরে উঠছি না। দুজনই এখন সামর্থ্যের শেষ সীমায়। অথচ স্টেজে উঠলে কি-যে হয়, কি-যে ভর করে, আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মনে হয় যেন আজ সন্ধ্যার গানের উপরেই জীবন-মরণ নির্ভর করছে। তারপর অভিনয় শেষ হলে দেখি, আমাদের রক্ত শুষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আর না, ও-জিনিস আর হতে দেওয়া হবে না—তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমাদের বাঁচতে হবে।"

কালভের মনের কথা টেনে বলেছেন সালিনাক। তিনি সানন্দে রাজি।

'বার্বার অব সেভিলে'র গান আরম্ভ হলো—সালিনাক গাইছেন। উইংসের আড়াল থেকে কালভে দেখতে চাইলেন—দর্শক কারা? একেবারে পিছন দিকে কমদামী আসনে ও-কারা সার দিয়ে বসে আছে? ঝোব্বাঝুব্বি-পরা কালিঝুলি-মাখা লোকগুলি, কয়লার গুঁড়োয় মুখ কালো, অন্ধকারে কেবল ঝকঝক করছে চোখগুলো। নিঃসন্দেহে কয়লা-কাটার দল।

"হতভাগ্যরা!" কালভের বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।—"পাই-পাই পয়সা জমিয়ে ওরা টিকেট কেটেছে, বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাবার সময় পর্যন্ত হয় নি, খনি থেকে সোজা ছুটে এসেছে, জীবনে বোধহয় এই প্রথম গ্র্যাণ্ড অপেরা দেখবে—ওদের বঞ্চনা করব—না না না—।"

সালিনাককে ডেকে কালভে বললেন, "ওদের দিকে চেয়ে দ্যাখো। ওদের কাছে প্রাণ ঢেলে গাইব না—বলো? ক্লান্ত আমরা ঠিক—তবু—ওদের অনেকে হয়ত আমাদেরই দেশ-গাঁয়ের লোক—কত আশা নিয়ে এসেছে—ওদের ফাঁকি দেব?"

উদার উষ্ণপ্রাণ সালিনাক সাড়া দিলেন তখনি। সে রাত্রে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে গাইলেন—আবেগ ঢেলে দিলেন—স্নায়ুতন্ত্রী ছিঁড়ে যেন কণ্ঠের বীণার তার তৈরি করে বাজালেন। তারপরে যখন শেষ করলেন, সমবেত আনন্দের মহাপ্লাবনে ডুবে গেলেন তাঁরা। শ্রমিকেরা এগিয়ে এলো অভিনন্দন জানাতে। মানপত্র লিখে এনেছিল তারা। মস্ত এক ফুলের তোড়ার সঙ্গে তা অর্পণ করল কালভেকে। তারপর খাঁটি ল্যাটিন রীতিতে একে-একে সকলে কালভেকে

আলিঙ্গন করে দুই গণ্ডে এঁকে দিল সমাদরের চুম্বন। তারা চলে যাবার পরে দেখা গেল, কালভের মুখ কয়লার চিমনির আকার ধারণ করেছে। কিন্তু তারই মধ্যে মর্মে বাজছে সৎ শিল্পীর জীবনসত্যের ঝঙ্কার :

"যখন ক্লান্ত থাকি তখন চেষ্টা করি সবটা না দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। তার ফল হয় জঘন্য। ছোট হয়ে যাই নিজের কাছে। তখন আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—ঢেলে দিই আমার আনন্দ, আশা, প্রাণ, জীবন—তাতে ফিরে পাই নিজেকে। যত দিই—দেবার জিনিস পেয়ে যাই—"

মহাশিল্পী এমা কালভে। চল্লিশ বছরের শিল্পীজীবন তাঁর। গোড়াকার অল্প কয়েক বছরের কথা বাদ দিলে সাফল্যের সিংহাসনে আসীন ছিলেন শেষ অবধি। খুব কম গায়িকার পক্ষেই তাঁর মতো দীর্ঘ দিন ধরে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গীতজগতে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গীত-জগৎ থেকে যখন বিদায় নিয়েছেন, কণ্ঠ নীরব, আলোকিত মঞ্চে দ্যুতিবিকীর্ণ চেহারা নিয়ে উপস্থিত নন, যখন কেবল স্মৃতি মাত্র, তখনো ইতিহাস থেকে মুছে যান নি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনেক ইতিহাসে, বিশ্বকোষে, মর্যাদার সঙ্গে তাঁর গীতকীর্তি উল্লিখিত আছে দেখেছি, কোনো-কোনো ভূমিকায় এখনো তাঁকে সর্বোচ্চ শিল্পী মনে করা হয়। আর যখন পূর্ণ প্রতিভায় গাইতেন, তখনকার উচ্ছ্বাস তো সীমাহারা। তখন রাজা-মহারাজারা তাঁর অভ্যর্থনা করেছেন, রাণীরা খুলে দিয়েছেন গলার মালা, কবিরা তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন, সুরকার তাঁকে মনে রেখেই রচনা করেছেন বিশেষ সুর, সাহিত্যিক উৎসর্গ করেছেন গ্রন্থ, শিল্পী এঁকেছেন ছবি, ভাস্কর তৈরি করেছেন মূর্তি, আর আশীর্বাদ করেছেন ঈশ্বর-পথিক।

সফল জীবন। শুধু আলো আর উৎসব। সত্যই তাই? অন্ধকার নেই? নেই বঞ্চনা, হতাশা, আর্ত আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস? পাদপ্রদীপের আলোয় যাঁর মুখ দেখি, তিনি যখন চলে যান সাজঘরে তখন সেখানে কোন্ মানুষ তিনি? কী আছে তাঁর জন্য—শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা? না-কি বিলাসের বিপুল আয়োজনের আশ্রয়ে একটি লুণ্ঠিত মূর্ছিত কান্না শুধু?

শিল্পীকে তাই আমরা জানতে চাই। যখন পর্দা উঠেছে, ঝঙ্কারে-ঝঙ্কারে প্রমত্ত বাদ্যযন্ত্র, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শত-শত দর্শকের উৎসুক দৃষ্টিকে ধন্য করে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলেছেন—'লেডিজ অ্যান্ড জেণ্টলমেন', 'গ্রিটিংস্ মাই ফ্রেন্ডস্ অ্যান্ড কমরেডস্'—তখন তাঁদের সেই স্বরচিত বা পরিচালক-রচিত চেহারাকেই কেবল আমরা দেখতে চাই না—তাঁর অন্তরালের জীবন, যাকে রচনা করেছেন স্বয়ং বিশ্বশিল্পী, তাকে দেখার ইচ্ছাও হয়—যদি সত্যই সে সুযোগ পাওয়া যায়। সে সুযোগ আমরা পেয়েছি মাদাম কালভের আত্মজীবনী পড়ে। যথার্থ একজন শিল্পীর জীবনের ইতিহাস সেখানে লেখা আছে—জীবনের কাব্য—সঙ্গীত—নাটক—উপন্যাস। এক শিল্পীর কাহিনীতে পাই অনেক শিল্পীর কাহিনী, এক কালভের কাহিনীতে মেলে, পূর্বের পরের অনেক কালভের

কাহিনী। সেই জীবনচিত্রকে অংশে-অংশে তুলে আনব, দেখব উচ্ছলতার সঙ্গে উদ্ভাসনকে, শিখর এবং গুহাগহ্বরকে, জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে অন্ধকারের মিত্রতাকে, ঝড়ের কান্না কিভাবে মহাশঙ্খরবে বিদীর্ণ হয় সেই পরমাশ্চর্য রূপান্তরকে। দেখব দ্বিপ্রহরের সূর্যকে এবং সূর্যগ্রহণকে। দেখব মানুষকে—আমি-তুমি-সে-ও—সব মানুষকে।

রিচার্ড ওয়াটসন গিল্ডার লিখেছেন :

> **Sweetness and strength high tragedy and mirth,**
> **And but one Calve on the singing earth.**
>
> *মধুরতা ও শক্তি, দারুণ ট্রাজেডি ও উচ্ছল রঙ্গ—সে কে ?*
> *সে কালভে—সঙ্গীতজগতে একমাত্র—কালভে ! কালভে !*

কেবল সঙ্গীতজগতে কেন, এমা কালভের জীবনজগতেও কি নানা সুরের সম্মিলন ঘটে নি ?

কালভের জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠা ওল্টানো যাক।

মহাপ্রতাপশালী জারের আমলে কালভে রাশিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্স-বার্গে গেছেন গান গাইতে। প্রকাশ্য অবতরণের আগে হ্যামলেটের রিহার্সালে তিনি অংশ নেবেন। ইম্প্রেসারিও এসে বললেন—কালভে যেন অতি সুন্দর সাজে রিহার্সালে যান কারণ ওখানে উপস্থিত থাকবেন রাজপরিবারের লোকেরা। ওঁরা বহিরাগত শিল্পীকে আগে-ভাগে দেখে নিতে চান।

থিয়েটার-হলে পৌঁছে কালভে দেখেন—দারুণ ব্যাপার ! রিহার্সাল দেখতেই হল ঠাসা-ভর্তি। প্রচুর অভিজাত নারী-পুরুষ সমবেত। নৌ-বিদ্যালয়ের সকল ক্যাডেট হাজির, বহু অফিসারও সেই সঙ্গে। আরম্ভের আগে কালভের কাছে এসে পৌঁছল একরাশ পদ্মগাঁথা একটি মালা, গ্র্যাণ্ডে ডাচেস ভ্লাদিমির পাঠিয়েছেন, ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যের জন্য।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী কালভে রিহার্সালেও প্রাণ ঢেলে গাইলেন। দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশে জড়িয়ে নিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড-ডাচেসের দেওয়া পদ্মমালা, শেষ দৃশ্যে সে মালাকে লুটিয়ে দিলেন কাঁধের উপরে। পাগলিনী ওফেলিয়া পাগল করে দিল তরুণ রাশিয়ানদের। তারা যেমন শিল্পপ্রেমিক তেমনি উত্তেজনাপ্রবণ। শেষ দৃশ্যের পরে দর্শকের অভিনন্দন নেবার জন্য কালভেকে অন্তত কুড়িবার ফিরতে হলো। সেখানেই শেষ নয়, শেষবার যখন এসেছেন তখন প্রথমে বিস্ময়ে, তারপর আতঙ্কে দেখেন—ক্যাডেটরা ছুটে আসছে মঞ্চের দিকে, মঞ্চে উঠে পড়ল তারা, যন্ত্রবাদকদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, ফুটলাইট টপকে, স্টেজে উঠে, কালভেকে ঘিরে ধরল, স্তুতি ও সহর্ষ চীৎকারে তাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে খ্যাপার মতো হস্তচুম্বন, স্কার্ফচুম্বন, জামার আস্তিন চুম্বন করে চলল, তাতেও যথেষ্ট হলো না, একজন আবেগের মাথায় প্রচণ্ড কামড় দিল কালভের হাতে !

কষ্টের আনন্দে কঁকিয়ে কালভে বললেন, "বন্ধুগণ ! বন্যগণ ! তোমরা কি

আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলতে চাও ? পথ ছাড়ো, যেতে দাও।" তারপরে হঠাৎ-ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে কালভে ছিটকে ঢুকে গেলেন ড্রেসিংরুমে, আর দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন।

এই এক দৃশ্য—যেখানে উৎসাহী তরুণেরা পর্দা ছিঁড়ে মঞ্চে উঠে পড়েছিল। এই সেণ্ট পিটার্সবার্গেই আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে।

রাজসভায় প্রতিপত্তিশালিনী এক মহিলা কালভেকে বাড়িতে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। অপূর্ব সজ্জিত তিন ঘোড়ার ত্রোইকায় বসিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহিলার বাড়িতে কালভের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য উপস্থিত আছেন এক প্রসিদ্ধ বাদক। কালভেকে এক মস্ত জনশূন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে মহিলা বললেন, "গান শুরু করুন।"

কালভে, সবিস্ময়ে : "এখানে গাইব, কার জন্যে ? শুনবে কে ?"

মহিলা : "অতিথিরা সবাই হাজির ; ওঁরা আছেন পর্দার অন্তরালে। ওঁরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। ওঁদের জন্য গান ধরুন।"

সুতরাং কালভে প্রাণপণে গাইলেন পর্দার উদ্দেশ্যে। যবনিকা অবশ্য একে-বারে অকম্পিত ছিল না, মাঝে-মাঝে সুখ ও তৃপ্তির শ্বাস তাকে কাঁপিয়েছিল। রাজপ্রাসাদেও কালভে একইভাবে গান গেয়েছেন।

রাশিয়ায় স্বল্প অবস্থানেই কালভে রাশিয়ান ভাষার (এবং যে-কোনো ভাষার) মূল দুটি শব্দ শিখে ফেলেছিলেন—'দা' অর্থাৎ হাঁ, এবং 'নিয়েৎ' অর্থাৎ না। সেণ্ট পল ক্যাথিড্রলে ভূতপূর্ব জারের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিবাসর হবে, ফরাসি দূতাবাস থেকে কালভেকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালভে যথাসময়ে হাজির। একেবারে সেরা সাজে গেছেন, রাজকীয় ঐশ্বর্যে যেন ঝলমল করছেন—এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন ব্যবস্থাপক। তিনি রাশিয়ান ভাষায় কী যেন বললেন। সমুন্নত অহংকারে, বদান্য হাসি ছড়িয়ে, কালভে তাঁকে উপহার দিলেন অধিগত রুশ-শব্দভাণ্ডারের পুরো অর্ধাংশ—"দা।" তৎক্ষণাৎ একেবারে মত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন ব্যবস্থাপক, মহা আড়ম্বর করে নিয়ে চললেন নির্দিষ্ট স্থানে, সংরক্ষিত আসনের সর্বোচ্চে তাঁকে বসালেন। বেষ্টনীর বাইরের দর্শকেরা সতৃষ্ণ কৌতূহলে কালভেকে দেখতে লাগল। কালভে ভাবলেন, ওঁর চমৎকার আসনের জন্য দর্শকেরা কত-না ঈর্ষা বোধ করছে। মহান মর্যাদায় তিনি গরীয়ান হয়ে বসে আছেন—এমন সময়ে অর্গানে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল—ফিরে দেখেন, শোভাযাত্রা করে আসছেন জার ও জারিনা তাঁর দিকে, বহুসংখ্যক ডিউক ও ডাচেসকে সঙ্গে নিয়ে। গ্রাণ্ড ডাচেস ভ্লাদিমির সেই দলে ছিলেন। কালভেকে দেখে তিনি দ্রুত ত্রস্তপদে এগিয়ে এলেন, চাপা উত্তেজিত স্বরে বললেন, "সর্বনাশ! করেছেন কি ? একেবারে স্বয়ং রাজমাতার আসনে বসেছেন ?"

ধরণী দ্বিধা হও। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ঝটিতি উঠে কালভে বেরিয়ে এলেন বেষ্টনী থেকে। তারপর সভাস্থলের গোটা অংশ ঘুরে সকলের চোখের উপর দিয়ে হেঁটে তবে তিনি নিজের জায়গায় পৌঁছলেন—নিতান্ত মাঝারি

একটি আসন—চার্চের শেষের দিকে।

না, এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও কালভেকে নির্বাসনে পাঠানো হয় নি। গ্রাণ্ড ডাচেস ভ্লাদিমির শুধু বলেছিলেন, "দেখা যাচ্ছে, কেবল একটি শব্দের দ্বারা আপনি এদেশে অনেক উঁচুতে উঠতে পেরেছিলেন!"

কালভে কেবল অভিজাতদেরই গান শোনান নি। শিল্পীদের এই সৌভাগ্য—তাঁরা উপস্থিত হতে পারেন রাজা থেকে প্রজায়, জমিদার থেকে কৃষকে, শাসক থেকে শাসিতে। কালভের গান শুনতে আসতেন সাম্যবাদী বিপ্লবীরাও। এঁদের একজন—এক মরীয়া তরুণী নিহিলিস্টের সঙ্গে কালভের পরিচয় হয়ে যায়। মেয়েটি আগুনে-পোড়া গলায় জারতন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের কথা শোনাত। একদিন চরম জ্বালাময় ভাষায় যখন সে অনর্গল বলে যাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী—আর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিজ্ঞার কথা—নিজের রক্তময় 'বিশ্বাসের' কথাও—কালভে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটি বলল, "আমি কেন, এখানে থাকলে আপনিও একই পথে যেতেন। শিল্পীপ্রাণ আপনার, আপনি কখনো সহ্য করতে পারতেন না।"

রাশিয়া থেকে চলে যাবার ৬ মাস পরে কালভে সেই মেয়েটির একটি চিঠি পেলেন:

"সাইবেরিয়া থেকে লিখছি। দেখুন, আমার 'বিশ্বাস' আমাকে কোথায় টেনে এনেছে। আছি ইউরোপের শেষ সীমায়। শীতে ক্ষুধায় মৃত্যুদ্বারে। সতৃষ্ণ মনে কতবার ভাবি সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলির কথা—যখন আমি আপনাকে ওফেলিয়া ও কার্মেন গাইতে শুনেছিলুম।"

নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ…

এমা কালভের কাহিনী আপাতত একজন সফল শিল্পীর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা জীবনের কাহিনী। কিন্তু সাফল্য যদি পেয়ে থাকেন কিভাবে পেয়েছেন, অনিবার্য ব্যর্থতাগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে কত রক্ত ঝরেছে, কী পেয়েছিলেন জন্ম ও পরিবেশসূত্রে, অর্জন করেছিলেন কতখানি নিজ শক্তিতে—সে কাহিনীর মূল্য আছে।

সুতরাং যাওয়া যাক নদীর উৎস সন্ধানে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের অ্যাভেইরঁ-তে ১৮৫৮ সালে স্বল্পবিত্ত এক পরিবারে কালভের জন্ম। ক্যাভেন পর্বতমালার প্রস্তরসঙ্কুল বন্য উচ্চভূমিতে বহু পুরুষ ধরে এঁদের বাস। স্থানটি কঠোর, জনহীন। চুণাপাথরের উদ্ধত শিখরগুলি, নিম্নে গভীর খাদ, উপত্যকা, রহস্যময় গুহা—রোমাণ্টিক মাদকতায় পূর্ণ। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে সেখানে আকাশপটে উত্থিত পর্বত শিখরগুলি—সমুন্নত রাজকুমারীর মণিমুকুটের মতো আলোয় ঝলসায়।

দক্ষিণ ফ্রান্সের এই অংশ বাইরের পৃথিবীর কাছে স্বল্পজ্ঞাত। "কিন্তু আমার কাছে সব সময়ই সুন্দরী এই ভূমি। আমি ভালোবাসি এর নির্জন বিস্তার, পাথরের বিচিত্র বর্ণ, এর পাহাড়, উপত্যকা। যেন এর মধ্যে রয়েছে মরুভূমির তীব্র আকর্ষণীশক্তি, তার বিষণ্ন নির্জনতা।"

রুথেনিয়ান উপজাতির বাসভূমি এই স্থান। রোমানরা তাদের পরাভূত করেছিল কিন্তু সহজে পারে নি। সিজার নাকি বলেছিলেন, 'ওরা এক অদম্য জাতি, দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে ওৎ পেতে থাকে নেকড়ের মতো।' ওরা আঁকড়ে আছে ঐতিহ্যকে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকে।

"এমনই এক বংশের কন্যা আমি। অতীতে প্রোথিত শিকড় আমার। আমি ঐ মৃত্তিকার অংশ—ঐ দক্ষিণের জ্বলন্ত আকাশের। অন্যত্র আমি পরদেশী।"

বালিকা এমা কালভে কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে একদিন দাঁড়িয়ে দেখছিল একটি বিরাট প্রাসাদকে। সমস্ত তল্লাটের একমাত্র প্রাসাদ, পাহাড়ের চূড়োয় সগৌরবে উঠে আছে। সেই মধ্যাহ্নে, উত্তপ্ত আলোর মদ্য গড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে, দুর্গপ্রাসাদটি দেখাচ্ছিল আকাশপটে অঙ্কিত বিশাল জ্বলন্ত শিল্পসৃষ্টির মতো—সেদিকে তাকিয়ে বালিকারা সম্ভ্রমে অভিভূত—এমা ফিস্‌ফিসিয়ে তার সঙ্গিনীদের বলল স্বপ্নাতুর কণ্ঠে—"কে জানে, একদিন হয়ত এই দুর্গপ্রাসাদ আমারই হবে!" প্রথমে অবাক, তারপরেই হাসিতে ভেঙে পড়ে মেয়েগুলি: "কি বকছিস? ঐ মস্ত প্রাসাদ তোর হবে? ওটা বিক্রি হবে শুনলি নাকি? আর হলেই বা কি—তোদের মতো গরিবরা কিনবে ওটা—? হি-হি-হি—।"

অবাস্তব কল্পনাকে এমা বাস্তব করেছিল! "পথ ছিল কঠিন ও দীর্ঘ···দুঃখ যন্ত্রণা নৈরাশ্য···কিন্তু যাত্রা যখন শুরু হয়েছে, থামা যায় নি পথের মাঝে··· থামা যায় না···।"

কালভের জীবনের দ্বৈতের শুরু এখান থেকে। দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের মেয়ে, নিজেদের গ্রাম্য কুটীরের জন্য গর্বিত—সে একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখে প্রাসাদের। নিজেকে সে স্বদেশের মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট বলে অনুভব করে—কিন্তু ঘুরে বেড়ায় দেশে-দেশে। দক্ষিণ ফ্রান্সের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার স্পর্শ-কাতরতার সীমা নেই, অথচ সে প্রথম যে-ভাষায় কথা বলেছিল তা ফরাসি নয়—স্প্যানিশ!

কালভের পিতা ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ছেড়ে চলে যান স্পেনের একটি ছোট শহরে—কালভের বয়স তখন তিন মাস। সাত বছর বয়স পর্যন্ত কালভে সেখানে ছিলেন। "ফলে আমি প্রথমে যে ভাষা বলেছি তা স্প্যানিশ।" যে-উদ্দাম জীবন-চেতনাকে সুরে-অভিনয়ে ব্যক্ত করার প্রতিভায় কালভে অবিস্মরণীয় নায়িকা, সে জীবনের স্বাদও পেয়েছিলেন এই স্পেনেই, অতি শৈশবে, যা তাঁর স্নায়ুতে রক্তে প্রবেশ করে গিয়েছিল। জিপসিরা ওখানে মাঝে-মাঝে দল বেঁধে আসত। ঝলমলে টুকরো-কাপড় জুড়ে তৈরি-করা তাদের পোশাক, নাগিনীর মতো লক্‌-লকে চেহারা, বিদ্যুৎ-চমকানো চোখ, দুর্বোধ্য ভাষা, ঝোলা-ঝুলির মধ্যে যাদুকরী জিনিসপত্র—কি বিচিত্র, কি রহস্যময়! তারা নাকি ছেলেধরা, ছোটদের ঝুলিতে

পুরে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা এলেই মায়েরা বাচ্ছাদের সামলাতে ব্যস্ত থাকেন। কালভেকে তার মা কত সাবধান করেছেন, কিন্তু শিশুমনের কাছে জিপসিদের নাচ-গানের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ছন্দে যখন তাদের শরীর দোলে, থরথরিয়ে ওঠে বাসনার গান, তখন প্রাণমূলে নাড়া খায় শিশুটি। আর··· একদিন সে সত্যই টলমল পায়ে হেঁটে গিয়ে জিপসিদের দলে জুটে পড়ল। তার মা তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে অবশেষে দেখেন, "সুখী ছোট্ট রাণীর মতো সে জিপসিদের মধ্যে নাচছে, গাইছে, একেবারে খাঁটি জিপসি-রীতিতে।"

মানবো না কোনো বন্ধন—প্রেমের—কর্তব্যের—নীতির—সমাজের—। কালভে গাইবেন তারই গান বাঁধনছেঁড়া উল্লাসে, বেপরোয়া জিপসি-ছন্দে।

আবার স্থির প্রতিজ্ঞায় বজ্রদৃঢ় এক কালভেও ছিলেন।

কালভের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছরের মতো, স্পেনেই আছেন, তখন সেখানে চলেছে দারুণ রাজনৈতিক উত্তেজনা। সিংহাসনের দাবিদার ডন কারলস্ সৈন্য জুটিয়ে বিদ্রোহ করেছেন, স্থানীয় অধিবাসীদের সহানুভূতিও পেয়েছেন। কালভের মা ভিনদেশী হলেও স্থানীয় অনুভূতির টানে কারলস্-সমর্থক।

একদিন বিকালে শিশু কালভে শোয়ার ঘরে বিরাট ঢালাও বিছানায় শুয়ে আছে, মা কি-একটা করছেন, হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে একজন টলতে-টলতে ঘরে ঢুকে লুটিয়ে পড়ল। কালভে ককিয়ে উঠল। তার মা কিন্তু বুঝেছেন ব্যাপারটি, চকিতে ছুটে গিয়ে হুড়কো টেনে দরজা বন্ধ করেছেন, তাকে তুলেছেন, আহত হলেও সে জ্ঞান হারায় নি, হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেছে, "আমি কারলস্-পন্থী, সরকারী সৈন্যরা আমাদের তাড়া করেছে, সঙ্গীরা পালিয়েছে, কিন্তু গুলি লেগে এত রক্ত বেরিয়ে গেছে যে, পালাবার শক্তি আমার নেই।" কালভের মাকে আঁকড়ে ধরে তরুণ-কিশোর ছেলেটি আর্ত কণ্ঠে বলেছে, "দোহাই, আমাকে লুকিয়ে রাখুন, ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন!" কথা শোনার ফাঁকে-ফাঁকে কালভের মা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন, ফালি কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে ফেলেছেন। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে শিশু কালভে সব দেখছে। কাজ শেষ করে তার মা ছুরির ফলার মতো চোখে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছেন, তারপর স্থির গলায় বলেছেন, "খুকি, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো।" কালভে উঠতে না উঠতে তিনি চাদর ও পালকের গদি সরিয়ে এক জায়গায় ফাঁক করে দিয়ে সেখানে আহত ছেলেটিকে শুইয়ে দিয়েছেন, তার নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থা রেখে গদি ও চাদর উপরে বিছিয়ে দিয়েছেন, তারপর বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে, কালভেকে কোলে নিয়ে, তার চোখে চোখ রেখে বলেছেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, তুমি এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। মনে রেখো, তুমি এখন ঘুমুবে, একটুও নড়বে না। আর শোনো, তুমি কিছুটি দ্যাখো নি। বাইরের লোকজন যদি এসে পড়ে—মনে রেখো, তুমি একেবারে কিছু দ্যাখো নি—"

কথা শেষ হতে না হতে দরজায় প্রচণ্ড আঘাত। খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকল সৈন্যরা। তারা কঠিনভাবে নানা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে, উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও,

পলাতক বিদ্রোহীকে পায় নি—না, তাদের পক্ষে 'ঘুমন্ত' শিশুকে জাগিয়ে তুলে বিছানা খুঁজে দেখার মতো সন্দিগ্ধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

"আমার বয়স তখন চার-পাঁচ বছরের বেশি নয়। কিন্তু যে-তীব্র অনুভূতি বোধ করেছিলাম, দারুণ আতঙ্ক ও উত্তেজনা—তা এখনো মনে জীবন্ত। ওটা যেন গত সপ্তাহে ঘটেছে। জীবনে সেই প্রথম একটি নতুন আবেগ অনুভব করেছিলাম, দারুণ এক দায়িত্ব, কারণ আমার মা আমাকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন —তাঁর জন্য, এবং ঐ আহত কিশোরটির জন্য, আমার নড়াচড়া করা বা কেঁদে ওঠা চলবে না।···কয়েক মুহূর্তে পেয়েছিলাম গভীরতম এক অভিজ্ঞতা—আত্মশাসনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা।"

শিল্পীর জন্ম···

কালভের সাত বছর বয়সে তার মা স্পেন ছেড়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন। অনেক কষ্টে কালভেকে স্প্যানিশ ভাষা ছাড়িয়ে ফরাসি ধরানো হলো। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মিলাউ-এ কনভেন্টে লেখাপড়া শেখার জন্য। ছুটিতে বাড়ি ফিরত। সেখানে ছিলেন স্নেহময়ী পিসি ও বিশ্বস্ত দাসী মার্গারিদো। কালপ্রাচীন সেই বাড়ি, এধারে-ওধারে খামার, গোলাবাড়ি, চারণভূমি, গরু ভেড়ার পাল, প্রান্তর। বাড়ির পিছন দিকে পাহাড়ের গা কেটে-কেটে ওপরে ওঠা বাগান—ফুলের, ফলের, সবজির। রঙ ও গন্ধের জাল-বিছানো বাগানে ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির মতো সে ঘুরত আর স্বপ্ন দেখত। অপরাহ্নের মায়াময় আলো পেরিয়ে সন্ধ্যার ঘণ্টা যখন বাজত, সে চলে যেত ঘরের মধ্যে, নতজানু হয়ে প্রার্থনা করত, নৈশ আহার-শেষে গল্প শুনত দাসী মার্গারিদোর মুখে। কোনো কোনোদিন ভূতের গল্প শুনত বুড়ো মেষপালক ব্র্যাইজের মুখেও, ভয়ে কঁকিয়ে উঠত, কিন্তু না-শুনেও পারত না। তারপর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত—ফুলের, গন্ধের, ভূতের, পরীর···।

কনভেন্টে ফিরে গিয়ে বুড়ো মেষপালকের কাছে শোনা গল্পগুলোকে আরও রঙ চড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে শোনাত সহপাঠিনীদের। কখনো গাইত গান নীচু করুণ সুরে। সঙ্গিনীদের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত, কেউ-বা কাঁদত অজানিত বেদনায়।

একদিন সিস্টারের চোখে পড়ল—একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে। 'কি হলো, কাঁদছ কেন?' মেয়েটি বলল, 'সিস্টার, এমা গান গেয়ে আমাদের কাঁদাচ্ছিল।'

তখন জন্ম হয়ে গেছে শিল্পীর।

এমা শিল্পীই হলো—সন্ন্যাসিনী নয়। কিন্তু সন্ন্যাসিনী হবার স্বপ্ন সে কম দেখে নি। কনভেন্টের ধর্ম ও মিস্টিসিজমের আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সে স্থির করেছিল সন্ন্যাসিনী হবে। কনভেন্টের যাজিকারা তাই চাইছিলেন—তাহলে

গির্জার আরতি-গীতে এক অসামান্য দেবদাসীর কণ্ঠস্বর যুক্ত হবে। কনভেণ্টের এক অনুষ্ঠানে এমা যখন বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ফেলিসিয়েন ডেভিড-এর লেজ্‌ইর্‌দেল্‌ এবং লামার্তিন-এর ল্যা লাক্‌ গেয়েছিল, তখন রোদেজের বিশপ বলেছিলেন, 'কি অপূর্ব! এ কোন্‌ অজানা কণ্ঠস্বর! আর এমন ব্যঞ্জনাময় মুখ! এ তো শিল্পী!'

এমা শেষ পর্যন্ত যখন বরণ করলেন শিল্পীর জীবন তার কিছু বছর পরে একবার এই কনভেণ্টের এক অনুষ্ঠানে গুনো-র 'আভে মারিয়া' গেয়েছিলেন, তখন সঙ্গীতে মুগ্ধ কিন্তু এমার জীবনের পরিণতিতে বিষণ্ণ মাদার সুপিরিয়র বলেছিলেন, 'হায়রে বাছা! যে চেয়েছিল সন্ন্যাসিনীর পবিত্র পোশাক পরতে তার জায়গা হলো স্টেজে! কি দুর্ভাগ্য! আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব।'

কালভের স্নেহময়ী পিসিও একই কথা বলেছিলেন, 'ওরে দুর্ভাগা মেয়ে আমার, এ তুই কী করলি? চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে গেলি? আমাদের বাড়ির মেয়ে হলো অভিনেত্রী—আগেকার দিন হলে চিহ্নিত পবিত্র সমাধিভূমিতে যাদের ঠাঁই হতো না! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর।'

কান্নায় ভেঙে পড়ে পিসি বললেন, 'বাছা, আমি তোর জন্য প্রার্থনা করব।'

অনেকেই প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোনো প্রার্থনাই তাঁকে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চজীবন থেকে সরিয়ে আনতে পারল না। তবু কোনো প্রার্থনাই ব্যর্থ হয় না। মরুপথে ধারা-হারানো নদী বেঁচে থাকে মরুভূমির বুকের মাঝখানে। কালভের বাসনার গানের গভীরে তাই বেজেছে ঊর্ধ্বতর আকুতির শিহর। তার ফলেই কি-না কে জানে, তিনি একদিন বিবেকানন্দের দিব্য কণ্ঠে এই আশ্বাস শুনবেন:

"ঐ যে মঞ্চে তুমি নিজেকে বিদীর্ণ করে মুক্ত করো সুরের উৎস—ও হলো পরম মুক্তির জন্য তোমার অসচেতন চেষ্টা।"

বিবেকানন্দের কণ্ঠে এই যে-কথাগুলি নিবেদিতা শুনেছিলেন, কালভেও কি তা শোনেন নি?—

"...আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির জন্য। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না—মুক্তি চাই। মানুষের জ্বলন্ত অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরও আরও আরও—আরও চাই।...এই 'আরো'-র বাসনাই মানুষের অসীমত্বের দ্যোতক। অসীম মানুষ একমাত্র তৃপ্তি পেতে পারে অসীম কামনা...এবং অসীম প্রাপ্তিতে। আমরা—অনন্তের স্বাপ্নিকেরা—আমরা দেখব সীমার স্বপ্ন—হায়!"

পথ দীর্ঘ...লক্ষ্য বহু দূর...

পনর বৎসর বয়সে কালভে কনভেণ্ট ত্যাগ করেন অপেরা-গায়িকা হবার জন্য।

ফ্লোরেন্সে যার জন্ম, ইতালি ও ফ্রান্সে যার বৃদ্ধি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্যজগতে যার ক্রমবিস্তার—সেই অপেরা কঠিন শিল্প, কারণ মিশ্র তার প্রকৃতি।

"গানের উপর প্রধানত নির্ভরশীল হলেও এটি নাটকীয় শিল্প। এতে সজ্জিত মঞ্চ, দৃশ্যপট, পাত্রোপযোগী পোশাক, নাটকীয় গতি, সবই আছে। তবে বিষয়-বস্তুকে উপস্থিত করা হয় মুখ্যত অর্কেস্ট্রা-সঙ্গত সঙ্গীতের সাহায্যে। এখানে কাহিনী ও সঙ্গীতের ভারসাম্যযুক্ত সহযোগ। উভয়ের সম্মিলনে যে আবহ ও রসসৃষ্টি হয় তাকে শুধু কাহিনী বা শুধু সঙ্গীতের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়।"

এই কঠিন শিল্পের সিদ্ধি তাঁরই জীবনে ঘটবে যিনি একই সঙ্গে সেরা অভিনেতা ও সেরা গায়ক।

কিশোরী কালভের কৃশ চেহারায় রূপের দ্যুতি, ভাবে-ভঙ্গিতে প্রাণের ছন্দ, দক্ষতা নৃত্যে, কণ্ঠে সুরের উল্লাকাকলি। নিজেকে নির্মাণ করতে পারলে হয়ত শিল্পের দুর্লভ স্বর্ণসিংহাসনে বসতে পারবেন।

কালভেকে অপেরা-গায়িকা করবার পিছনে তাঁর মায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীল পরিবারের মানুষ হলেও তিনি ও তাঁর স্বামী ছিলেন অনেকটা মুক্ত-দৃষ্টি। তাছাড়া সংসারও সচ্ছল ছিল না। যদি মেয়ে গান থেকে কিছু রোজগার করতে পারে কিছুটা সুরাহা হয়, মা ভেবেছিলেন। তিনি নিজে চমৎকার গান গাইতেন, বিশেষত প্রাচীন ফ্রান্সের লোকগীতি। কালভেকে গানের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াবার জন্য গ্রাম থেকে প্যারিসে এসেছিলেন। শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেবার পয়সা ছিল না, তাই তাঁদের কাছে এই বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছেন, 'আপনারা একে যাচিয়ে দেখুন, যদি যোগ্য মনে করেন শেখাবেন। এখন পারিশ্রমিক দিতে পারব না। কিন্তু আমার মেয়ে ভবিষ্যতে গান গেয়ে রোজগার করতে পারলেই দেনা শোধ করে দেবে।' অদ্ভুত কথা। ফল, প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান। শেষে ওই শর্তে রাজি হলেন জ্যুল প্যুজে। তাঁর কাছে কালভের শিক্ষা শুরু হলো।

সাহায্য কোন্ পথে আসে কেউ বলতে পারে না। তা এল এমন-কি কসাইয়ের কাছ থেকেও।

কালভে'দের বাসা থেকে শিক্ষকের বাড়ি অনেকখানি দূরে। ঝড় বৃষ্টি বরফের মধ্য দিয়েও কালভেকে বহুদূর হেঁটে সেখানে যেতে হয়। কষ্টে কালভের শরীর শীর্ণ হয়ে গেল। তা দেখে বড়ো দুঃখ হয় পাড়ার কসাই ও তার স্ত্রীর। তারা কালভের গানে মুগ্ধ। একদিন কসাই কালভের মাকে বলল, 'আপনার মেয়ে খুব ভালো গায়, কিন্তু বড্ড রোগা। ওর উচিত রোজ বেশ খানিক মাংস খাওয়া।' এই অযাচিত উপদেশে কালভের মা বিরক্ত হয়ে কী-একটা বলতে যাচ্ছেন, কসাই বাধা দিয়ে বলল, 'শুনুন, একটা মতলব বার করেছি। ওর নামে একটা খাতা খুলব। ওর জন্য যে-মাংস দরকার নিয়ে যাবেন। তারপর ও গান গেয়ে রোজগার করলে টাকা শুধে দেবেন। হেঁ হেঁ, ও হলো গিয়ে শিল্পী, ওকে সবারই দেখা দরকার।'

জ্যুল প্যুজে-র কাছে কালভে বছর তিনেক শিখলেন। তিনি কালভেকে

আত্মবিশ্বাস বাড়াতে একটা কনসার্ট দলের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন—সেই দলের সঙ্গে কালভে ফ্রান্সের নানা জায়গায় ঘুরেছেন। অল্পস্বল্প উপার্জনও করেছেন। হঠাৎ একটা বড়ো রকমের সুযোগ এল যখন ব্রাসেলস্-এর টেয়াটর দ্য লা মোনে দ্য ব্রুসেল-এর ডিরেক্টর তাঁকে বললেন, দু' সপ্তাহের মধ্যে ফাউস্টের মার্গারিটের ভূমিকায় তিনি নামতে রাজি কিনা ?

হাতে মাত্র দু'সপ্তাহ, কালভে ওই ভূমিকার একটা সুরও জানেন না, কথাও মুখস্থ নেই। তবু রাজি। কঠিন পরিশ্রমের পরে কালভে ওই ভূমিকায় নেমে সমাদর পেলেন। তাঁর দেহে যৌবনের মাদকতা, হাব-ভাব-অভিনয়ে প্রাণের স্ফূর্তি এবং কণ্ঠস্বরে বিরাট শক্তি।

দূরবিস্তারী সেই কণ্ঠশক্তি—বন্ধুর পথের প্রতিটি অণুকে স্পর্শ করতে সমর্থ, নিম্নগহন থেকে ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ে যায় স্বচ্ছন্দে। নাভিমূলের 'এ' থেকে কণ্ঠ উঠে পড়ে উচ্চ 'সি'-এর উপরে 'ই'-তে। স্বর-রাজ্যের এই ব্যাপকতার জন্য 'এরোদিয়াদ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'এরোদিয়া' এবং 'সালোমে'—এই দুইয়ের গানই এক-সঙ্গে গাইতে পারেন—প্রথমটি কনট্রালটো ভূমিকার, দ্বিতীয়টি সোপ্রানো-র।

ব্রাসেলস-এ অনেকগুলি ভূমিকায় গান গাইলেন। কিছুটা সাফল্য পেলেন, এবং হাস্যকরুণ ঘটনাও ঘটালেন।

মোৎসার্টের চেরুবিন গাইবেন। কিন্তু তিনি ইদানীং নিজের সরুসরু ঠ্যাং নিয়ে খুবই বিব্রত। হঠাৎ মাথায় মতলব খেলে গেলো—পা তুলোয় মুড়ে তার উপর মোজা চাপিয়ে স্টেজে হাজির হবেন। সেই অবস্থায় গান গেয়ে, সাফল্যে ডগমগ হয়ে, মাতঙ্গিনীর মতো মঞ্চ থেকে প্রথম অঙ্কের শেষে যেই ভিতরে প্রবেশ করেছেন, উইংসের ধারে দাঁড়িয়ে ডিরেক্টর, দু' চোখে আগুন, দন্ত কিড়িমিড়ি—'হতচ্ছাড়ি, ওই বিকট ফুলো-ফুলো জিনিসগুলি কী ? ইচ্ছে করছে ওগুলোর মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দিই। বুঝতে পারছ না, ওই দেখে সবাই হাসছে। ওগুলো দূর করে পরের দৃশ্যে নামবে।' কালভে তাই করলেন। তাই দেখে এবারও দর্শকদের হাসি—একেবারে অট্টহাসি। কালভে বলেছেন, অমন অভিনন্দন ওই প্রেক্ষাগারে আর কখনো পান নি।

কালভের পরবর্তী শিক্ষক মাদাম মার্চেজি। এঁর কাছে শিক্ষা নেবার সময়ে কালভে অনেক দিকপাল গায়ক-গায়িকার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছেন। বিখ্যাত ব্যারিটোন ভিক্তর মোরেল তাঁকে দেখিয়ে দেন কিভাবে গীতি-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে হয়। মাদাম কার্ভালো-র সঙ্গে মোৎসার্টের নস্ দ্য ফিগারো-তে চেরুবিন-এর ভূমিকায় গাইবার সুযোগ পেয়েছেন। একযুগের সঙ্গীতপ্রেমিকদের হৃদয়রানী, ফরাসি লিরিক আর্টের সুকুমারতার প্রতিভূ, মাদাম কার্ভালো-র কাছে কালভে অনেককিছু শিখেছেন।

তবু—না। এখনো হয়নি। হ্যাঁ, পথ দীর্ঘ, লক্ষ্য বহুদূর।

"আমার কণ্ঠশক্তি এবং নাটকীয় প্রতিভা সত্ত্বেও, সাফল্য চমকপ্রদ নয়।

ভাবলাম, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে হয়ত বেশি-কিছু পেয়ে যাব। ইতালিতে যেতে চাইলাম, সেখানে উত্তপ্ততর আকাশের নীচে শিল্পের নতুন জগতের সংস্পর্শে এসে আমি বৃদ্ধি পাব—বিস্তারিত হব—।"

বেদনার অস্ত্রে আত্মার আবিষ্কার···

আঘাত চাই—অপমান!—তবে জাগবে তোমার রক্তাক্ত চেতনা। তারই এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য কালভে নিজের চোখে দেখেছিলেন এই কালে।

লিরিক ট্রাজেডির গীতাভিনয়ে অনন্য শিল্পী মাদাম ক্রাউস, অজস্র অবতরণে ধন্য করেছেন বহু ভূমিকাকে। কিন্তু কি বিচিত্র, মোটে মিষ্ট নয় কণ্ঠস্বর, তোতলামির লক্ষণও আছে, চেহারা অসুন্দর, কুৎসিত বলাই ঠিক। কিন্তু গানের সময়ে রূপান্তর ঘটে—সে এমন এক পরিবর্তন যে, অপেরার অশিষ্ট উন্নাসিক বনেদী দর্শকদের পর্যন্ত অভিভূত করে রাখেন। ত্রিব্যু অপেরার প্রথম রজনীতে কালভে তাঁকে গাইতে শুনেছিলেন। দেশপ্রেমিকার ভূমিকায় তিনি গান গাই-ছিলেন। শেষ দৃশ্যে মরণাহত, তাঁকে ঘিরে আছে সৈন্যদল, রক্তঝরা কণ্ঠে গাইছেন যুদ্ধগীতি। শেষ পতনের আগে আপ্রাণ শক্তিতে নিজেকে ঘষে টেনে নিয়ে গেলেন পাদ-প্রদীপের কাছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন, আঁকা-বাঁকা হয়ে শেষে একবার উঠে দাঁড়ালেন, কণ্ঠে নিয়ে 'দেব্যু আফাঁ দ্য লিবেরি', 'হে আইবেরিয়ার সন্তানগণ!'—তার পরেই লুটিয়ে পড়লেন।

কালভে তাঁর বন্ধুদের সংগে ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। ক্রাউসের গান যেন ঠিক তরবারির আঘাতের মতো—একেবারে শরীর ভেদ করে গেল। কালভে চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন, সবাই বিদ্যুৎ-শিহরিত, একসংগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সবাই যেন আছড়ে পড়তে চাইলেন ঐ প্রচণ্ড আহ্বানে সাড়া দিয়ে।

এমনই মহীয়সী গায়িকা ক্রাউস—একদিন গাইছিলেন মাদাম মার্চেজির ভবনে। বহু বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও গায়ক উপস্থিত। আছেন সংগীতজগতের সম্রাট লিস্‌ট্।

· · ·

হাঙ্গেরীয় সুরকার ও পিয়ানোবাদক লিস্‌ট্ (১৮১১—৮৬) নিজকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পিয়ানো-যন্ত্রজ্ঞই নন, অজস্র মৌলিক সুর রচনাও করেছেন। এক্ষেত্রে রোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রধান পুরুষ। অসামান্য প্রতিভাবান ও রূপবান এই মানুষটি—কাম ও ধর্ম—এই দুই বাসনায় সমভাবে তাড়িত। চার্চের সংগে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, চার্চে যোগদানের সম্ভাবনাও ছিল, যদিও বাস্তবে তা ঘটে নি। প্রতিভার ঐশ্বর্যকে বিতরণ করেছেন অজস্রধারে, স্বীকৃতির অভিজ্ঞানও বর্ষিত হয়েছিল একইভাবে তাঁর উপরে। ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর লামার্তিন, ভিক্‌তর উগো, হাইনে-র সংগে। নিজকালের প্রায় সকল সংগীতশিল্পীকে জানতেন, তাঁদের প্রভাবিতও করেছেন গভীরভাবে—সুরস্রষ্টা, বাদক ও শিক্ষক-

রূপে। তিনিই প্রথম মঞ্চে পিয়ানো-বাদনের একক অনুষ্ঠান করেন; যখন বীঠোফেন, সুবার্ট, বের্লিয়ৎস্, ভাগ্নার প্রভৃতি যথেষ্ট সমাদৃত নন, তখন পিয়ানোয় তাঁদের সুর তুলে, কনসার্টে বাজিয়ে, তাঁদের জনপ্রিয় করেছিলেন।

প্রতিভার জীবনের মতো প্রেমের জীবনও এঁর অফুরন্ত। দীর্ঘজীবনে বহুসংখ্যক পত্নী ও প্রেমিকা গ্রহণ-বর্জনের বদান্যতা দেখিয়েছেন, রূপের প্রতি এঁর তীব্র আসক্তি, লাস্যময় মোহিনী নর্তকী লোলা মণ্টেজ, ইউরোপের রাজ-রাজড়াদের কামনার উর্বশী, তিনিও এঁর কিছুকালের নর্মসঙ্গিনী।

বিরাট পুরুষ লিস্ট্ এখন বৃদ্ধ, গান শুনছেন—ক্রাউস মনপ্রাণ দিয়ে গাইছেন। সকলে উচ্ছ্বসিত, লিস্ট্ কিন্তু নীরব, অবিচলিত, মুখে অভিব্যক্তি নেই। তাঁর ঔদাসীন্যে সকলে পীড়িত।

ক্রাউসের গান শেষ হলো। মাদাম মার্চেজি এগিয়ে এলেন লিস্ট্-এর কাছে। বললেন, "মাদাম ক্রাউস এবার এর্লকোয়েনিগ্ গাইবেন—আপনি কি তাঁর সঙ্গে বাজাবেন?"

বর্বর কণ্ঠে লিস্ট্ বললেন, "না। তেমন ইচ্ছে নেই। ও ভয়ানক কুশ্রী। আর তোতলামি আছে।"

মাদাম মার্চেজি নাছোড়।

শেষে অসন্তুষ্টভাবে লিস্ট্ বললেন, "ঠিক আছে। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, যদি ওর গান ভালো না লাগে, গানের মাঝখানে উঠে চলে যাব।"

বিরক্তভাবে লিস্ট্ পিয়ানোয় বসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে কেশরের মতো কেশ পিছনে উল্টে দিলেন। ছুরির ফলার মতো আঙুলের নখগুলো পিয়ানোর চাবির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তে তীব্র ঝঙ্কার তুলল—তিনি সুবার্ট-এর অনবদ্য সঙ্গীতের প্রস্তাবনাকে ধরে নিয়েছেন।

তখন অপমানে বিবর্ণ ক্রাউস উঠে দাঁড়িয়েছেন। লিস্ট্-এর নিষ্ঠুর নীচ উক্তি তাঁর কানে গেছে। তাঁর মুখ রক্তশূন্য কিন্তু কঠিন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আচার্যের মুখের দিকে, শুরু করলেন গান।

কণ্ঠ চিরে যেই বেরিয়েছে সুরের প্রথম তরঙ্গ, অমনি চমকে তাকিয়েছেন লিস্ট্, বিস্ফারিত চোখ উড়ে গিয়ে মিলেছে ক্রাউসের চোখে, দুই জোড়া চোখ জুড়ে রইল অচ্ছেদ্য আকর্ষণে, আর ওধারে মিলতে লাগল লিস্ট্-এর যন্ত্র-তরঙ্গের সঙ্গে ক্রাউসের কণ্ঠতরঙ্গ। গভীর ঘনিষ্ঠ শিহরিত অপার্থিব দুই সুরের সঙ্গম—যেন দুই চেতনার মিলন।

"তাঁরা তাঁদের ট্রাজিক ভাবপ্লাবনে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রচণ্ডতা, অবর্ণনীয়। ধীরে লিস্ট্ উঠে দাঁড়ালেন। যখন শেষ সুরের কম্পন মূর্ছিত হয়ে নীরব হয়ে গেল, তখন তিনি দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন উদ্‌বোধিত গায়িকার দিকে।

"ভগিনী আমার! পুত্রী আমার! ক্ষমা করো—আবেগে ভগ্ন কণ্ঠে লিস্ট্ বললেন।"

পরমাশ্চর্য কীর্তির পরে নিঃশেষিত ক্রাউস শুধু অস্ফুটে বলতে পারলেন, "ধন্যবাদ।"

কুড়ি বছর পরে আমেরিকার এক সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে সেকালের সঙ্গীত-জগতের প্রধান ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা হয়—তাঁদের অভিজ্ঞতায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোড়নকারী ক্ষণ কোনটি? যাঁরা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে একবাক্যে বলেন, "সে ক্ষণ নিঃসন্দেহে এসেছিল মাদাম মার্চেজির ভবনে যখন লিস্‌ট্‌-এর বাদ্যের সঙ্গে ক্রাউস গেয়েছিলেন।"

অপমান—নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছিল কালভেকেও।

ইতালির মিলানে তিনি এসেছেন গান গাইবার জন্য।

সেখানে প্রথম অবতরণের সন্ধ্যায় কি-যে হলো—এক অদ্ভুত আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন, কণ্ঠে অসাড়তা, চেতনায় যেন পক্ষাঘাত—ব্যর্থ হলেন একেবারে।

দর্শকেরা ফেটে পড়ল ধিক্কারে। বিষাক্ত হিস্‌হিস্‌ শব্দ করে তাড়িয়ে দিল তাঁকে।

বিধ্বস্ত কালভে ফিরে এলেন প্যারিসে। গান ছেড়ে দেবেন। কিন্তু না, কালভের এক গুণগ্রাহী তাঁকে মাদাম রোজিনা লাবর্দ-এর কাছে নিয়ে গেলেন, শিক্ষাদানে যাঁর অতুলনীয় ক্ষমতা।

কালভে আরও এক দরুণ আঘাত পেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রথম বড়ো ট্রাজেডি এই কালেই ঘটেছিল—প্রেমের ক্ষেত্রে। কালভেকে তা ভেঙে চুরমার করে দিল, বিছানা নিলেন, বাঁচবার সম্ভাবনা রইল না। পুরো এক বৎসর সেই অবস্থায় কাটল। সহজাত প্রাণশক্তি ও যৌবনশক্তিতে লড়াই করে চললেন। শেষ-পর্যন্ত সামলে উঠলেন। কিন্তু আরোগ্য অত্যন্ত ধীরে। আর···সেইকালে অনেক-কিছু পড়লেন, ধ্যান করলেন গভীরে, তাকালেন নিজের দিকে, জানলেন অন্তর্গত আমিকে।

"সেই তীব্র যন্ত্রণা, দহন সহন, আমার আত্মাকে দিল নতুন সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতি। আমি পেলাম জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে অনুভবের ব্যাপকতর শক্তিকে। পরে মঞ্চে যখন ফিরে গেলাম, দেখলাম—আমি অবশেষে জেনেছি, কিভাবে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে হয়, পৌঁছতে হয় তাদের সন্নিধানে, কিভাবে তাদের দিতে হয়—আমার উল্লাস, আমার বেদনা, আমার সুখ, আমার দুঃখ···"

যদি পাও নিঙড়ানো যন্ত্রণা তবেই তোমার গান বুকের মাঝখানটিতে ওষ্ঠ রাখবে।

চাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা···

"আবার বলো। না, হলো না—আবার বলো। না, হলো না—আবার বলো।"

মাদাম লাবর্দ কালভেকে দিয়ে ওফেলিয়ার একটি উক্তি একাদিক্রমে আশিবার

বলালেন। নিখুঁতের এতটুকু কমে তিনি খুশি নন।

অপেরা-জগতে প্রভূত সাফল্যের অধিকারিণী মাদাম লাবর্দ শিক্ষিকা হিসাবেও প্রথমশ্রেণীর। ছাত্রছাত্রীদের শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। তাদের শোনাতেন, মঞ্চে নিজের প্রথম অবতরণের দিনটির কথা যখন তাঁর কঠোর শিক্ষক বলেছিলেন, "আমি সামনে বসে থাকব। যদি দেখি খারাপ গেয়েছ, মুখদর্শন করব না।" ভয়ার্ত বালিকাটি ভয় জয় করার মরীয়া চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে দশটি ক্যাডেনজা-কে কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল এবং তাদের সফল রূপায়ণের দ্বারা জয় করেছিল দর্শক ও নিজের শিক্ষককে।

কালভের আনুগত্যে খুশি হয়ে মাদাম লাবর্দ বলেছিলেন, "তুমিই আমার সেরা ছাত্রী।" আর বলেছিলেন, "বাছা, আমি কিভাবে শেখাই তা ভালো করে লক্ষ্য করো, কারণ একদিন তোমাকেও শেখাতে হবে।"

কালভে কোনোদিন শিখতে ক্লান্ত নন। জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যার শেষ নেই, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এবং তিনি সঙ্গীতজগতের মানুষদের আংশিক মানুষ মনে করতেও রাজি ছিলেন না। তাই চাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। সূচনায় আছে শারীরশিক্ষা। "সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কোনো একটি-মাত্র সন্ধ্যার ভূমিকাভিনয়ের জন্য কতখানি পরিশ্রমের দরকার হয়। শ্রোতারা ছেড়ে দেবে না। তারা সবচেয়ে কড়া প্রভু। কার্মেনের মতো ভূমিকায় আমাকে চলতে-ফিরতে-হাসতে-নাচতে-গাইতে হয়—একটানা পুরো চার ঘণ্টা—এক মুহূর্তের ছেদ নেই। দুই অঙ্কের মধ্যে পোশাক বদলাবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।"

কালভে বলেছেন, "কণ্ঠের মতো সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর যন্ত্রকে অটুট রাখতে হলে নিয়মের ব্যত্যয় একদম চলবে না।" "আমার কণ্ঠস্বর রহস্যময় স্বর্গীয় আবির্ভাবের মতো—সে এসেছে আমার কাছে স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য—যেন অমরাবতীর পক্ষিণী কিংবা অপ্সরা, এখন ছোট বোনটির মতো আমার কাছে রয়েছে, কেন রয়েছে তা জানি না, হয়ত বড় অনুনয়ে তাকে ধরে রেখেছি বলে, কিংবা নিজেকে অযোগ্য গৃহকর্ত্রী প্রতিপন্ন করি নি বলে।"

এর পরে আসে ভূমিকার অনুশীলন। "সে কী কঠোর পরিশ্রম। পার্ট তৈরির ব্যাপারে শর্টকাটের পথ নেই। শুধু শব্দ ও সঙ্গীত মুখস্থ করতেই প্রচণ্ড চেষ্টার দরকার। অথচ সেটাই সবচেয়ে সহজ কাজ। তার উপরে আছে নাটকের তাৎপর্য, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, বর্ণিত যুগের পরিবেশ ও প্রকৃতির অনুধাবন। তারপর, প্রতি অঙ্ক, দৃশ্য—না, প্রতিটি বাক্য, বাগ্‌রীতি এবং অন্তর্নিহিত ভাবকে যথোপযুক্তভাবে উদ্‌ঘাটনের প্রযত্ন, যাতে শেষপর্যন্ত দর্শকের কাছে চরিত্রকে অন্তঃসঙ্গতিসমৃদ্ধ জীবন্তভাবে উপস্থিত করা যায়।"

শিল্পীকে ইতিহাস পড়তে হয়—ঐতিহাসিক রচনাকে রূপায়িত করার জন্যে। পড়তে হয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় জীবনী—জীবনের রহস্য-গভীরতাকে উপলব্ধি করার জন্য। সাহিত্য পড়তে হয়—রসচেতনা লাভের জন্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা দেখতে হয়, যাতে সে বুঝতে পারে কিভাবে কল্পনা মূর্ত হয়।..

দ্য লারা রচিত মেসালিন-এর ভূমিকাভিনয়ের জন্য কালভে ক্লাসিক সাহিত্যের ও রোমান ইতিহাসের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন। কার্মেন সৃষ্টির সময়ে জিপসিদের আড্ডায় গিয়ে সাক্ষাতে সবকিছু দেখে-শুনেছিলেন। ওফেলিয়া সৃষ্টির সময়ে এক মনোচিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যিনি তাঁকে উন্মাদাগারে নিয়ে গিয়ে এক তরুণী পাগলিনীকে দেখার সুযোগ করে দেন। "এই হতভাগিনী ব্যর্থ প্রেমের ফলে পাগল হয়ে যায়। যা দেখেছিলাম তা এখনো মনে ছবির মতো ভাসছে। ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক স্মৃতি। কিন্তু ওফেলিয়ার ভূমিকাকে উপস্থিত করার জন্য ঐ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যের অভিনয়কালে আমি কতবার-না ঐ হতভাগিনীর স্মৃতি মনের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছি।"

চরিত্রের মধ্যে অবতরণ করতে হয়, তবেই তার প্রাণরহস্য ধরা পড়ে শিল্পীর কাছে। "যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো হেথা গগনতলে।" চরিত্রের গভীরে আত্মনিমজ্জন করতে কালভে সমর্থ ছিলেন বলে তিনিই বোধ হয় এক-মাত্র যিনি একই সপ্তাহে কার্মেন ও ওফেলিয়ার মতো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা গাইতে পেরেছেন।

অপেরা-গায়িকাকে অভিনয় সম্বন্ধেও যথেষ্ট নজর দিতে হয়। মঞ্চে তার প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনের ছন্দ বাজবে, তাই প্রত্যাশিত। কার্মেনের চঞ্চল ঘূর্ণি-পদ, মার্গারিটের শান্ত নম্র পদ, ওফেলিয়ার দ্বিধান্বিত বা উদ্‌ভ্রান্ত পদ, সাফো-র চঞ্চল আহ্বানের পদ—পদে পদে জীবনের রেখা।

সঙ্গীতের সৃষ্টিশীল শিল্পী হতে গেলে তার প্রচলিত ব্যাখ্যার উপরে উঠবার চেষ্টা করতে হয়। একদিন কালভের সঙ্গে তাঁর এক বান্ধবীর কথা হচ্ছিল বীঠোফেন প্রসঙ্গে। কিভাবে বীঠোফেনকে গাওয়া উচিত, তা কালভে দেখালেন তাঁর একটি বিখ্যাত গান গেয়ে। কালভের বান্ধবী খুশি হলেন না। "কালভে, এ কি কাণ্ড। তুমি কি ভুলে গেলে, বীঠোফেন ক্লাসিক। তুমি অত্যন্ত বেশি আবেগ ঢেলে গেয়েছ, নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছ। আরও সংযত হওয়া দরকার ছিল।"

কালভে বললেন, "কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে না—বুসোনি এ-ক্ষেত্রে কী বলেছেন? আমার কথা না-হয় নাই নিলে, বীঠোফেনের সঙ্গীতকে ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমার সামর্থ্যকে তুমি অবশ্যই সন্দেহ করতে পারো, কিন্তু তুমি নিশ্চয় বুসোনির মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবে। তিনি বলেছেন, শ্রদ্ধার পাথর চাপিয়ে আমরা ক্লাসিককে মেরে ফেলি।"

কালভে প্রশ্ন করেছেন, "বীঠোফেন বা মোৎসার্টের মতো অমর মহানেরা কি কেবল কতকগুলি পণ্ডিতের কচ্‌কচির সামগ্রী হয়ে থাকবেন? তথাকথিত ক্লাসিক শীতলতা এবং পূর্বনির্ধারিত ভঙ্গিযোগে তাঁদের উপস্থিত করাই কি শিল্পীর পক্ষে একমাত্র উচিত কাজ? বীঠোফেন—যিনি এত মানবিক—এমন ট্রাজিক—তাঁকে প্রাণহীনভাবে গাইব কি করে?"

যে-সব গায়ক-গায়িকাকে এতখানি বিবেচনা বহন করে চলতে হয়, তাঁদের

পক্ষে বাধাবন্ধহারা জীবনযাপন করা সত্যই সম্ভব নয়—যদি তাঁরা সঙ্গীত-জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে চান। "অপেরা জগৎকে যিনি জানেন তিনিই স্বীকার করবেন, জনসাধারণ আমাদের যতখানি মজা-লোটা হালকা মনের মানুষ ভাবে, আমরা সত্যই তা নই।…এখানে পাওয়া যাবে অত্যন্ত স্নেহশীল পিতাকে, আত্মোৎসর্গকারী মাতাকে। এখানকার লোকজনের উদারতার কথা সর্ববিদিত। প্রায় সকলেই এক বা একাধিক আশ্রিত আত্মীয় বা বন্ধুকে প্রতিপালন করেন। এমন-কি অতি দূর সম্পর্কেরও কেউ যদি কষ্টে থাকেন, তাহলে আমাদের পক্ষে তা নিন্দের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।"

শিক্ষার্থিনী কালভে নিজেকে দেখতে থাকেন। ভাবেন, দিতে হলে নিতে হবে। গৃহদ্বার খুলে রাখো। তাঁর মনে পড়ে বার্ন জোনস্-এর মর্মস্পর্শী চিত্রের কথা। "অন্ধ ভিখারী হাত বাড়িয়ে আছে—পথচারীরা যা দেবে তাই সে নেবে—সোনা বা রাঙ্, ভালো বা মন্দ।…আমার কাছে এই হল শিল্পীর প্রতীকচিত্র। শিল্পীকে প্রস্তুত থাকতে হবে…চলার পথের জিনিসকে আগ্রহে তুলে নেবার জন্য, যাতে সে বিনিময়ে পৃথিবীকে দিতে পারে এমন শিল্প, যা জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি—প্রাণময় জীবনময় সৃষ্টি।"

না, কালভে সম্পূর্ণ ঠিক বলেন নি। শিল্পী অন্ধ নয়, চক্ষুষ্মান ভিখারী। ত্যাজ্য ধিকৃতকে যদি সে তুলে দেয়, জেনে বুঝেই নেবে, জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে।

কালভে নিজে তাই করেছিলেন।

সমাধিতে জয়স্তম্ভ…

সমালোচনায় আহত হয়ে শিল্পীরা আত্মহত্যা করেছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়। কালভের বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যেও কেউ-কেউ সে কাজ করেছেন। কালভে নিজে অমন দুর্বল মনের মানুষ নন। "হা ভাগ্য! যদি প্রতিটি বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতো তাহলে ইতিমধ্যে শত-শত মৃত্যু হয়ে গেছে—"

কিন্তু যদি জয়ী না হই, অপমানের উত্তর দিতে না পারি, তাহলে জীবনকে শেষ করে দেওয়াই বাঁচার একমাত্র উপায়।

সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কালভে গান শুরু করলেন মিলানে—যেখানে তাঁকে হিস্-হিস্ করে একদিন তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিলানে গাইতে যাবার আগে নেপলস্-সহ ইতালির নানা জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে গান গেয়েছেন। মাদাম লাবর্দ-এর শিক্ষায় এবং জীবনের শিক্ষায় সমৃদ্ধ কালভের প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত টেনর ভিক্তর মোরেলের সঙ্গে হ্যামলেটে অংশ নিয়েছেন ওফেলিয়া-রূপে। পেশ্যার দ্য পের্ল-তে প্রতিভাবান

টেনর লুসিয়ার সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন সোপ্রানো-রূপে। প্রশংসার তরঙ্গ উঠেছে, কিন্তু কালভে অতৃপ্ত অশান্ত থেকেছেন অন্তরে। জয়, জয় চাই সেখানে—যেখানে পতাকা লুটিয়ে চলে আসতে হয়েছে একদিন। সমাধির উপরে তুলতে হবে জয়স্তম্ভ, একমাত্র তাতেই তৃপ্ত হবে আত্মা।

মিলানের দর্শকদের কথা ভাবলে আতঙ্ক হয়। এমন অশিষ্ট অভদ্র রূঢ় দর্শক যে-কোনো শিল্পীর রক্তপান করতে পারে।

দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে কালভে মিলানের মঞ্চে উঠলেন ওফেলিয়া গাইতে। ওঠার আগে ভেবে নিয়েছেন—আজ জীবনের চরম পরীক্ষা—হয় বা নয়।

প্রথম অঙ্কের গান শেষ হলো। দর্শকের করতালি নেই। শীতল বিরূপ প্রেক্ষাগার।

কালভে হাঁপাতে লাগলেন। এখন মরীয়া তিনি। পাদপ্রদীপের আলো কে যেন শুষে নিয়েছে। কালি-লেপা মঞ্চ। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। ঠক্‌ঠক্ করে দাঁতে দাঁত বাজতে লাগল। "যদি সফল না হতে পারি," ওফেলিয়ার উন্মাদ-দৃশ্যে অবতরণের আগে কালভে তাঁর মাকে বললেন, "তাহলে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেব।"

উন্মাদিনী ওফেলিয়ার অভিনেত্রী এখন স্বয়ং অর্ধোন্মাদ। বেপরোয়া হয়ে মঞ্চে ছুটে ঢুকলেন, কোনো মেক-আপ নেন নি, সাজের দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে মনই ছিল না। রক্তশূন্য মুখ, কণ্ঠে বিকৃত আর রোষে অস্থির—

দেখেই দর্শক নড়েচড়ে বসে। এ কে? কী অদ্ভুত, কী সত্য, কী দারুণ বাস্তব এই আবির্ভাব। ভারা ভাবল, এই বিপর্যস্ত বেশ, উদ্‌ভ্রান্ত রূপ—এ নিশ্চয় যত্নে রচিত। আহা-হা-হা। সমর্থন ও অনুরাগের তরঙ্গ বয়ে গেল। আর কালভে গলা ছেড়ে দিলেন, উন্মত্ত ট্রাজিক সুর আছড়াতে লাগল। প্রথম ছত্র গীত হওয়া মাত্র উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। এই শুরু। আঘাত করো, আরও আঘাত করো। পূর্ণ বিজয় চাই। কালভে পাগল বাসনায় এমন একটি ক্যাডেনজা ধরে নিলেন, যার উপরে চড়ে থাকা নিতান্ত কঠিন। খাদে 'এ' থেকে 'এফ'-এ উঠে সমুচ্চ 'সি' পর্যন্ত ধেয়ে যাওয়া। সেই শিখরে উঠবার পরে সমস্ত চেতনা দুলতে থাকে। সে এমন এক জগৎ যেখানে অশরীরী আচ্ছন্নতার প্রবাহ। সেখানে ওঠা যায়, নামা যায় না।

অবস্থা দেখে সংগীত-পরিচালক আতঙ্কিত—পরিণতি কি হবে? কালভে যতক্ষণ পারলেন সেই সুরকে ধরে রাখলেন, কিন্তু আর পারছেন না, বুক বিস্ফারিত করে শ্বাস টেনেও ওখানে থাকা যাচ্ছে না, এখনি সর্বনাশ হবে, আবার দর্শকের উপেক্ষার নিশ্বাস-ঝড়ে তচ্‌নচ্ হয়ে যাবে ক্ষণস্বর্গের মোহ-জীবন। না—তা হতে দেব না—হে ঈশ্বর, রক্ষা করো! অসীম শক্তিতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করে কালভে নামতে থাকেন ক্রোমাটিক স্কেলে—আর আহা, নামলেন যে-রকম লীলায়িত গতিতে, স্বর্গ-গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের মতো করুণাতরঙ্গে, তাতে আলোড়িত হয়ে উঠল সমস্ত দর্শকের বুক—যারা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অসম্ভব কাণ্ড দেখছিল। তার পরেই দর্শকের করতলে বাজতে লাগল দুন্দুভি—জয় জয় জয় রে—।

কালভে বাতাসে ভাসমান। "এহেন মুহূর্তে আমি যেন অপার্থিব কেউ, অলৌকিক। এখন আমি একক নই—অগণিত। বিকীর্ণ আলোক আমি, না, স্বয়ং আলোক। ব্যক্তিচেতনা লুপ্ত, বিশাল ইচ্ছাপ্রবাহে ভাসমান। তার বন্যতরঙ্গ আছড়ে-আছড়ে বলছে—দাও! দাও! দাও!"

সুরের দান—জীবন···

একের পর এক ইউরোপের শিল্পতীর্থগুলিতে কালভের জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। এলেন ভেনিসে—স্বপ্ননগরী, রাজহংসের মতো ভাসছে জলের উপরে। সেখানে আঠারো শতকের এক মনোহারী প্রেক্ষাগার থিয়েটার দ্য ফেনিস-এ ওফেলিয়ার ভূমিকায় কুড়িবার অবতীর্ণ হলেন। লুঠ করে নিলেন দর্শকদের। রূপাকাঙ্ক্ষী-দের এই কল্পলোক, কামনার মোক্ষধাম, রসানন্দময়ী ভেনিস তাঁকে ফুলমাল্যে বরণ করেছে। সেখানে একদিন যাদুকরী গায়িকা পাত্তি-র দোলায় চড়িয়ে রাজরাণীর মতো বহন করেছে তাঁকে। কালভে উঠেছেন উচ্চে—অনেক উচ্চে।

তারপর?

নামিল আঘাত।

মঞ্চের জীবনই একমাত্র জীবন নয়। মঞ্চ বা সাজঘর—তারা তো শয়নঘর নয়। অগণিত দর্শকের তৃষিত চোখের সামনে মঞ্চে যে ঢেলে দেয় নিজেকে, সে ঘরে ফিরে একান্তে নিজেকে দিতে চায় একজনকেই। প্রেম—সেটা অভিনয়, মঞ্চে। প্রেম—সেটা রক্তসত্য, গৃহে।

ওফেলিয়া প্রতীক্ষা করে আছেন হ্যামলেটের একটি চিঠির জন্য কতদিন। সেই চিঠি আনবে স্বর্গ—যা আমার শোণিত-মজ্জায় নির্মিত।

সে চিঠি এলো। বজ্রের মতো চূর্ণ করে দিল কালভেকে—প্রচণ্ড 'না' শব্দে। বর্বর, নিষ্ঠুর ক্রূর—সে পত্র। তাতে করাল অক্ষরে লেখা আছে—আশার মৃত্যু, সুখের সমাধি।

আলো মুছে গেল।

> "কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী তেজে
> উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
> এ মোর সুন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে
> শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
> নীরব রবাব বীণা—"

কালভের সমস্ত সত্তা আর্তনাদ করে বলে: "তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে।"

"মৃত্যু—তাই চাই। ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে দেখি—নীচে কালো জল, ছলছল্ ছলছল্। এখন চাই শুধু একটু মনের জোর, সামান্য চেষ্টা—তাই

এনে দেবে বাঞ্ছিত শান্তি। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন আমি, যাতনায় নিষ্পেষিত, তাকিয়ে আছি নিম্নে, যেখানে গুহাগর্ভের জমাট অন্ধকার। ঝাঁপ দাও। কিন্তু তখনো বধির হয় নি আমার গানের কান। নৈরাশ্যের আচ্ছাদন ভেদ করে ভেসে এলো সুর—মাঝি গান গাইছে দাঁড় বাইতে-বাইতে।

"আঃ গান! গান! হাঁ—মৃত্যুর আগে অন্তত একবার। একবার অন্তত রাত্রির কাছে নিবেদন করব আমার বুকের যন্ত্রণাকে গানের সুরে—অনন্ত নীরবতা আমাকে চিরতরে ঢেকে ফেলার আগে।

"উন্মত্তের মতো ঢিলে পোশাক গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দরজার বাইরে পাথরের সিঁড়ির একপাশে একটি নৌকা বাঁধা—তার উপরে কখন উঠে পড়েছি জানি না। সেটি নিয়ে ভেসে গেছি স্থির জলের উপর দিয়ে—তলায় কালো জল, উপরে আরও কালো আকাশ। তখন আমি গাইতে শুরু করলাম পাগলের মতো—যত গান জানতাম—আনন্দের বিষাদের পূর্ণতার শূন্যতার—গান শুধু গান। আমার কণ্ঠ থেকে বন্যার মতো আছড়ে পড়তে লাগল আমার অগ্নি-গলিত হৃদয়। আমি গাইলাম—আর কোনো দিন গাইব না, সেই আবেগে গাইলাম—নিঃশেষে ঢেলে দিলাম আমার শক্তি, আমার শোক, আমার প্রাণ, আমার জীবন। নিশ্চুপ ছায়ারা চারিদিকে, নিরুত্তর। তাদের কাছে উজাড় করে দিলাম সৌন্দর্য ও শিল্পের যতকিছু সঞ্চয় সবই।

"অবশেষে যখন আমার কণ্ঠ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে শক্তি হারিয়ে, শুষ্ক ওষ্ঠ শব্দমাত্র উচ্চারণ করতে পারছে না—তখনই বুঝলাম কি বিচিত্র পরিস্থিতি। জ্বর ও প্রলাপের আচ্ছন্ন জগৎ থেকে মানুষ যেমন বড়ো যন্ত্রণায় চোখ মেলে দেখে বাস্তব পৃথিবীকে, তেমনিভাবে আমি চোখ মেললাম, আর দেখলাম—কি করেছি!

"আমার চারপাশে নৌকার পর নৌকা, রাশিরাশি নৌকা, ঠেলাঠেলি ঠোকা-ঠোকি—ভৌতিক জাহাজের মতো তারা সবদিক থেকে এসে জুটেছে—বিস্ময়-গুঞ্জন-ভরা মানুষে ভর্তি। আমার নৌকার একেবারে গায়ে একটি নৌকা, তাতে এক তরুণ দম্পতি, ঘন আলিঙ্গনে বাঁধা, পরমাশ্চর্যে বিস্ফ চোখে তারা তাকিয়ে আছে। আমি জানি না, আমার কণ্ঠস্বর কতক্ষণ ধরে মধ্যরাত্রির এই ছায়াশরীরী শোভাযাত্রাকে আমার কাছে টেনে এনেছে।"

মরণসাগরে ঝাঁপ দেওয়া হলো না। অজস্র বিস্মিত অক্ষিতারকার অভিনন্দন থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য কালভে একটি যাত্রীহীন নৌকার ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন, তারপর ভিড় সরে গেলে অনেকক্ষণ পরে নির্জন এক জায়গায় নেমে হোটেলের পথ ধরলেন। তখনো তাঁর মনে হলো, তিনি নিঃসঙ্গ নন, কাদের যেন ছায়া তাঁকে অনুসরণ করছে।

পরদিন সকালে ভৃত্যের মারফত একগুচ্ছ ফুল এবং একটি চিঠি পেলেন:

"পল ও জেনীর কাছ থেকে: যারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসে। তাদের আপনি এক অবিস্মরণীয় রাত্রি উপহার দিয়েছেন। ঈশ্বরাগ্নির বাহিকা

আপনি—আপনার উপরে বর্ষিত হোক ঈশ্বরের অনন্ত আশীর্বাদ।"

"শেষের কথাগুলি আমার গভীরতম তন্ত্রীকে স্পর্শ করল, [কালভে বলেছেন] আমার আত্মাকে জাগিয়ে তুলল, অবশেষে আমি প্রার্থনা করতে পারলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম—বেঁচে আছি বলে।"

"আমার গান বাঁচাল আমাকে।"

বক্ষ-মাঝে নাচে রক্তধারা…

নিঃশব্দ বিশাল হা-হা হাসিতে ছেয়ে গেল কালভের মনের আকাশ। ভাগ্যের পরিহাস—না-কি ভাগ্যের আশীর্বাদ! একজনের ব্যর্থপ্রেমের মৃত্যুসঙ্গীত অন্য দুইজনের সার্থক প্রেমকে দান করল অবিস্মরণীয় প্রহর!…এবং সেই গানই আত্মহনন থেকে রক্ষা করল ব্যর্থ প্রেমিকাকে!!

সুতরাং হে জীবন!

জীবনে প্রত্যাবর্তন করলেন কালভে।

মুক্তি চাই দুঃখ থেকে, মুক্তি চাই সুখ থেকে—মুক্তিই মদ্য—। বাসনা যদি আসে, কণ্ঠালিঙ্গন করো তার। আর সে যদি জড়িয়ে বাঁধতে চায় তোমাকে—ছুঁড়ে ফেলে দাও তার লোলুপ হাত। আমার বাসনা বাধাবন্ধহীন—দায়িত্বহীন—দুঃসাহসী—

কালভে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন জিপসি নায়িকা কার্মেন-রূপে। মুহূর্তে পাগল হয়ে গেল দর্শক—তাদের জয়ধ্বনির ভিতর থেকে জেগে উঠল অপরূপ এক কালপ্রতিমা—যার নাম খ্যাতি।

সর্বোত্তম ফরাসি সুরকারদের অন্যতম জর্জ বিজে (১৮৩৮-৭৫)—মোৎসার্ট ও রয়সিনির ধারাপথে এসেও যিনি ওঁদের লাবণ্যময় ভঙ্গির সঙ্গে অনবদ্যভাবে মিশিয়েছিলেন বাস্তবতাকে—তাঁর শেষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কার্মেন—প্রসপার মেরিমে-র কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। যেসব আবেগ মানুষকে মূলভ্রষ্ট করে দেয়, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজে-র রচনায় আসত, বিশেষত জ্বালাময় ঈর্ষা, কার্মেনে যার প্রভূত সঞ্চার।

নিখুঁত অপেরার নাম করতে গিয়ে জর্জ মার্টিন তাঁর 'অপেরা কম্পানিয়ন' গ্রন্থে তিন শ্রেষ্ঠের উল্লেখ করেছেন—কার্মেন, আইজ, ডন্ জ্যোভানি। কার্মেন-প্রসঙ্গে বলেছেন—"এই অপেরাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। অনেকেই ১৮৭৫ সালে একে ভাগ্‌নারের উপযুক্ত উত্তররূপে অভিনন্দিত করেন, এবং এর পক্ষে প্রচণ্ড সমর্থন জানিয়েছিলেন, নীট্‌শে।" আর্নেস্ট নিউম্যানের একটি মন্তব্য মার্টিন উদ্ধার করেছেন: "কার্মেন, মোৎসার্টের পরে সর্বাধিক মোৎসার্টীয় অপেরা। এতে মোহিনী সুরতরঙ্গের পাশাপাশি একটানা চলেছে নাটকীয় বস্তুনিষ্ঠা এবং মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রায়ন।" ডেভিড ইউয়েন 'এনসাই-

ক্লোপিডিয়া অব মিউজিক্যাল মাস্টারপিসেস্'-এর মধ্যে জানিয়েছেন, নীট্শে কুড়িবার এই অপেরা দেখেন। নীট্শের মতে, "একে অপেরার মাস্টারপিসদের অন্যতম বলা যায়।" ইউয়েনের মতে, "বিজে-র বিরাট খ্যাতি প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে এই অপেরার উপর। তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ এখানে হয়েছে। এতে বিজে দিয়েছিলেন অপূর্ব সুরসংগতির ঐশ্বর্য, অসাধারণ যন্ত্রসঙ্গীতবোধ, পরিবেশবর্ণ রূপায়ণের অসামান্য ক্ষমতা এবং সুন্দর নাটকীয় প্রতিভার অনপনেয় স্বাক্ষর। এই অপেরাটির দ্বারাই বিজে মহান সুরস্রষ্টার সম্মান পেয়েছেন।"

স্পেনের জিপসিদের কাহিনী এই অপেরায় বর্ণিত বলে বিজে এর মধ্যে যথেষ্ট স্পেনীয় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সুর ও ছন্দ দিয়েছেন। তাহলেও এটি খাঁটি ফরাসি অপেরা। প্রসপার মেরিমে-র মূল গল্পে কার্মেনের যে-চরিত্র, তাকে অনেক শোধিত করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। মূল গল্পে কার্মেন সামান্য তস্করনারী—এই অপেরায় গ্ল্যামারাস নায়িকা।

বিজে-র এই সর্বোত্তম সৃষ্টি কিন্তু তাঁকে আঘাত ছাড়া আর কিছু দেয়নি। ১৮৭৫, ৩ মার্চ, প্যারিসের অপেরা কমিক-এ এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়—কার্মেনের ভূমিকায় নামেন গাল্লি মারিয়ে। প্যারিসের দর্শক কিন্তু একে একেবারে পছন্দ করে নি। স্টেজে মেয়েরা প্রকাশ্যে ধূমপান করছে—দেখে তো অভিজাত মহিলারা প্রায় মূর্ছিত। কার্মেনের অতি বাস্তবতা দর্শকদের রসরুচিকে আহত করেছিল প্রচণ্ডভাবে। কঠোর সমালোচনা করা হয় সংবাদপত্রে। অনেকে বলেন, সেই আঘাত বিজে-র মৃত্যুর কারণ। এখানে এই বিচিত্র অথচ শিল্পীদের ক্ষেত্রে পরিচিত ব্যাপারটির দৃষ্টান্ত পাই—যে-বস্তু পরে ধন্যধ্বনি জাগাবে, তার ব্যর্থতার দুঃখকে বহন করে স্রষ্টাকে বিদায় নিতে হয়েছে। প্যারিসে দর্শকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কার্মেন কুড়ি বছরের মধ্যে হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় অপেরা।

কার্মেন যেমন শ্রেষ্ঠ ফরাসি সুরকার বিজে-র শ্রেষ্ঠ রচনা, তেমনি ঐকালের শ্রেষ্ঠ ফরাসি সোপ্রানো কালভের সর্বোত্তম ভূমিকাও তাই। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিজে ও কালভে পরস্পরের পরিপূরক। বিজে সেই সুর সৃষ্টি করেছিলেন যা কালভের দক্ষিণ ফ্রান্সের তপ্ত রক্তকে মাতাল করেছিল। সেই রক্তকোলাহলের জয়ধ্বনি তুলে কালভে, লোকান্তরিত ব্যথাহত সুরস্রষ্টাকে নমস্কার জানিয়েছিলেন।

কালভের কণ্ঠ বহুদিন নীরব হয়ে যাওয়ার পরেও সঙ্গীতের ইতিহাসে, সাধারণ এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতিতেও, গায়িকারূপে কালভের অন্যান্য সাফল্যের উল্লেখ করেও, কার্মেন ভূমিকার সঙ্গেই তাঁর নামকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র মতে, "দীর্ঘদিন ধরে কালভের সঙ্গীতাভিনয়কেই কার্মেনের মডেল বিবেচনা করা হয়েছে।" ডেভিড এডিশন 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দি অপেরা'-তে বলেছেন, "কালভে, কার্মেন ভূমিকার

সর্বাধিক খ্যাতনাম্নীদের অগ্রণী।...তাঁর কালের একেবারে শীর্ষস্থানীয়া নায়িকা তিনি।" অসকার টমসন-সম্পাদিত 'দি ইনটারন্যাশন্যাল সাইক্লোপিডিয়া অব মিউজিক অ্যাণ্ড মিউজিসিয়ানস্'-এর মধ্যে বলা আছে, "কার্মেনের গানে কালভে ইন্দ্রিয়মাদকতার মোহিনী আকর্ষণ সৃষ্টি করতেন, যা তাঁকে ধারাবাহিক দীর্ঘ সাফল্য এনে দিয়েছিল এবং জনসাধারণ তাঁকে এই ভূমিকার কালনির্ধারিত শিল্পী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।" "কালভের কার্মেনে নারী-নাগিনীর আকর্ষণ—এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়া। তা কখনো অতি বিষণ্ণ, খেয়ালী, অতি নাটকীয় কিন্তু অদ্ভুতভাবে আদিম প্রাণপ্রেরণায় উজ্জীবিত।...পরবর্তীকালে কার্মেন ও কালভে একাঙ্গ হয়ে গেছেন।" গ্রোভস্, 'ডিকসনারি অব মিউজিক অ্যাণ্ড মিউজিসিয়ানস্'-এ বলেছেন, "এ-পর্যন্ত যত গায়িকা কার্মেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কালভেই সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত।"

কালভে স্বয়ং বলেছেন :

"সারা পৃথিবীতে এই ভূমিকায় গান গেয়েছি। আমার যদি কিছু খ্যাতি থাকে, তা এই ভূমিকার জন্যই।" "আমার দীর্ঘ অপেরা-জীবনের এটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সৃষ্টি—নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয়।"

কয়েক বছর ইতালিতে কাটাবার পর ১৮৯২ সালে কালভে আবার যখন প্যারিসে এসে অপেরা কমিক-এ যোগ দিলেন, তখন তাঁর প্রথম ভূমিকা—কাভাল্লেরিয়া রুসটিকানা-র সানটুৎসা। এই ভূমিকায় তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের মূলে তাঁর স্বাধীনচিত্ততা। এখন তিনি বেপরোয়া। জীবনের কঠিন আঘাত তাঁকে জীবনের সাজানো পোশাককে ছিঁড়ে ফেলার শিক্ষা দিয়েছে। নতুনভাবে সাজাবেন নিজেকে—যাতে রক্তের বর্ণ আর পোশাকের বর্ণ এক হয়ে যায়।

একই দুঃসাহসিক আবেগে তিনি উপস্থিত করলেন কার্মেনের নবরূপ। এখানে চমকালো সকলে। কিন্তু কালভে অনমনীয়। তাঁর সিদ্ধান্ত—পোশাকে তিনি খাঁটি জিপসি হবেন—তাদের মতোই ঝালর-দেওয়া পশমী পরিচ্ছদ—আগেকার রীতিতে খাটো স্কার্ট নয়। নাচের ক্ষেত্রেও জিপসি-উদ্দামতা—হাত-পা ছুঁড়ে-ছড়িয়ে মাতন—কার্মেনের আদি অভিনেত্রী গাল্লি মারিয়ে-র লাবণ্য-হিল্লোল নয়।

নতুন কার্মেন এসেছে—নতুন সাজে-ছন্দে—গানে-অভিনয়ে—। প্যারিসের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। কৌতূহলী হয়ে (না-কি ঈর্ষাতুর হয়ে ?) অভিনয় দেখতে এলেন গাল্লি মারিয়ে—যাঁর নামের সঙ্গে এতদিন কার্মেন শব্দটি জুড়ে ছিল—কার্মেনের যিনি আদি অভিনেত্রী। অবসর নেবার পরে এই প্রথম তিনি এই থিয়েটারে অভিনয় দেখতে এসেছেন।

গাল্লি মারিয়ে দেখলেন—তাঁর কার্মেনকে কালভে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

অভিনয়ের শেষে কালভের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন : "ব্রাভো কালভে! অত্যন্ত মৌলিক, অত্যন্ত মনোহারী তুমি। ব্রাভো।'

কালভে বললেন, "এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"

বহু বৎসর পরে, কার্মেন-এর সহস্র রজনী অভিনয়ের উৎসবে কালভে যখন অপেরা কমিক-এ গান করতে যাচ্ছেন, গাল্লি মারিয়ে-র কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলেন : "আজ রাত্রে আমার হৃদয়-মন তোমারই সঙ্গে।"

ফ্রান্সে কালভে-কার্মেন যখন ঝড় তুলেছে, তখন ওধারে আমেরিকার সর্বপ্রধান এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান অপেরা-প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরা হাউস দাউ-দাউ করে জ্বলছে—১৮৯২, ২৭ অগস্ট। নিউইয়র্কের কয়েকজন ধনী বণিক সেখানকার 'অ্যাকাডমি অব মিউজিক'-এ বক্স-আসন জোগাড় করতে না পারার ক্ষোভে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন ১৮৮৩ সালে। দশ বছর সচল থাকার পরে একদিন আগুন লেগে তা ধ্বংস হয়ে গেল। এক বছর হাউস বন্ধ রইল। যখন খুলল তখন দেখা গেল অঙ্গার সরিয়ে নতুন সাজে বেরিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটি। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন—ইলেকট্রিক আলো। মেট্রোপলিটান অপেরার ইতিহাসগ্রন্থে পাই : "ঝলমলে বৈদ্যুতিক আলোক—গ্যালারির নীচে বক্সে ধনী ও অভিজাতগণের আসন—তাঁদের অঙ্গশোভিত মণিমাণিক্য তীব্র আলোকে অগণ্য বর্ণে বিকীর্ণ।...আসন ভর্তি করে বসে আছে ঊনিশ শতকের নব্বুইয়ের দশকের স্ফূর্তি-ওড়ানো ফ্যাশান-দুরস্তেরা—লাল, সোনালি ও ক্রীমরঙের নতুন পোশাকে মোড়া শরীর—মঞ্চস্থ ব্যাপারের চেয়ে কম সাজানো নয় তারা।"

নিউইয়র্কের ধনী ব্যবসায়ীরা এইটুকু জানতেন, অর্থ-সামর্থ্যের দ্বারা কেবল সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি করেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, প্রতিভা কিনে পুঁততে হবে সেখানে। ইউরোপের উদীয়মান সঙ্গীত-প্রতিভা এমা কালভের কাছে আমন্ত্রণ গেছে তাই।

কালভে এলেন...

নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরার স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়ে গেল—২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩।

জিপসি-বেশে কালভে দাঁড়িয়েছেন মঞ্চে। "কী ঐশ্বর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, বুননে বর্ণে অসামান্য। কিবা বৈদ্যুতিক অভিব্যক্তি চরিত্রায়নের কালে।" "কার্মেনের কালভের কণ্ঠে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এবং তীব্র ইন্দ্রিয়শিহরণ।" "অকল্পনীয় মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর। কী তার মসৃণতা! আবেগে আন্দোলিত, বাসনার চাবুকে গতিশীল, একই সঙ্গে অদ্ভুতভাবে পরিশীলিত, নিয়ন্ত্রিত।"

"কার্মেন আমেরিকায় প্রথম আবির্ভাবে অবর্ণনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল" —পরবর্তী ইতিহাসে বলা হয়েছে।

অভিনয়শেষে দর্শকদের অভিবাদন করে বিদায় নিতে গেলেন কালভে। না, পারলেন না—ফিরতে হলো—আবার—আবার। দর্শকদের উন্মত্ত করতালি তাঁর উপর আছড়ে-আছড়ে পড়ে তাঁকে টেনে আনতে চাইল নিজেদের মধ্যে।

বহু বৎসর ধরে একই জিনিস চলল। "সংক্রামক রোগের মতো কার্মেন,

যেখানেই গিয়েছে কেবল ছড়িয়েছে।" দর্শকেরা কার্মেন-রূপে কেবল কালভেকেই দেখতে চায়। তাদের কাছে কার্মেন ও কালভে অভিন্ন।

স্বয়ং কালভের কাছে নয়? কে বলে? কার্মেনের সাজ পরলেই তিনি বদলে যান। কি যেন ভর করে। তখন কালভের মাও তাঁকে চিনতে পারেন না। সবিস্ময়ে বলেন, "কে তুই? তুই আমাদের অপরিচিত। তুই—তুই নোস্।"

"কার্মেন! জিপসি। অরণ্যের আদিম কন্যা। নিজের ক্ষুধা ছাড়া অন্য নিয়মের অস্তিত্ব মানে না।...সে নীতিহীন নয়—নীতি-বোধ-হীন। মেরুদণ্ডমূলে আছে তার জীবনভাণ্ড। মোহনীয় বন্য প্রাণী, একমাত্র আরণ্য আইনের অধীন।"

প্রতিভার নমস্কার প্রতিভাকে...

"পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ সূর্য তারা সোম—"

কালভের সেই অবস্থা এলো। বহু তারকায় আলোকিত অপেরা-জগতে কালভে এখন চন্দ্রমা।

অপেরার স্বর্ণযুগে কালভের সঙ্গে গেয়েছেন:

ভিক্তর মোরেল—বিরাট ট্রাজেডিয়ান; জ্যাঁ দ্য রেজ্‌কে—প্রেমিকার স্বপ্নের রোমিও; তাঁর ভাই এদুয়ার্দ দ্য রেজ্‌কে—কণ্ঠস্বরের গৌরবে ভ্রাতার পরিপূরক; মার্চেল্লা সেমব্রিচ—কোমল সুন্দর গানের অপূর্ব গায়িকা; মেল্‌বা—যাঁর অম্লান শুদ্ধ কণ্ঠস্বর স্কাইলার্কের মতো পাখা মেলে দেয় স্বর্গের দিকে; লিলি লেম্যান—গানের আঙ্গিক-জ্ঞানে ও প্রয়োগে সুকুশলী; এমা এমস্—যাঁর মধুকণ্ঠের একমাত্র প্রতিযোগী তাঁর আশ্চর্য রূপ; ক্রেমঁতিন দ্য ভ্যের—মোহন কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতিতে অসামান্য; সালিনাক—জ্বলন্ত প্রকৃতি, গানে ও অভিনয়ে অনুরূপ অগ্নিময়; প্লাঁস—বিশুদ্ধ ফরাসি-রীতির এক শ্রেষ্ঠ রূপকার। এমন আরও কতজন।

একথা মনে করা ভুল—কার্মেন ভূমিকাই কালভের একমাত্র প্রতিভার সৃষ্টি। না—কালভে আরও অনেক ভূমিকায় যশস্বিনী। এমনকি কার্মেনকে সবচেয়ে প্রিয় বলতেও তিনি অনিচ্ছুক। কার্মেনের নৈতিক চরিত্র কালভের পছন্দ নয়, যদিও তার সাহস ও সত্যবাদিতা ভালো লাগে।

কালভের প্রিয় ভূমিকাগুলির মধ্যে আরও রয়েছে—মার্গারিট, ওফেলিয়া, জুলিয়েট, এল্‌জা, সান্‌টুৎসা।

কিন্তু...কার্মেনের মাদকতা অসামান্য। তা এনে দেয় বোহেমিয়ান জীবনের স্বাদ।

কালভের কণ্ঠে যখন দৈবী সুরের লীলাভূমি রচিত হল, তখন কবি ও সুরকারেরা এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে—নিজেদের রচনার সার্থক রূপায়ণ দেখার

জন্য। খুব দুঃখের বিষয়, কার্মেনের স্রষ্টা বিজে কালভেকে কার্মেনরূপে দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু অপর একজন মহান ফরাসি সুরকার কালভের কণ্ঠে বাঙ্‌ময় দেখেছিলেন নিজের সৃষ্টি—তিনি ফ্রেদেরিক মাস্‌নে (১৮৪২-১৯১২)।

মাস্‌নে নিজকালে ফ্রান্সের প্রধান সুরকার। ভাবোদ্বেল ইন্দ্রিয়রাগময় সুর-সৃষ্টির জন্য ইনি বহুবন্দিত। উনিশ শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সের লিরিক থিয়েটারে ইনিই প্রধান প্রভাবশালী ব্যক্তি। ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড, প্রতিভার ঔদ্ধত্যও। ছুরির ফলার মতো জিভ অপরকে রক্তাক্ত করে দিত। কালভে তাঁর অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহের পাত্রী, তিনিও কিন্তু ক্ষমা পান নি ত্রুটির ক্ষেত্রে।

'সাফো' মঞ্চস্থ হবার আগে সাধারণ রিহার্সালের দিন। নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট পরে কালভে উপস্থিত হলেন। মাস্‌নে উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছিলেন। কালভে ঢোকামাত্র সকলের সামনে তীক্ষ্ণ তিক্ত গলায় বললেন, "মাদ্‌মোয়াজেল কালভে, আপনাকে জানাতে পারি, শিল্পী নামের যোগ্য কেউ তাঁর সহশিল্পীদের বসিয়ে রাখেন না।"

কালভের মাথায় রক্ত চড়ে গেল—সকলের সামনে এত বড় অপমান! তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে এলেন। থিয়েটার-বাড়ির বাইরে পা দিয়েছেন —থমকে দাঁড়ালেন। না, চলে যাওয়া উচিত নয়। অসহ্য অপমান—তবু—।

কালভে ফিরে এসে বললেন, "বন্ধুগণ! আচার্য ঠিকই বলেছেন। দোষ আমারই। আমাকে ক্ষমা করুন। যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, আমি রিহার্সালে অংশ নিতে পারি।"

তখনি আনন্দের ঝঙ্কারে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা, উৎসারিত হল সমবেত কণ্ঠ, আর মাস্‌নে এগিয়ে এসে কালভেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

ফ্রেদেরিক মাস্‌নে কালভের কথা মনে রেখে দুটি বিশেষ অপেরা রচনা করেন। তার প্রথমটি 'লা নাভারাইজ'। দ্বিতীয়টি 'সাফো'—আলফঁস দোদে-র বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। কালভের আশ্চর্য কণ্ঠস্বরের দিকে দৃষ্টি রেখে মাস্‌নে এই অপেরাটি প্রস্তুত করেন। উৎসর্গপত্রে মাস্‌নে লেখেন:

"এর পৃষ্ঠাগুলি লেখার সময়ে তুমিই ছিলে সর্বক্ষণ আমার মনের সামনে। আর তোমার মধ্য দিয়েই এ সৃষ্টি বাঁচবে। তাই দ্বিগুণিত আকারে সাফো তোমারই। অনন্ত কৃতজ্ঞতায় একে আমি উৎসর্গ করছি তোমাকেই।"

প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক আলফঁস্ দোদেও ছিলেন কালভের গুণমুগ্ধ। ফরাসি ন্যাচরালিস্টিক স্কুলের এক শ্রেষ্ঠ লেখক ইনি, তা হলেও অতিবাস্তবতায় নীরস হয় নি তাঁর রচনা, হতে পারে না, কারণ দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্রমদ্যে তিনি সঞ্জীবিত, তাই মানবিক বাস্তবতার মধ্যে ডুব দিয়েও কল্পনার পাখায় উড়তে পারতেন। তিনি দেখেছেন—যন্ত্রণাবিদ্ধ রচনায় তা দেখিয়েছেনও—হায়, বাসনাই মানুষের কালনিয়তি।

সাফো-র মধ্যে তাই আছে—আছে দোদের ব্যক্তিজীবনের ছায়া। প্যারিসের লোকপ্রেয়সী সাফো—হাস্যে-লাস্যে জয় করেছে কতজনকে, এবং তাদের কাছ-

থেকে লুণ্ঠন করেছে কত কি !—কবির কাছে সে শিখেছে সুচারু বাক্য, ভাস্করের কাছে দেহচ্ছন্দ, ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে পেয়েছে অর্থ, তার বিলাসের উপকরণ জোগাতে ক্যাশ ভেঙে জেলে গেছে কেরানী—সে ভালোবেসেছিল তার থেকে বয়সে অনেক ছোট এক তরুণ ছাত্রকে। সে ভালোবাসায় জ্বালা আছে, শান্তি নেই। সেই গরলামৃতের কাহিনী দোদে লিখেছিলেন—যিনি স্বয়ং তরুণ যৌবনে বোহেমিয়ান হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন সাহিত্যিকমহলে ও অন্যত্র, রূপ ও প্রতিভায় অলঙ্কৃত তাঁর জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল প্যারিসের এক সুন্দরী মডেলের সঙ্গে, সে সম্পর্ক দীর্ঘ ও ক্লিষ্ট, উচ্ছৃঙ্খলতার অভিজ্ঞতা ও অভিশাপ দেহে-মনে পাক দিয়েছিল—যদিও শেষপর্যন্ত জীবনের প্রান্তভাগে গার্হস্থ্য সুখ ও শান্তি কিছুটা পেয়েছিলেন।

দোদের জীবনের এই শেষ পর্বে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন কালভে। পড়ার ঘরে দোদেকে কালভে পেতেন, দেখতেন বহু যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁর সংবেদনশীল সুন্দর মুখ প্রশান্ত। একদিন সাফো-র কথা উঠল—কিভাবে মঞ্চে সাফোকে উপস্থিত করা উচিত সেই প্রসঙ্গ।

দোদে বললেন: "বদ্‌লেয়ারের এই কথা মনে রেখো: এমন কোনো গতি আনা উচিত নয়, যা রেখার ছন্দকে ভেঙে দিতে পারে। কালভে, তোমাকে অনুরোধ করি—সাফো অভিনয়ের সময়ে বেশি ভঙ্গি করো না, ক্লাসিক সংযম চাই। নাটকে ওকে সাফো বলা হয়েছে, কারণ সে গ্রীক নারী-কবি সাফোর মূর্তির মডেল হয়েছিল।"

কালভে একদিন খোলা গলায় দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্বত্য রাখালিয়া গান দোদেকে শোনান। দোদে বলেন:

"তোমার গানে তুমি জাগিয়ে তোলো তোমার সমগ্র জাতিকে। তোমার ঐ পর্বতমালা, উদার উপত্যকা, উচ্চ মালভূমি—সবাই প্রাণ ফিরে পায় তোমার কণ্ঠস্বরে—বিশুদ্ধ আলোকিত কণ্ঠ—স্বর্ণোজ্জ্বল মধুবিন্দুর মতো।"

জ্বলন্ত ঝড়ে ধাবিত তলোয়ার…

আরও উজ্জ্বল, আরও উদ্দীপ্ত ভাষায় কালভেকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন—ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল (১৮৩০—১৯১৫)। যাঁকে বলা হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের হোমার।

বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যে মিস্ত্রালের কাব্যের স্থান আছে। ১৯০৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান—সেটা তাঁর সম্বন্ধে বিরাট কোনো সংবাদ নয়—তিনি আরও বৃহৎ পুরুষ। বহুসংখ্যক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ তিনি—তাদের আত্মার সংগ্রামের সেনাপতি।

স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ বলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাজকর্ম করার দরকার ছিল না মিস্ত্রালের—তিনি স্থির করেছিলেন, দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভসাঁল-এর ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনরীতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেন গৌরবের আসনে।

উত্তর ফ্রান্সের সংস্কৃতি-অভিমানীদের কাছে দক্ষিণের ভাষা ঘৃণার বস্তু। মিস্ত্রাল দক্ষিণের পক্ষে মর্যাদার লড়াই শুরু করেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের 'খাঁটি মেয়ে' কালভের কাছে মিস্ত্রাল নেতা গুরু আদর্শ পুরুষ। মিস্ত্রালই তাঁকে সেই ধ্রুববাক্যটি দেন, যাকে কালভে গায়িকা-জীবনে গায়ত্রীমন্ত্র করেছিলেন। মিস্ত্রাল বলেছিলেন :

"কালভে ! অতীতের চারণকবিদের এই প্রাণবাণী তোমার উপযোগী : 'গায়ক গানের সুরে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে বেদনাকেও'।"

মিস্ত্রালের অসাধারণ এপিক কাব্য মিরেইল। তার মধ্যে প্রভসাঁলের উদ্দীপ্ত রোমান্টিক আত্মা উন্মোচিত। গুনো একে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন ও অপেরা রূপে তা গীত হয়। এতে আছে, খোলা আকাশের প্রেমগীতি—'ও ! মাগালি !' কালভে সারা পৃথিবীতে গানটি গেয়ে বেড়িয়েছেন। অসীম জনপ্রিয়তা গানটির। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রতিটি রাখাল সে গান জানে। এই গানের সূত্রেই কালভে মিস্ত্রালের এই উৎসর্গবাক্য লাভ করেন : "মিরেইলের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ গায়িকার উদ্দেশে।"

এই গানটির সূত্রে স্মরণীয় একটি ঘটনা এই :

মহানায়ক মিস্ত্রালের মূর্তি স্থাপিত হবে তাঁর জীবনকালেই—আর্ল-এর বিরাট পার্কে। সুবৃদ্ধ মহাকবিকে সম্মানিত করার এই আয়োজনে নানা দেশ থেকে অভিনন্দন ও উপহার এসেছে। প্রত্যেক দেশ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, দূত পাঠিয়েছেন মহারাজা ও মহারাণীরা—ফ্রান্সের আত্মাকে নমস্কার জানাতে।

কিন্তু উত্তর ফ্রান্সবাসী ফরাসী সরকার কোনো প্রতিনিধি পাঠান নি।

আর, দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রধানা গায়িকা নিমন্ত্রিত হয়েও উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কারণ—মাদাম কালভে ভয়ানক ক্লান্ত। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন দীর্ঘ কষ্টকর সফরের পর। তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

সেই রাত্রে কালভে স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর পিতা এসে দাঁড়িয়েছেন, যিনি একদিন সুগভীর বাক্যে বন্দনা করেছিলেন পুত্রীর প্রতিভাকে : "তোমার গান তোমার পূর্বপুরুষদের নীরবতার সৃষ্টি।" পিতার গর্ব—দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রাণচেতনা অবারিত হয়েছে কন্যার কণ্ঠে। সেই পিতার চোখে এখন তিরস্কার। বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলছেন, "আমাদের বাণীর ঈশ্বর, আমাদের মহাকবির, সম্মান-উৎসবে তুমি গেলে না ?"

কালভে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন। ঘড়িতে দেখেন, ভোর চারটে। লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। গায়ে চড়িয়ে নিলেন গ্রামীণ পোশাক। দুজন আমেরিকান মহিলা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁদের টেনে তুলে গায়ে চাপিয়ে দিলেন প্রভসাঁল-এর গ্রাম্য নারীর পরিচ্ছদ। পুরো ফরাসি কৃষক-রমণী ওঁরা হতে পারলেন না। না হোক। যা হয়েছে সেই অবস্থায় ওঁরা চড়ে বসলেন গাড়িতে।

কালভের অসহ্য উৎকণ্ঠা প্রচন্ড। এক শক্তি তাঁকে টান দিচ্ছে, অথচ মধ্যে রয়েছে অনেকখানি ভূখণ্ড, গাড়ি যথেষ্ট জোরে যেন যাচ্ছে না, ফলে অস্থিরতার সীমা

নেই। কালভে এখন একক নন, বিরাট জনমণ্ডলীর অংশ—তাঁর পূর্বপুরুষের, তাঁর জাতির, রক্তের দোলা তাঁর মধ্যে, অগণিতের হৃৎস্পন্দন বাজছে তাঁর বুকে —মোটর-গাড়ির পাখা নেই কেন—কখন পোঁছবেন তিনি ?

আর্ল-এ পোঁছলেন দিবা দ্বিপ্রহরে। সভা শেষ। বিশিষ্ট অতিথিরা উঠে পড়েছেন, চলে যাবেন। স্কোয়ার কানায়-কানায় ভর্তি, কেউ এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেবে না।

তখন কালভে, সেই বিশাল জনসমুদ্রের তটে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন—'ও ! মাগালি !'—আর মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো কাণ্ড ঘটল, জনতা দুভাগ হয়ে গেল, দেখা গেল মঞ্চ পর্যন্ত প্রসারিত পথ—সেই পথ ধরে বিজয়গৌরবে গান গেয়ে এগিয়ে গেলেন কালভে। মঞ্চে উঠে, পরম-প্রিয় মহাকবির পাশে দাঁড়িয়ে, নিম্নের ঊর্ধ্বমুখ নরসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে, বর্ষার বৃষ্টির মতো অবিরাম ঝরতে লাগলেন সঙ্গীত-ধারায়। আনন্দ ! আনন্দ ! যত আনন্দের গান কালভে জানেন, সব বর্ষণ করে চললেন, আর সেই বারিতে সিক্ত জনমণ্ডলী মাতোয়ারা তরঙ্গ তুলে-তুলে অভিনন্দন জানালো। কালভে যেন চাইলেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভরিয়ে দেবেন গানে—গানে—।

গান শেষ। মিস্ত্রাল উঠে দাঁড়ালেন। আশীর্বাদের হাত তুললেন। কণ্ঠ বাজল বরদানের সুরে :

"পর্বত থেকে পাগল নদীর মতো তুমি নেমে এসেছ—তোমার জাতি-রক্তের প্রচণ্ড শক্তিকে বহন করে। তোমার জনগণের তেজ ও আনন্দের উন্মোচক আজ তুমি। জনতা তোমাকে পথ করে দিয়েছে—যখন তুমি আগুনের মতো ধেয়ে এসেছিলে। তোমার কণ্ঠস্বর লকলকে অগ্নিশিখা, জ্বলন্ত তলোয়ার।"

পুনশ্চ একটি নাটক…

'এ জীবন নাট্যশালা।' কী অসহ্য পুরাতন কথাটা অথচ কী নিষ্ঠুর চিরন্তন।

আমরা সবাই নিজের-নিজের ভূমিকায় অংশ নিয়ে যাচ্ছি জীবনমঞ্চে, কিন্তু সে অভিনয় ধরা পড়ছে না নিজের কাছে, কারণ আমাদের চোখ তৈরি নয়। শিল্পীর আছে প্রস্তুত চোখ। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁরা জীবননাট্যের রসরহস্য বেশি উপভোগ করেন। তাঁরা দেখতে পান—দেখানও।

কালভের চোখে এমন কত নাটকীয় ছবি আঁকা ছিল। তাদের দু'-একটিকে উদ্ধার করে আনছি। বেদনারসরক্ত ছবিটি :

লণ্ডন সিজন। বর্ণে-বৈভবে, হাস্যে-লাস্যে, বাক্যে-সঙ্গীতে আলোর দেওয়ালি। লেডি ডি গ্রে-র বাড়িতে সান্ধ্য-সম্মিলনী। কালভে গিয়েছেন। সুসজ্জিত অভিজাত নারী-পুরুষ একে-একে আসছেন, দ্বারে দাঁড়িয়ে গৃহকর্ত্রী তাঁদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। অস্কার ওয়াইল্ড এসে গেলেন—আর ঝলমল করে উঠল সমাবেশ। ইংলণ্ডের অভিজাত-সমাজের নয়নমোহন তিনি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে

অদ্বিতীয়, (যুগের সবচেয়ে বাক্‌পটু বলে কথিত), গর্ব করে বলেন, "আমি আমার জীবনে ঢেলেছি 'প্রতিভা', আর সাহিত্যে দিয়েছি 'নৈপুণ্য'—তিনি আসামাত্র সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলেন। স্যার উইলিয়ম ওয়াইল্ডের এই কনিষ্ঠ পুত্র অস্কার, জন্মে আইরিশ, কিন্তু লুণ্ঠন করেছেন ইংলণ্ডকে, রাসকিন ও পেটারের শিল্পতত্ত্বের ভক্তরূপে সাহিত্যে দায়িত্বহীন সৌন্দর্যচর্চায় বিশ্বাসী, জীবনযাত্রাতেও সযত্নে উদ্ভট, লম্বা চুল, বিচিত্র এলোমেলো পোশাক, মস্ত-মস্ত ফুল হাতে নিয়ে ঘোরেন, শেরিডনের পরে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা—।

অস্কার ওয়াইল্ড লেডি ডি গ্রে-কে একান্তে একটি বিশেষ অনুরোধ জানালেন। তাঁর এক বন্ধুকে এনেছেন নিমন্ত্রণ ছাড়াই। তাঁকে যদি পার্টিতে আসার অনুমতি দেওয়া হয় তিনি বাধিত হবেন! বন্ধুটি দরিদ্র কিন্তু প্রতিভাবান, ফরাসি, এখন বড় দুঃখী। গৃহকর্ত্রী সহৃদয়া, রাজি হলেন।

অস্কার ওয়াইল্ড নিয়ে এলেন—পল ভার্ল্যানকে!

ওয়াইল্ডের পাশে ভার্ল্যান। গৌরবের শিখরাসীন ওয়াইল্ড, প্রদীপ্ত চমকপ্রদ, মণি-অলঙ্কারে ঝলসিত, বিচিত্র সজ্জিত, দীর্ঘাকার, উৎফুল্ল—ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন একটি সামান্য পোশাকের ন্যুব্জ মানুষকে।

অথচ পল ভার্ল্যান সাহিত্যজগতের কী নন! ফরাসি সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় বিশুদ্ধ গীতিকবিদের একজন, রোমাণ্টিকতার সঙ্গে সাঙ্কেতিকতার সেতুবন্ধনে কবি-স্থপতি, অনুভূতি ও ভিশনের সূক্ষ্ম আলোছায়াময় পথে সঞ্চরমান, 'ফরাসি ভাষার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতের প্রধান আবিষ্কারক,' সিম্বলিস্টদের গুরুস্থানীয়।

পল ভার্ল্যান প্রথমজীবনে ছিলেন উদ্বুদ্ধ উড়নচণ্ডী। কাফে, আড্ডা কিংবা সজ্জিত ড্রাইংরুমে ঘুরেছেন, ঘনিষ্ঠ মিশেছেন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তাঁর জীবনের শনি হয়ে এলো সাহিত্যের আর এক প্রতিভা—আরও বৈপ্লবিক প্রতিভা—আর্থার র‍্যাঁবো। উভয়ের সম্পর্ক বিকারের পর্যায়ে পৌঁছল। সেজন্য ভার্ল্যানের বিবাহিত জীবনে অশান্তি ঘটল, পত্নী ও শিশুপুত্রকে ছেড়ে র‍্যাঁবোর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের নানা জায়গায়, দুজনের মধ্যে ভালোবাসার মতো কলহও অবিরাম, ব্রাসেলসে রোষান্ধ ভার্ল্যান র‍্যাঁবোকে গুলি করলেন, র‍্যাঁবোর হাতে লাগল, দু'বছরের জন্য জেলে যেতে হলো ভার্ল্যানকে।

ভার্ল্যান জেল থেকে মুক্তি পাবার পরে, সমাজজীবনে তাঁর পুনর্বাসনের জন্যে অস্কার ওয়াইল্ড সচেষ্ট। তাই তাঁকে এনেছেন এই মজলিশে।

কালভে ভার্ল্যানকে দেখলেন।

"সে রাত্রে হতভাগ্য কবির চোখ দুটিকে যেমন দেখেছিলাম, কোনোদিন ভুলব না। আতঙ্কিত, দিশাহারা, সব-হারানো এক শিশুর চোখ—সরল বিহ্বল আর কী করুণ! তারা এখনো আমাকে অনুসরণ করে যেন!…ওয়াইল্ডের বিশেষ অনুরোধে ভার্ল্যান অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেলে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন —দ্য আঁ প্রিসঁ। বুকভরা ছত্রগুলি যখন তিনি উচ্চারণ করছিলেন তখন তাঁর স্বর এমনই মর্মান্তিক ট্রাজিক যে, উপস্থিত সকলেরই চোখে অশ্রু ঝরল।"

বেশ কিছু পরের ঘটনা।

কালভে গেছেন প্যারিসের এক থিয়েটারে। নিজ আসনের কিছু দূরে তিনি একজনকে দেখলেন—যেন চেনা-চেনা। যাচ্ছেতাই পোশাক, নুয়ে পড়েছে শরীর, একেবারে বিধ্বস্ত।

লোকটি মাথা ফেরালে তবে কালভে চিনতে পারলেন—অ-স্কা-র ও-য়া-ই-ল্ড !! বন্ধু ভার্ল্যানের মতোই নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত। তাঁর মতোই সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছেন, পুরাতন গৌরবের চিহ্নমাত্র নেই, অপমানে লজ্জায় আত্মগোপন করতে চাইছেন অপরিচিত নিরুৎসুক ফরাসি জনমণ্ডলীর মধ্যে।

লর্ড অ্যালফ্রেড ডগলাস নামক একটি কুঁদুলে, আত্মম্ভরী, নীচ ছোকরার সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্কের অভিযোগে অস্কার ওয়াইল্ডের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল—যখন তিনি গৌরবশীর্ষে।

কালভে দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন অস্কার ওয়াইল্ডের দিকে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ওয়াইল্ড চমকে তাকালেন। নিদারুণ! সেই একই সকরুণ শিশু-চাহনি যা ছিল ভার্ল্যানের চোখে। কালভেকে দেখে ক্ষণেকের জন্য ওয়াইল্ড কুঁকড়ে গেলেন। অসহ্য পুরনো স্মৃতি। তারপর বুকচেরা একটা কাতরোক্তি করে কালভের হাত আঁকড়ে ধরলেন, আর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন—"ও ! কালভে ! কালভে !"

নানা রসের নানা কাহিনী…

এই রচনার গোড়ার দিকে কালভে সম্বন্ধে গিল্ডারের যে-কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছি, তাতে দেখা যাবে, গভীর ট্র্যাজেডির মতোই উচ্ছল হাসির শিল্পীও কালভে। কালভের আত্মকাহিনীতেও আমরা দুই ধরনের কাহিনী পাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কালভেকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রতি মরশুমে কালভে লণ্ডনে গেলেই ভিক্টোরিয়া তাঁকে ডেকে পাঠাতেন উইণ্ডসর ক্যাসল্‌-এ। প্রথম সাক্ষাতের দিন—বসার ঘরে কালভে অপেক্ষা করছেন—ভিক্টোরিয়া ঢুকলেন ভারতের এক তরুণ মহারাজার কাঁধে ভর করে। তরুণ মহারাজার ছিপ্‌ছিপে খাড়া শরীর, অত্যন্ত সুদর্শন, পাগড়িতে অজস্র হীরার দ্যুতি, পোশাকেও মণিমাণিক্যের প্রদর্শনী; আর বৃদ্ধা বিধবা মহারাণী সাধারণ কৃষ্ণবসন পরে আছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়াই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিলেন, এমনই ব্যক্তিত্ব।

উইণ্ডসর ক্যাসল্‌-এ নিয়মিত যাতায়াতের জন্য—কালভে ইউরোপের বহু রাজারাণীকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের মানুষ হওয়ার যন্ত্রণাও দেখেছিলেন। স্পেনের এক শিশু রাজকুমারী, সে পরে রাণী হয়, কালভেকে এমনই ভালোবেসে ফেলেছিল যে, সানটুৎসার ভূমিকায় অভিনয় করার সময়ে নায়িকা-রূপিণী কালভেকে নায়ক যখন ঠেলে ফেলে দিল তখন

শিশুটি কেঁদে উঠল উচ্চৈঃস্বরে আর তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ধমক দিল তার গভর্নেস : "মনে রেখো, কোনো রাজকুমারী প্রকাশ্যে কাঁদতে পারে না। একথা কদাপি ভুলবে না যে, তোমার প্রজাদের দৃষ্টি আছে তোমার উপর।"

উক্ত রাজকুমারীর বয়স তখন ছয় !

কালভের প্রতিভার প্রতি ভিক্টোরিয়ার শ্রদ্ধা থাকায় তিনি তাঁর সম্পর্কের বোন প্রখ্যাত ভাস্কর কাউণ্টেস থিয়োডোরা গ্লেইকেনকে দিয়ে এমা কালভের সান্টুৎসার ভূমিকার একটি মর্মর মূর্তি তৈরি করান।

মূর্তি নির্মাণকালে উক্ত কাউণ্টেস কালভেকে জিজ্ঞাসা করেন, "পোজ্ দেবার সময়ে তুমি এমন কী ভাবো যে, এত দীর্ঘ সময় অমন তীব্র নাটকীয় ভঙ্গি বজায় রাখতে পারো ?"

কালভে বললেন, "মানবিক ঈর্ষাকে ভঙ্গিতে ফোটাতে চেয়েছি বলে কেবলই মনে-মনে ভেবেছি—ও আমাকে ভালোবেসেছিল শুধু একদিন···আর···আমি ওকে ভালোবাসি নিশিদিন নিশিদিন।"

এই কথাগুলিই উৎকীর্ণ আছে মূর্তিটির তলায়।

উদারতার মতোই ভিক্টোরিয়ার রসবোধ। সস্নেহ কৌতুকে অনেক সময়ে অপরের অস্বস্তি বা লজ্জা ঢেকে দিতেন। তিনি বুঝেছিলেন, নিখুঁত এটিকেট কালভের সাধ্যে নেই, কেননা সে 'প্রকৃতির দুলালী !' মহারাণী একবার কালভের গানের শেষে বিশেষ অভিনন্দন জানালে আহ্লাদে গদগদ কালভে বললেন— "ধন্যবাদ রাজকুমারী।"

ভিক্টোরিয়া হেসে উঠলেন : "ওগো মিষ্টি মেয়ে, তুমি আমাকে যৌবন ফিরিয়ে দিলে।"

বিদায় নেবার সময়ে কালভে রীতিমাফিক সামনের দিকে মুখ রেখে পিছু হাঁটছেন—হঠাৎ পোশাকে পা জড়িয়ে পড়ে যান বুঝি। তখন আদব-কায়দা ভুলে তিনি ভিক্টোরিয়ার দিকে পিছন ফিরে পোশাক সামলালেন। বেআদবি কাণ্ড দেখে সবাই বিরক্ত। কী জঘন্য—মহারাণীর দিকে পিছন ফেরা !

ভিক্টোরিয়ার খুশির হাসি সব ঢেকে দিল। "ও কিছু নয়, কিছু নয়। কালভে, তোমার পিছনটাও সুন্দর···সামনের মতোই।"

জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন বলে কালভের মধ্যে সহানুভূতি এসেছিল। তারই একটি কাহিনী :

কাভাল্লেরিয়া রাসটিকানায় কালভে যথারীতি তাঁর প্রিয় সান্টুৎসার ভূমিকায় নামছেন। থিয়েটারে গিয়ে শুনলেন, টেনর সালিনাক অসুস্থ।—"তবে চিন্তা নেই, চমৎকার এক বদলী পাওয়া গেছে, নিউইয়র্কের এক নামকরা গায়ক"— কালভেকে আশ্বাস দেওয়া হলো।

সময় ছিল না—কালভে মঞ্চে ঢুকে নিজের গান শুরু করে দিলেন। তারপরেই বদলী টেনর ঢুকল—তাকে দেখে কালভের পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে গেল—এক কুব্জ বামন—এ হলো নিউইয়র্কের নামকরা গায়ক ! এই কুঁজো-

পিঠ লোকটার সঙ্গে প্রেম করতে হবে—এর জন্যে হতে হবে ঈর্ষায় পাগল! উম্ভট! বিকট! প্রচণ্ড রাগে কালভে স্টেজ ছেড়ে চললেন—কেলেঙ্কারীর কথা না ভেবেই।

হঠাৎ তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল লোকটির মুখে। হতভাগ্য। ভয়ার্ত, লজ্জিত, মুহ্যমান লোকটি তাকিয়ে আছে, দুই চোখে বোবা কান্না আর প্রার্থনা। কালভের বুক দুলে উঠল। আ-হা! আর তাঁর যাওয়া হলো না। ফিরে এসে সুর ধরে নিলেন। এবং···সেই মুহূর্তে নতুন প্রেরণাও এসে গেল। লোকটিকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় যাকে অতি কুশ্রী কুব্জ বামন দেখাচ্ছিল, এখন সে আর ততটা দৃষ্টিকটু রইল না। কালভে হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে প্রেমের, ঈর্ষার গান গাইতে লাগলেন। ঐ অবস্থায় গাইতে কষ্ট হচ্ছিল খুবই, তবু পরিস্থিতি তো সামলাতে হবে! কৃতজ্ঞ লোকটিও প্রাণ দিয়ে গাইল। ধন্যধ্বনি উঠল চতুর্দিকে।

প্রতিবার পর্দা যখন পড়েছে, লোকটি কালভের হাত নিজের কাঁপা হাতে মুঠো করে ধরেছে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরেছে কৃতজ্ঞতার অশ্রু, বারবার কেবল একটি কথাই বলেছে, বলতে পেরেছে—"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ।"

মৃতকে মারার এক উপভোগ্য কাহিনী এই :

ফাউস্টের অভিনয় হচ্ছে। কালভে মার্গারিট। ভ্যালেন্টাইনের ভূমিকায় নেমেছেন নিপুণ শিল্পী দেভয়ুদ। মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে ডুয়েলে ভ্যালেণ্টাইন মারা যাবে, শোক করবে মার্গারিট।

ভ্যালেণ্টাইন-ভূমিকাভিনেতার বাস্তবতার দিকে বিশেষ ঝোঁক। কালভেকে তিনি বললেন, "আমি মারা যাবার পরে তুমি শোক করার সময়ে আমার মাথাটি দুহাতে উপরে তুলে ছেড়ে দেবে, যাতে অসাড় শরীর আছড়ে পড়ে দর্শকদের দেখিয়ে দেয়—মৃত্যুটা খাঁটি।"

কালভে তাই করলেন—বরং একটু বেশিই করলেন। হিসেবের গণ্ডগোল করে মাথাটা অনেকখানি তুলে ফেলেছিলেন। যখন হাত ছেড়ে দিলেন—তখন ঢ-কা-স্ করে মাথা মেঝেয় ঠুকে পড়ল।

মর্মান্তিক গোঙানির সঙ্গে মৃত ব্যক্তি বলল : "উঃ, তুমি আমাকে সত্যই মেরে ফেললে!"

"ঈশ্বর না চাইলে মৃত্যু হয় না"—কালভে তাও দেখেছেন।

কালভে গেছেন রোমাণ্টিক হাভানায়। তামাক ও মসলাগন্ধে পূর্ণ বিচিত্র জগৎ। কিন্তু এই নন্দনলোকে রাত্রিবাসের উপযুক্ত হোটেল নেই। অনেক কষ্টে ওরই মধ্যে কাজচলা গোছের একটিকে আবিষ্কার করে সেখানে কয়েকদিন আরামে তিনি কাটিয়েছেন। এমন সময় নিউইয়র্ক থেকে ম্যানেজারের জরুরী টেলিগ্রাম এলো—অবিলম্বে ফিরে যাবার জন্য। তাড়াহুড়ায় বাঁধাছাঁদা করার সময়ে ছোট্ট পরিচারিকাটি সাহায্য করতে লাগল।

মেয়েটি বলল : "মাদামের চলে যাওয়াই ভাল।"

বিস্মিত কালভে শুধান : "এমন বলছ কেন?"

"মাদাম যে বিছানায় শুচ্ছেন, তাতে শুয়ে সপ্তাহখানেক আগে এক বেচারা ব্যালে-নর্তকী মারা গেছে।"

"অ্যাঁ, সে কি? কি হয়েছিল?"

"বলেন কেন মাদাম—পীত জ্বর। সারা শহরে ঘরে-ঘরে ঐ রোগ এখন; আর পট্‌পট্‌ মরছে।"

কালভে প্রায় মূর্ছিত। পীত-জ্বর—তার মানে সাক্ষাৎ যম। অত্যন্ত সংক্রামক। মৃতের বিছানায় শুয়েছেন তিনি! আর এক্ষেত্রে যত নিষিদ্ধ কাজ তাই করেছেন—কাঁচা ফল ও কাঁচা ঝিনুক-মাংস ভক্ষণ, দুপুরে রোদে হাঁটা, মশাভর্তি খাড়িতে নৌকা চালানো···

রাগে দুঃখে কালভে চেঁচিয়ে ওঠেন : "এ কী অন্যায় করেছ তুমি? নির্বোধ মেয়ে, এমন ভয়ানক কাণ্ড ঘটালে? ছি ছি, একবার বললে না?"

মেয়েটি কেঁদে ফেলল : "বলতে পারি নি মাদাম! আপনি এত ভালো, এমন দয়ালু—আপনি চলে যান তা চাইতে পারি কখনো?"

তারপর সে উচ্চ দার্শনিকতার সুরে বলল: "মাদাম এই প্রবাদটা তো জানেনই, ঈশ্বর না চাইলে মরণ নেই!"

এবার প্যারিসের কিছু মজার অভিজ্ঞতার কথা।

জিপসি-সাজ এবং বোহেমিয়ান ভঙ্গি কালভের খুব পছন্দ। তাঁর বান্ধবী প্রতিভাময়ী গায়িকা এলেনা সান্‌জ্‌-এরও তাই। একদিন তাঁরা ঠিক করলেন, ব্যালে-গায়িকার সাজে প্যারিসের রাস্তায় গান গেয়ে পয়সা জোগাড় করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন। জিপসিদের ঝলমলে ঝালর-দেওয়া পোশাক পরে, মাথায় স্কার্ফ বেঁধে, হাতে গিটার নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। মনে, মৃদু অভিমান, আমাদের যৌবনকাল, দেখতেও নিন্দের নই, আর মোটামুটি গাইতেও পারি।

স্পেনীয়দের বসবাস আছে এমন এক অভিজাত পল্লীতে ঢুকে দারোয়ানদের কাছে অনুমতি চাইলেন—ভিতরে ঢুকে বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে গান গাইবার জন্য। কিন্তু বরাতে জুটল খ্যাদড়ানির পর খ্যাদড়ানি। অবশেষে এক সদয় দারোয়ানের কৃপায় ভিতরে গান গাইবার অনুমতি মিলল।

কী সৌভাগ্য। দুজনে প্রাণপণে গান গেয়ে সৌভাগ্যের সদ্‌ব্যবহার করতে ব্যস্ত হলেন।

হঠাৎ বাড়ির নীচের তলার একটা জানলা খুলে গেল। অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে গর্জন : "আর কতক্ষণ এই ঘেউ-ঘেউ চলবে? ডাইনিগুলো কে? কুৎসিত গলায় ভুল সুরে গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে! দারোয়ান, আভি নিকাল দেও।"

বাপ্‌রে। দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন তাঁরা। রাস্তায় বেরিয়ে বড় দুঃখে কালভের

বান্ধবী বলেন : "আচ্ছা, আমরা কি সত্যি অত খারাপ গেয়েছি ?"

কালভে : "কি জানি বাবা। শুনে তো আমার মনে হল, আমাদের না আছে গলা, না জানি গাইতে।"

বান্ধবী এলেনা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন : "ঠিক আছে, দেখা যাক, গাইতে জানি কি-না ? স্প্যানিশ এমব্যাসিতে নেমন্তন্ন করেছিল, যাবো না বলেছিলাম—না, যাবো, একেবারে সেরা পোশাকে, দেখব পছন্দ করে কি-না ?"

স্প্যানিশ দূতাবাসে দুই পরমাসুন্দরী গায়িকার অপূর্ব সঙ্গীতের পরে যখন অভিনন্দনের বন্যা বইছে, তখন তাঁরা উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের কাছে পূর্বোক্ত ঘটনাটি বললেন।

"কি অদ্ভুত! আরে এই ঘটনাটিই তো মঁসিয়ে অমুক আমাদের একটু আগে শোনাচ্ছিলেন।"—এক মহিলা বললেন।

তারপর সেই মহিলা মঁসিয়ে অমুকের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মহিলা : "দেখুন মশাই, কারা ঘেউ-ঘেউ করছিল ?"

সবাই হেসে ফেটে পড়ল, মঁসিয়ে অমুক ছাড়া।

না, মঞ্চের বাইরে সাধারণ সাজে থেকেও নিছক গানের দ্বারা কালভে মনোহরণ ও কার্যোদ্ধার করতে পেরেছেন, এমন ঘটনাও ঘটেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। একটি ছোট শহরে গেছেন ঐ উদ্দেশ্যে। যেখানে একদিন পোস্টঅফিসে গেলেন—একটি রেজিস্টার্ড চিঠি আসার কথা ছিল, সেটি এসেছে কি-না খোঁজ নিতে।

কালভে : মহাশয়, এমা কালভের নামে কোনো চিঠি এসেছে কি ?

কেরানী : হাঁ, ঐ নামে একটি চিঠি আছে। কিন্তু সেটি তো আমি আপনাকে দিতে পারি না, যতক্ষণ না পরিচয়জ্ঞাপক কাগজপত্র হাজির করছেন।

ফরাসিনী কালভে যৎপরোনাস্তি ইংরেজিতে বললেন : দোহাই! দয়া করুন! আমাকে আবার আসতে বাধ্য করবেন না। ওটা আমারই চিঠি। সত্যি বলছি, আমি কালভে।

কেরানীর কণ্ঠে গভীর অবিশ্বাস : হুম্, আপনি কালভে! অনেক হয়েছে। তাঁকে তিন দিন আগে আমি কার্মেন গাইতে দেখেছি। মোটেই তাঁর মতো আপনাকে দেখাচ্ছে না।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে কেরানী-মহাশয় চাপা স্বরে পার্শ্ববর্তী সহকর্মীকে বললেন : আরে, দূর্! এ মেয়েটার চেয়ে কালভেকে অনেক ভালো দেখতে।

কেরানীর চাপা স্বর কালভে শুনতে পেয়েছিলেন।

কালভে : মহাশয়, আমি একথা জেনে আনন্দিত—আমি আসলে যা দেখতে তার থেকে আমাকে ভালো দেখায়। যাই হোক, আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি 'হাবানেরা' গাইব! ভরসা করি, আমার কণ্ঠস্বর দূর থেকে যেমন শোনায়, কাছ থেকেও তেমনি শোনাবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কালভে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গানে—লামুর এত'ফা দ্য বোহেম্—প্রেম যে বোহেমিয়ান শিশু বোহেমিয়ান।

সমস্ত পোস্টঅফিস স্তম্ভিত। কেরানী ব্যক্তিটি হতবাক। কোনো কথা না বলে চিঠিটি এগিয়ে দিলেন।

হাঁ, এবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে—কালভে কালভেই

দুই রাণী—অভিনয়ের ও গানের···

এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে—সারা বার্নহার্ড সারা বার্নহার্ডই।

সেদিন অদম্য অ-নিবার্য কালভেকেও উৎপাটিত হতে হয়েছিল অতিমানবিক এক শক্তিবন্যায়। যৌবনের অগ্নিশিখা কালভে সেদিন নিত্য যৌবনের প্রতিমার পায়ে নমস্কার করেছিলেন।

ঘটনাটি অবশ্য কালভের মধ্যজীবনে ঘটেনি, অনেক পরের ব্যাপার, যখন মঞ্চ-সঙ্গীত থেকে অবসর নিয়ে সঙ্গীত-শিক্ষিকার জীবন বরণ করেছেন। তখন বাস করছেন ফ্রান্সে নিজের দুর্গপ্রাসাদে—একদিন শুনলেন, নিকটেই অভিনয় করতে এসেছেন—

অন্য কেউ নন—লা দিভিন সারা। দৈবী সারা।

পৃথিবীতে এক এবং অদ্বিতীয় সারা বার্নহার্ড, যাঁর তুল্য অভিনেত্রী এ-পর্যন্ত হয়েছে কি-না সন্দেহ। রঙ্গমঞ্চে 'অমর যৌবন' কথাটি যদি কেউ কোনো-দিন অনপনেয় অক্ষরে লিখে থাকেন, সে তিনিই।

কালভের সঙ্গে সারা বার্নহার্ডের পূর্ব-পরিচয় ছিলই। কালভে যখন সঙ্গীতজগতের শীর্ষে, সেইকালে, তার আগেও, অভিনয়জগতের শীর্ষে অবস্থিত সারা বার্নহার্ড। বহু সংগ্রাম করে, মাদাম কালভে দীর্ঘদিন শিখরে অবস্থান করেছেন। তাঁর থেকেও অধিক দিন শিখরাসীন ছিলেন অভিনয়মঞ্চে সারা বার্নহার্ড, আরও কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়ে।

সারা বার্নহার্ড নিতান্ত বৃদ্ধা এখন—এখনো অভিনয় করছেন—পারছেন তো? না-কি আত্মহনন করছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে—জরার ছুরি নিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছেন অপূর্ব পূর্বপ্রতিমার অবয়বকে?

কালভে ক্ষুব্ধ হন, রুষ্ট হন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মানুষের অনিঃশেষ উচ্চা-কাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করে। কিংবা ঈর্ষাবোধ করেন এই ভেবে—এখনো উনি আছেন আলোকের সিংহাসনে, কিন্তু আমি কোথায়?

না না, তা নয়। কালভে চান, তাঁর ছাত্রছাত্রীরা একবার অন্তত দেখে আসুক প্রতিভার মহাদেবীকে। এ প্রতিভার হয়ত পুনর্জন্ম নেই।

আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে সারা বার্নহার্ড এলেন। মুহূর্তে দেখা গেল, আলোকের পরাভব আলোকের কাছে। মঞ্চে এখন কিছু নেই, কেউ নেই—কেবল সারা বার্নহার্ড। স্থানকালের বোধ মুছে দিয়ে কালভের চেতনায় দুলতে লাগল

এক চিররূপা কালমোহিনী। কোনো শিল্পী একে অতিক্রম করতে পারেন নি—পারা সম্ভব নয়।

শেষের পর্দা নামল। সারা বার্নহার্ড মঞ্চ ছেড়ে চলে গেছেন। কালভের যেন উঠবার ক্ষমতা নেই। বার্নহার্ড যে-প্রচণ্ড অনুভূতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তা যেন ফিরতি-টানে দর্শকদের প্রাণরস হরণ করে প্রস্থান করেছে।

কালভের ছাত্রছাত্রীরা ধরে বসল—সারার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে—তারা ওঁকে নমস্কার জানাবে—জানাবেই।

না সম্ভব না। কালভে জানেন, এতক্ষণ ধরে কী প্রচণ্ড শক্তিক্ষয় সারাকে করতে হয়েছে, যা এতগুলি দর্শককে আলোড়িত ও অবসন্ন করে দিয়েছে। এখন অসম্ভব ক্লান্ত তিনি, তাঁকে বিরক্ত করা যায় না।

ছাত্রছাত্রীরা নাছোড়। এ সুযোগ তারা হারাতে চায় না। স্বয়ং মাদাম কালভে সঙ্গে আছেন—তিনি যদি না পারেন, তাহলে ও-কাজ সম্ভব করতে পারবে কে?

নির্বন্ধে পড়ে কালভে রাজি হলেন।—"যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি। কিন্তু আমি তো জানি, ওঁর ক্লান্তির অবধি নেই।"

কালভে মঞ্চের পিছনে সাজঘরের দিকে চললেন। ওখানে প্রায় অনেকেই তাঁকে চেনে। সহর্ষে সকলে অভিবাদন করতে লাগল। ড্রেসিংরুমে বার্নহার্ড বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেখানে কালভে উপস্থিত। আচ্ছন্নের মতো তিনি বসে আছেন। এক নজর দেখেই কালভে তাঁর অবস্থা বুঝলেন।

কালভেকে দেখে সারা খাড়া হয়ে বসেন। সাদরে বলেন—"আঃ কালভে, তুমি! সঙ্গীতরাণী!"

সারার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কালভে বলেন—"দৈবী সারা! আমি এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে।"

"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!" সারা বলেন।

"আর একটি অনুরোধ—"

সারা প্রশ্ন-চোখে তাকান।

"আমি এসেছি আমার তরুণ বন্ধুদের পক্ষে অনুরোধ জানাতে। তারা আজ আপনার অভিনয় দেখেছে। তারা একান্তভাবে চায়—আপনার পায়ে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করবে। একবার যদি দেখা করবার অনুমতি পায়—না, বুঝতে পারছি, এখন তা সম্ভব নয়—"

"সত্যই তা সম্ভব নয় কালভে"—অতি ক্লিষ্ট স্বরে সারা বলেন—"আমার একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই—"

অসীম ক্লান্তিতে তাঁর চোখ বুজে যায়—ঘাড় ঝুঁকে পড়ে—একেবারে নিঃঝুম।

কালভে ঝটিতি উঠে পড়েন।—"ওরা হয়ত নিরাশ হবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা নিশ্চয় চিরজীবন মনে রাখবে আজকের অপূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি! ওদের পক্ষে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছি।"

কালভে ফিরে যাচ্ছেন, দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছেন, তখন বেজে উঠল সেই

যাদুকণ্ঠ, যার সম্মোহনে পৃথিবী বশীভূত।

"ওরা আসুক, কালভে। ওদের অভ্যর্থনা জানাবো। কিন্তু এখানে নয়, হোটেলে, যেখানে উঠেছি। এখনি সেখানে যাবো আমি"—বার্নহার্ড বললেন।

কালভের কাছ থেকে শুভ সংবাদ পেয়ে অপেক্ষমাণ উৎসুক তরুণ-তরুণীরা আনন্দে কলরব করে উঠল। অবিলম্বে তারা হোটেলের উপবেশন কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বাঞ্ছিত আবির্ভাবের জন্য।

"দরজা খুলে গেল। অকস্মাৎ জায়গাটি পূর্ণ হয়ে গেল দারুণ প্রাণদ্যুতিতে। এই কি সেই ক্ষয়িতশক্তি অবসন্ন নারী, যাকে অল্পক্ষণ আগে থিয়েটারের ড্রেসিং-রুমে দেখেছি? কী কল্পনাতীত রূপান্তর। ও কে—ঐ মোহিনী, প্রাণোচ্ছলা, জীবনময়ী—আসছে তরঙ্গ তুলে আমাদের দিকে? উপস্থিত প্রতিটি তরুণ প্রাণকে তিনি উপহার দিলেন—অপূর্ব হাসি, সহাস্য উক্তি, ধন্যবাদ, স্নেহ-প্রশ্রয়ের আলোকিত বাক্য। তারপর যখন চলে গেলেন তখন রেখে গেলেন এইসব তরুণ প্রাণের পটে অনন্ত যৌবনের অক্ষয় প্রতিচ্ছবি—এক অপরিম্লান কুহক-প্রতিমা—দৈবী সারা! দৈবী সারা!"

ঈশ্বরের সহযাত্রী তিনি·

মৃত্যু!

চোখের সামনে লোকটি মরে গেল।

কালভে সেদিন দর্শক-আসনে বসে অপেরা দেখছেন। তাঁর অন্যতম সহ-গায়ক কাস্টেলমেরি, কমেডির অভিনয়ে সুখ্যাত—ফ্লুটো-র 'মার্থা' বইয়ে স্যার ট্রিস্তান-এর ভূমিকায় এখন গান গাইছেন।

কাস্টেলমেরি স্টেজে আসামাত্র কালভে দেখলেন, ওঁর অবস্থা—অত্যন্ত ক্লান্ত আর অসুস্থ। মস্ত কোনো বোঝা বয়ে যেন ধুঁকতে-ধুঁকতে আসছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে গ্রামের মেয়েরা তাঁকে ঘিরে আছে। মার্থার সন্ধানে স্যার ট্রিস্তান ধাবিত হলে তারা আটকাবে।

কালভে দেখলেন, কাস্টেলমেরি টলছেন। মনে হল, সব-কিছু পাক খাচ্ছে তাঁর চারদিকে। আকুলভাবে শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিলেন।

গ্রাম্য মেয়ে ভূমিকার অভিনেত্রীরা ভাবল—এখনি অদ্ভুত বানিয়েছে তো! আমাদের কাস্টেলমেরির দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি! তারা সহর্ষে মজায় যোগ দিল। ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘিরে দাঁড়াল, হো-হো করে হাসল, টানাটানি করল, খোঁচাখুঁচি দিয়ে মজা করল, এমনভাবে জড়িয়ে ধরতে লাগল যে, প্রায় দম বন্ধ হবার জোগাড়।

কাস্টেলমেরি আকুল হয়ে খানিকক্ষণ তাদের হাত থেকে ছাড়া পাড়ার চেষ্টা করলেন, তারপরে অন্তিম আর্তনাদ তুলে দুম্ করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

তখন সবাই ছুটে এলো। কিন্তু সব শেষ।

কালভে তাঁর শীতল মুখ থেকে মেক-আপ ঘষে তুলে ফেলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

কমেডিয়ানের রঙ আর সাজসুদ্ধ তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো—কান্নার ঢেউ ঠেলে।

কমেডিয়ান কাস্টেলমেরি সেরা ট্রাজিক অভিনেতার গৌরব কিনে নিলেন জীবন-মূল্যে।

অভিনেতার এই জীবন। তোমার অভিনয়কে কিনেছি আমরা। প্রতিভা সে পণ্য—ক্রয়যোগ্য। এই মুহূর্তে তুমি কেমন আছো, কী ভাবছ—তার কোনো দাম নেই আমার কাছে। তুমি এখন আমাকে কী দিচ্ছ, সেইটুকুতেই আগ্রহ।

সেদিন কালভে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন, কার্মেন গাইতে যাবার আগে।

চিকাগোয় এসেছেন মহাগৌরবের চতুর্দোলায় চড়ে। নিউইয়র্কে কার্মেনের কল্পনাতীত সাফল্য ঘটেছে। সমাজের শিরোমণিরা তাঁকে প্রতিযোগিতা করে আপ্যায়ন করছেন। পৃথিবী পায়ের তলায়। কিন্তু কালভে তো সুখী হবার স্বভাব নিয়ে আসেন নি। প্রবল আবেগপ্রবণ, বাসনাময় তিনি, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে প্রায়ই জড়িয়ে পড়েন। ওহেন ব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে গভীর একটির বেদনাময় সমাপ্তি ঘটেছে সম্প্রতি। নিঃসঙ্গতায় ভরে আছে মন। একমাত্র অবলম্বন কন্যাটি—সে চিকাগোয় সঙ্গে এসেছে। গানের শেষে বাসায় ফিরে তাকে নিয়েই ভুলে থাকতে চান সবকিছু।

অসুস্থ বোধ করলেও গান না গেয়ে কালভের অব্যাহতি ছিল না। পাগলের মতো ছুটে এসেছে দর্শক—আর তিনি গাইবেন না? উর্বশী নাচবে না, গাইবে না, দর্শক-দেবতার অমরাবতীতে?

কালভে কিন্তু অত্যন্ত নার্ভাস, স্টেজে ঢুকতে পারছেন না যেন। অথচ যখন গাইতে শুরু করলেন, কোন্ এক অপরিচিত মধুরতায় কণ্ঠ ভরে গেল। দর্শকের অভিনন্দন দারুণ।

প্রথম অঙ্কের বিরতির পরে কালভে এমনই ভগ্নশ্রান্ত যে, দ্বিতীয় অঙ্কে নামা অসম্ভব। তবু বিশেষ চেষ্টায় নিজেকে তৈরি করে নিলেন, আর দেখলেন …গাইছেন অপূর্ব কণ্ঠে।

দ্বিতীয় অঙ্কের পরে ড্রেসিংরুমে ঢুকে প্রায় মূর্ছিত। ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, ঘোষণা করে দিন—আমি অসুস্থ, গাইতে পারব না।

এত বিধ্বস্ত কালভে আর কখনো নন। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত পারছেন না। থরথর করছে সর্বাঙ্গ। কী যেন সর্বস্বহারা করে দিয়েছে তাঁকে।

কিন্তু ম্যানেজার ও অন্য সকলে তাঁকে অব্যাহতি দিলেন না। আজি রজনীতে যে-অলৌকিক নেমেছে তাঁর উপরে—তার দর্শনে বিহ্বল দর্শকদের দাবির মুখ বন্ধ করা যাবে না। কালভেকে যেতে হবেই। কালভে গেলেন। আর যখনি স্টেজে দাঁড়ালেন, পূর্ববৎ কোন্ এক তীব্র অনুভূতির শিহরণ বয়ে

গেল তাঁর স্নায়ু-শিরায়—তিনি যেন অফুরন্ত সঙ্গীত-উৎসকে নিজের ভিতর থেকে উৎসারিত করে দিতে লাগলেন।

শেষ অঙ্কে কার্যত কালভেকে ধরাধরি করে স্টেজে পৌঁছে দিতে হলো। আর কালভে গাইলেন জীবনের সেরা গান।

শেষ যবনিকা যখন নামল—উন্মত্ত দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করে কোনো এক অজ্ঞাত কিন্তু নির্মম যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে কালভে ড্রেসিংরুমে ছুটে গেলেন। দেখলেন—

ম্যানেজার ও আর কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন বিষণ্ন মুখে। কালভে বুঝলেন, কিছু একটা ঘটেছে, নিদারুণ কিছু।

কালভে শুনলেন—

তিনি যখন গাইছিলেন—তারই মধ্যে তাঁর একমাত্র কন্যা—সে ছিল তাঁর বন্ধুর বাড়িতে—পুড়ে মরেছে।

মা যখন গাইছিল, মেয়ে তখন পুড়ছিল। দগ্ধ মেয়ের যন্ত্রণা গান হয়ে ঝরছিল মায়ের কণ্ঠে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ত্রাণ শুধু মৃত্যুতে।

একদিন জলে ঝাঁপ দিয়ে কালভে জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন। সে যাত্রা তাঁর গান তাঁকে বাঁচিয়েছিল। এখন গানের গলা শুকিয়ে গেছে শেষ গান গেয়ে।

মৃত্যুই উপায়। জ্বলন্ত স্মৃতির চিতায় মৃত্যুই স্বর্গ।

কালভে আবার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, পারলেন না। কিসের ঘোরে যেন ফিরে আসতে হলো। একবার নয়, বেশ কয়েক-বার সেই চেষ্টা, আর তার ব্যর্থতা। শেষকালে তাঁকে যেতে হলো সেই বাড়িটির দিকে—যেখানে যাবার জন্য তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বারবার বলেছেন।

সে বাড়িতে আছেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কিছুদিন আগে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ভাষণ দিয়ে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ক্লাসিক দেবতার মতো চেহারা, ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর, সমস্ত দেহকে ঘিরে শক্তি ও পবিত্রতার দ্যুতি। বয়সে তরুণ কিন্তু স্বয়ং চিরন্তন।

বিবেকানন্দ প্রচণ্ড শক্তিতে অনেককে টেনে তুলেছেন। তাঁর সান্নিধ্য উদ্দীপ্ত করে, আলোকিত। কালভেকে হয়ত তিনি সান্ত্বনা দিতে পারবেন। হয়ত গহ্বর থেকে বার করে আনতে পারবেন। কালভের বন্ধুরা তাই বুঝিয়েছেন।

এই বন্ধুদের মধ্যে মিসেস মিলওয়ার্ডস অ্যাডামসও ছিলেন। মিসেস অ্যাডামস বিখ্যাত মহিলা; নাট্যশিল্প, দর্শন, শরীরচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করে যশস্বিনী। বুদ্ধিমত্তা, ভাবব্যাপকতা, এবং চিত্তগভীরতার জন্য ইনি কালভের শ্রদ্ধেয়া। ইনিও যখন উক্ত সন্ন্যাসীকে আচার্য বলেন, এবং বারেবারে

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাগিদ দেন, তখন কালভে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। সন্দিগ্ধ কৌতূহলের সঙ্গে তিনি মিসেস অ্যাডামসের উচ্ছ্বাস শুনেছেন।

—'বিবেকানন্দ', তার অর্থ বিবেকের আনন্দ, সত্যই বিবেকের আনন্দমূর্তি তিনি। ব্রহ্মবাদী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। যীশুর মতো কখনো এখানে থাকেন কখনো ওখানে। তাঁর মতোই সঞ্চয়হীন। কেবল দান করেন জীবনের বাণী। সকলের সঙ্গেই সমভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সমর্থ। বিশিষ্ট ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক—সকলের বক্তব্য বোঝেন, তাদের বোঝাতেও পারেন—

কালভে বলেছেন—ঠিক আছে, সময় হলে দেখা হবে, তখন কৌতূহল মিটিয়ে নেব—

বন্ধুরা জোর করেছেন—বিবেকানন্দ এখন এখানেই আছেন, যাও তাঁর কাছে, তিনি নিশ্চয় তোমাকে শান্তি দেবেন—

আমাকে শান্তি দেবে একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী!—কালভের বাঁকা ঠোঁটে যাতনা ও ব্যঙ্গের রেখা। তারপরেই ঝলসে ওঠেন—আমার শান্তি মৃত্যুতে।

কিন্তু বেশ কয়েকবারের চেষ্টাতেও যখন আত্মহত্যা করা সম্ভব হলো না, তখন তিনি 'দেখাই যাক না' ভঙ্গিতে বিবেকানন্দের বাসস্থানে হাজির হলেন। উদ্ধত ভঙ্গিতে জানালেন, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে চান।

—স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবেন? আসুন, নিয়ে যাচ্ছি। তবে একটা অনুরোধ, ওঁর সামনে গিয়ে প্রথমেই কিছু বলবেন না। উনি জিজ্ঞাসা করলেই তবে উত্তর দেবেন।

কালভের অহঙ্কারে ধাক্কা লাগল—কী—! তাঁকে গিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে হবে? উপায়ও নেই এখন। এসেছেন যখন তখন ফয়সালা করে নেওয়াই ভালো।

স্বামীজী মেঝের উপর বসে ধ্যান করছিলেন। কালভে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে আছেনই—স্বামীজী ধ্যানলীন। কালভে ভিতরে-ভিতরে আগুন হয়ে উঠছেন। আচ্ছা অসভ্য লোক তো, একেবারে গাঁইয়া—আমার মতো জগদ্বিখ্যাত গায়িকাকে সম্মান না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে! না, এতটা সহ্য হয় না। চলে যাবো। কালভে পা বাড়িয়েছেন—তার আগে ভালো করে দেখে নিতে চাইলেন লোকটিকে।

> "তিনি মেঝের উপরে ধ্যানের সুমহান ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, রক্তিম হলুদ রঙের পোশাক মেঝেয় লুটিয়ে, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ না তুলেই কথা বললেন—
>
> 'কন্যা মোর! তোমার চতুর্দিকে কী না যন্ত্রণা ও সঙ্কটের আবর্ত! শান্ত হও। তোমার প্রয়োজন শান্তি।'
>
> তারপর এই মানুষটি, যিনি আমার নাম পর্যন্ত জানেন না—শান্ত অবিচলিত সুরে বলে গেলেন আমার গোপন সমস্যা ও উৎকণ্ঠার কথা।

এমন-সব কথা বললেন, যা আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরও জানার কথা নয়। মনে হলো, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত।

অভিভূত আমি, অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারলাম—এসব কথা আপনি জানলেন কি করে? আপনাকে এসব কে বলেছে?

মধুর স্মিত হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ, তাকালেন, যেন আমি একেবারে শিশু, খুব একটা বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি।

কোমলভাবে বললেন, 'কেউই এসব কথা আমাকে বলে নি। বলার দরকার আছে কি? আমি তো তোমার ভিতরটা বইয়ের খোলা পৃষ্ঠার মতো পড়তে পারছি।'

অবশেষে বিদায় নেবার কাল এলো। আমি উঠছি—তিনি বললেন, 'যা ঘটে গেছে তোমাকে ভুলতে হবে। আবার উৎফুল্ল হও, সুখী হও। স্বাস্থ্য রক্ষা করো। নিজের দুঃখ নিয়ে একান্তে নাড়াচাড়া করো না। গহন বেদনাকে বাহ্য অভিব্যক্তিতে খুলে দাও। তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তা প্রয়োজন, তোমার শিল্পের জন্যও।'

তাঁর বাক্য ও ব্যক্তিত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে আমি চলে এলাম। তিনি যেন আমার মস্তিষ্ক থেকে সকল জ্বরাতুর জটিলতাকে তুলে নিয়ে সেখানে ভরে দিয়েছেন তাঁর শুদ্ধ শান্ত ভাবনা।

ধন্য তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি—আমি আবার হয়ে উঠলাম প্রাণোদ্দীপ্ত, আনন্দময়। তিনি সাধারণ কোনো হিপ্নোটিক বা মেসমেরিক প্রভাব প্রয়োগ করেন নি। তাঁর চারিত্রশক্তি, আদর্শ ও লক্ষ্যের গভীরতা, এবং পবিত্রতাই আমার মনে বিশ্বাস জাগিয়েছিল। তাঁকে যখন আরও ভালোভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন বুঝেছি, তিনি নিজ শক্তিতে অপরের বিশৃঙ্খল চিন্তার মধ্যে শান্তি ও সাম্য এনে দেন, যার ফলে তাঁর কথা পরিপূর্ণ অখণ্ড মনোযোগ লাভ করে।"

কালভে দেখলেন—বিবেকানন্দ চূর্ণ করেন, আবার পূর্ণ করেন। আমিত্বের অহঙ্কারকে দূর করে সেখানে বইয়ে দেন সত্যের আলোক।

স্বামীজী একদিন বলছিলেন জন্মান্তরবাদের কথা : জন্মমৃত্যুর তরঙ্গে ধাবমান মানবজীবন। আমিত্ব-চেতনায় নিজেকে বেঁধে রাখলে মানুষ অনন্তে মিলিত হতে পারবে না। তা করলে আমি'র বর্ম পরে সে জন্ম-জন্মান্তরে প্রতিরোধ করে যাবে চিরন্তনের আহ্বানকে।

না—না—না—। স্বামীজীর কথা সত্য নয়। কালভে ছটফট করে ওঠেন। ওকথা সত্য হলে আমার সর্বনাশ, শিল্পের সর্বনাশ। আমিত্বের নাশ তো মৃত্যু। 'আমি' ছাড়া শিল্প হয় না, 'আমি' ছাড়া ব্যক্তি হয় না। যদি অনন্তের সঙ্গে, যদি ঈশ্বরের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে যাই, ব্যক্তিত্বের কী হবে?

স্বামীজী হাসলেন। 'ব্যক্তিত্ব' কথাটা নিয়ে খেলা শুরু করলেন। "এদেশে তোমরা বড্ডই ভীত ব্য-ক্তি-ত্ব হারাতে।"

তারপরেই বিদ্যুৎ ঝলসালো—"তোমাদের আবার ব্যক্তিত্ব? তোমরা তো ব্যক্তিই হয়ে ওঠো নি। ঈশ্বরকে না জেনে, নিজের স্বরূপ না জেনে, কে কবে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে?"

তারপর স্নিগ্ধ সকরুণ হলো তাঁর কণ্ঠস্বর—"একদিন একবিন্দু জল বিশাল সাগরে পড়বার সময়ে কাঁদছিল, তোমার মতোই। সমুদ্র শুধাল—কাঁদছ কেন? বারিবিন্দু বলেছিল, তোমার মতোই বলেছিল—কাঁদব না? আমার সর্বনাশ হতে চলেছে, আমি যে একেবারে হারিয়ে যাবো। সমুদ্র হেসে উছলে উঠল—কী বোকা তুমি! আমার মধ্যে আসছ, তার মানে তুমি তোমার ভাইবোনদের মধ্যে আসছ। অগণ্য 'তুমি' নিয়েই তো আমি—সমুদ্র। আমার মধ্যে এলে তুমি নিজেই তো সমুদ্র হয়ে যাবে। আর যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও তাহলে সূর্যকিরণকে ধরে উঠে যাও মেঘের মধ্যে। সেখান থেকে আবার নেমে এসো তৃষিত পৃথিবীতে, প্রেম ও করুণার মতো।"

অনেকের মতো কালভেও এসব কথা শুনেছেন।

কালভে রক্ষা পেলেন বিবেকানন্দের শক্তিতে। কেন, কোন্ সৌভাগ্যে, তা আমরা জানি না। জীবনরহস্যের কতটুকুই বা আমাদের গোচর? আমাদের সামনে কেবল খোলা আছে কতকগুলি সংবাদ: কালভের মধ্যে ছিল শিল্পপ্রাণতার মতোই তীব্র ধর্মপ্রাণতা; একদিন তিনি সন্ন্যাসিনী হবেন, স্থির করেছিলেন; সন্ন্যাসিনী হননি, ত্যাগের জীবন তাঁর নয়, বাসনায় আলোড়িত সর্বদা, কিন্তু ঝড়ের মধ্যেও তিনি বুকের আড়ালে ঢেকে রেখেছেন স্থিরজ্যোতি একটি দীপকে —ধর্মের।

সে দীপ স্থির—কিন্তু যেকথা বলেছি—তা ঝড়ের। কালভের আত্মা অপেক্ষা করছিল সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষের জন্য, যিনি সমুদ্রমৌনের মতো সমুদ্রঝড়কেও জীবনসত্য বলে স্বীকার করবেন, যিনি বাসনা-ত্যাগের কথা বলেও আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাকে প্রাণশক্তির মর্যাদা দেবেন।

বিবেকানন্দ কালভের সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন:

"কালভে···মহীয়সী মহিলা। সাইক্লোনের মুখে দাঁড়িয়ে বিশাল পাইনগাছ লড়াই করে যাচ্ছে। মহান দৃশ্য।"

কার্মেনের ভূমিকায় যাযাবর বাসনাকে উন্মোচন করেন কালভে। সে ভূমিকা কি শ্রেয়? সংকোচের সঙ্গে তিনি বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে শুনলেন —"কার্মেনকে খারাপ ভেবো না, সেও সত্য। সে মিথ্যা বলে না। উদ্দামতায় সে আত্মস্বরূপকেই অনাবৃত করে। যে অনন্যা নারীরা প্রার্থনার শেষে ম্যাডোনাকে বলে—মাগো, আমাদের প্রার্থনায় কান দিও না, আমরা কামনার আগুনে মরতে চাই—তাদেরই জাত সে।"

একালের ধর্মনায়ক বিবেকানন্দের কাছ থেকে এই প্রয়োজনীয় সত্যটি আমরা লাভ করলাম—তথাকথিত সংস্কারের আনুগত্যই ধর্ম নয়; ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যে দিব্যতার সন্ধান ও স্বীকৃতি।

কালভের দ্বিতীয় জীবনকে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসাগরের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

কালভের প্রণত কণ্ঠের এই নিবেদন :

"আমার মহাসৌভাগ্য, আমার পরম আনন্দ—আমি এমন একজন মানুষকে জেনেছিলাম যিনি সত্যই 'ঈশ্বরের সহযাত্রী'। তিনি মহতো মহীয়ান্। তিনি ঋষি, দার্শনিক, এবং যথার্থ বন্ধু। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর প্রভাব সুগভীর। আমার সামনে তিনি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন।...আমার আত্মার অনন্ত কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি।"

পুনশ্চ সারা বার্নহার্ড...

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন 'ধর্মেতিহাস সভা'য় যোগ দিতে। প্যারিসে সে বৎসর বিশ্বপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে, বিবেকানন্দের ভাষায়, "নানা দিগ্‌দেশাগত সজ্জনসমাগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ-নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা প্রকাশ করছেন।" তার মধ্যে বিশেষভাবে মিঃ লেগেটের ভবনে তখন প্রতিভার বিরাট সমাবেশ। বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম ও জগদীশচন্দ্র বসু, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস, সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডেস, ভাস্কর অগস্ত রদ্যাঁ, অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড, ধর্মযাজক পিয়ের হিয়াসান্থ, সাহিত্যিক জুল বোয়া, সমাজজীবনে পরিচিত প্রিন্সেস ডেমিডফ, প্রিন্সেস ডোরিয়া, লেডি অ্যাংলেসী, মিসেস ওলি বুল, ডিউক অব নিউক্যাসল্, ডিউক অব রিশলু এবং আরও গণ্যমান্য মানুষ। "কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক-গায়িকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক" —স্বামীজী সকলের মধ্যে নিজ দীপ্তিতে প্রকাশিত। কালভে সবিস্ময়ে স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভার বিকিরণ দেখেছিলেন। প্রচণ্ড সামাজিক চাঞ্চল্যের কেন্দ্র স্বামীজী তখন।

সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে এই প্যারিসেই আবার স্বামীজীর দেখা হলো। পূর্বের সাক্ষাৎ নিউইয়র্কে, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। বার্নহার্ড সে বৎসর নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন 'ইৎশীল' ও অন্য কয়েকটি নাটক নিয়ে, আর পাগল করে দিয়েছিলেন আমেরিকাকে। সারা বার্নহার্ড—"পৃথিবীতে অনন্যা তিনি, বিশ্বের সর্বাধিক বন্দিত অভিনন্দিত কীর্তিময়ী নারী, লক্ষ-লক্ষ মানুষের দ্বারা অর্চিত মহাদেবী, ফ্রান্সের ইতিহাসের মহাগৌরব, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।" এই সারার 'ইৎশীল' অভিনয়ের অভিনবত্বে সকলে চমৎকৃত। তার বিষয়বস্তু ভারতীয়, সুতরাং স্বামীজীর বন্ধুরা তাঁকে অভিনয় দেখতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজী 'ইৎশীল' দেখলেন, তারিফ করলেন, আবার হাসতেও লাগলেন।

সারার অভিনয়ক্ষমতা, সেই সঙ্গে নাটকে পরিবেশগত বাস্তবতা রক্ষার প্রয়াস দেখে স্বামীজীর ভালো লেগেছিল।

"মাদাম বার্নহার্ড বর্ষীয়সী, [স্বামীজী লিখেছেন], কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন, তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন তার হুবহু নকল! বালিকা বালক, যা বলো তাই হুবহু। আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রুপোর তার বাজে।...এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা-ঘাট পরিচয় করেছি'।"

আর স্বামীজী হেসেছিলেন নাটকের বিষয়কাণ্ড দেখে। বিষয়—বুদ্ধজীবনী—কিন্তু ফরাসি ধাঁচে। বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধ আসীন—তাঁকে রাজনর্তকী প্রলুব্ধ করছে। ঝোঁকটা বুদ্ধের বৈরাগ্য দেখানো অপেক্ষা রাজনর্তকীর ছলাকলা দেখানোতেই বেশি পড়েছিল।

"ফরাসি অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইৎশীল' অভিনয় করছেন [স্বামীজী লিখেছেন]।...এতে রাজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হল। মাদাম বার্নহার্ড ইৎশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন।"

অভিনয়কালে স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শক-আসনে দেখতে পেয়ে সারা বার্নহার্ড কৌতূহলী হয়ে সাক্ষাৎ করতে চান, এবং পরে উভয়ের আলাপ হয়। স্বয়ং সারা অপরের সঙ্গে যেচে দেখা করতে চেয়েছেন—এই সংবাদটি অনেকখানি বিস্ময়ের সঙ্গে গিলতে হয়েছে বিবেকানন্দের অনুরাগী পাশ্চাত্ত্য লেখকদের পর্যন্ত, যাঁদের মধ্যে ক্রিস্টোফার ইশারউড আছেন। কিন্তু সেই পৃথিবীতে সারা যেমন একমাত্র, বিবেকানন্দও তাই, 'কোনো দৃষ্টিই যাঁকে অগ্রাহ্য করতে সমর্থ নয়।' প্রেক্ষাগারে বিবেকানন্দের উপস্থিতির গরিমার একটা বর্ণনা এখানে উপস্থিত করা যায় কনস্টান্স টোনীর লেখা থেকে। কনস্টান্স টোনী অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর মায়ের দেহে প্রবাহিত ছিল ফরাসি রাজরক্ত, সেকালের এক বিখ্যাত সুন্দরী তিনি, দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী, সে হিসাবে 'কালো প্যাগান লোকটি' (অর্থাৎ স্বামীজী) সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ঘৃণা ছিল, পরিচয়ের পরে সেটা ক্রমে কেটে যায়। এহেন জননীকে কনস্টান্স টোনী ধরে বসলেন—স্বামীজীকে নিয়ে তিনি মেট্রোপলিটান অপেরায় যাবেন। ভ্রাতা বিবেকানন্দের রূপসৌন্দর্য আর মহান ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ভগিনী টোনীর গর্বের সীমা ছিল না। "ক্লাসিক ভাস্কর্যের মতো রূপময় তিনি...বৃহৎ দুই চক্ষু মধ্যরাত্রির মতো নীল, মুখে আত্মার বিজয়ী জ্যোতি"—এঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার গৌরব ছাড়তে রাজি ছিলেন না চব্বিশ বছরের শুভ্র, কৃশ, দীর্ঘ, স্বর্ণকেশী, নীল-ধূসর চক্ষু কনস্টান্স টোনী। তিনি লিখেছেন:

"একবার সোমবার সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটান অপেরায় ফাউস্ট-এর শ্রেষ্ঠ-তারকা-সম্মিলিত অভিনয়ে—যেখানে গোটা সোসাইটি বক্স-আসনে উপস্থিত—হীরা-জহরতে মোড়া শরীর দেখাতে, গাল-গল্প করতে, দেরীতে এসে আরও দর্শনীয় হতে—সব কিছু করতে, কেবল অপেরা দেখতে নয়। তখন মেল্‌বা-র প্রতিভার যৌবনদিন, তিনি ছিলেন, রেজ্‌কে-রা (জ্যাঁ দ্য রেজ্‌কে এবং এদুয়ার্দ দ্য রেজ্‌কে), এবং বয়্যার-মেইস্টার। স্বামীজী আগে কখনো অপেরা দেখেন নি। আমাদের রিজার্ভ-করা আসন ছিল অর্কেস্ট্রা সার্কেলের মধ্যে সেরা এক-জায়গায়। আমি মাকে বললাম, 'স্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত।' তা শুনে মা স্বামীজীর দিকে ফিরে বললেন—'কিন্তু আপনি কৃষ্ণকায়। আপনাকে নিয়ে গেলে পৃথিবীর লোক বলবে কি ?' স্বামীজী শুনে হেসে উঠে বললেন, 'আমি আমার বোনের পাশে বসব। সে কিছু মনে করবে না আমি জানি।'

সেদিনের চেয়ে বেশি রূপময় কখনো তাঁকে দেখি নি। আমাদের আশেপাশে যারাই ছিল, সবাই তাঁকে নিয়ে এমনই চঞ্চল ছিল যে, আমি নির্ঘাত বলতে পারি, তারা সে-রাত্রে অপেরায় দৃষ্টি দিতে পারে নি।

আমি ফাউস্টের গল্পটি স্বামীজীকে বোঝাতে চাইলাম। মা শুনে বললেন, 'হা ভগবান ! তুমি অল্পবয়সী মেয়ে, তুমি ঐ বিকট কাহিনীটি একজন পুরুষমানুষকে শোনাচ্ছ ! একাজ একেবারে ঠিক নয়।'

'ব্যাপারটা যদি ভালোই না হয়, তাহলে একে এখানে পাঠালেন কেন ?' স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন।

'অ্যাঁ—হ্যাঁ। অপেরায় আসতে হয়। ওটা একটা করণীয় কাজ। কিন্তু সব কাহিনীই বদ। তাই কাহিনী নিয়ে আলোচনার কোনোই প্রয়োজন নেই'।"

মায়ের নিবুদ্ধিতায় কনস্টান্স টৌনী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হায়, এই জগৎ এবং তার আত্মপ্রবঞ্চনা !

অভিনয়ের মধ্যে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বোন, ঐ যে ভদ্র-লোকটি সুন্দর গায়িকার সঙ্গে প্রেম করছে, ওকি সত্যিই মেয়েটিকে ভালবাসে ?"

"নিশ্চয় স্বামীজী"—টৌনী উত্তর দেন।

"কিন্তু লোকটি কত অন্যায় করেছে, মেয়েটিকে কত দুঃখ দিয়েছে—"

"তা ঠিক"—নম্রভাবে স্বীকার করেন টৌনী।

"হুম্, এখন আমি বুঝতে পেরেছি"—স্বামীজী বললেন—'সুন্দরী মেয়েটি ঐ লোকটির সঙ্গে প্রেমে পড়েনি, আসলে সে প্রেমে পড়েছে ঐ লাল কাপড়-পরা লেজওয়ালা লোকটির সঙ্গে—ওকে তোমরা কি যেন বলো—শয়তান—তাই নয় ?"

আমেরিকার সবসেরা অপেরায়, শ্রেষ্ঠ তারকাদের সম্মিলিত অভিনয়ের সন্ধ্যায়, যদি বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগারের সর্বাধিক দৃষ্টি-আকর্ষক ব্যাপার হন, তাহলে মঞ্চ থেকে তাঁর উপরে সারা বার্নহার্ডের দৃষ্টি পড়তেই পারে। বিশেষত, আগেই বলেছি—বিষয় ভারতীয় এবং নায়ক বুদ্ধ। বিবেকানন্দের মুখের সঙ্গে বারে-বারে বুদ্ধ-মুখের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে আমরা জানি। কেবল বহিরবয়বে তিনি বুদ্ধ নন—ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রেও নব বুদ্ধ—একথাও বলা হয়েছে। মঞ্চে অভিনয়কালে সারা বার্নহার্ড অভিনেতা-বুদ্ধের সামনে রূপের ছলনা বিস্তার করছিলেন, প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিলেন এবং শুনছিলেন বৈরাগ্যের বাণী—অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল প্রেক্ষাগারে—আশ্চর্য, ওখানে কে বসে—স্বয়ং তিনি নন কি, যাঁকে এখানে মঞ্চে মেক-আপের আবরণে উপস্থিত করেছি। সেই মুহূর্তে কোন্ বিদ্যুৎচমক সারা বার্নহার্ডের মনে খেলে গিয়েছিল বলতে পারব না—এক বিচিত্র নাটকে তিনি যেন অভিনয় করছিলেন—মঞ্চে সাজানো বুদ্ধ—প্রেক্ষাগারে আসল বুদ্ধ—আর তিনি ছলনাময়ী নর্তকী। মঞ্চের বুদ্ধ আড়ষ্ট, আরোপিত গাম্ভীর্যে অনড়, বিশুষ্ক বৈরাগ্যবাণী শোনাচ্ছেন; আর প্রেক্ষাগারের বুদ্ধ সহাস্য, উৎফুল্ল; ভাবছেন, মোহমায়ার কী অদ্ভুত লীলা! হয়ত ভাবছিলেন, সারা বার্নহার্ডের কুহকের চেয়ে কি বেশি কুহক থাকা সম্ভব ছিল বুদ্ধের কালের সেই রাজনর্তকীর? সারা বার্নহার্ডকে কি কোনো কালে কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে? আর…কে জানে তিনি ভাবছিলেন কিনা…ঐ প্রলোভনের লীলা-ছলা এই মুহূর্তে আমাকে কিন্তু আক্রমণ করছে না…না, এটা অভিনয়…আমি বুদ্ধ নই, ঊনিশ শতকের বিবেকানন্দ…বসে আছি থিয়েটার হলে…অভিনয় দেখছি…

সারা বার্নহার্ডের ইচ্ছানুসারে নিউইয়র্কের 'সম্ভ্রান্ত' মিঃ করবিনের বাস-ভবনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্য আরও দুজন বিখ্যাত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন—ফরাসী ব্যারিটোন-গায়ক ভিক্তর মোরেল এবং তৎকালে পৃথিবীর প্রধান বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানী, যুগের 'থর দেবতা'-রূপে কথিত, নিকোলা টেসলা। আলোচনার মধ্যে অনেক কিছুই ঘোরাফেরা করেছিল। সারা বার্নহার্ড নিশ্চয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। স্বামীজী নিশ্চয় সারাকে তাঁর অভিনয়ক্ষমতা, ভারতপ্রীতি ইত্যাদির জন্য প্রশংসা করেছিলেন। তারপর স্বভাবতই ভারতীয় ধর্মদর্শনের আলোচনা এসে পড়েছিল। "মাদাম বার্নহার্ড খুব সুশিক্ষিত মহিলা [স্বামীজী লিখেছেন] এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। মোরেল উৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মিঃ টেস্লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন।"

সারা বার্নহার্ড কিন্তু বেশি অগ্রসর হলেন না। বুদ্ধের মতো অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় সন্ন্যাসীকে তিনি দেখে নিয়েছেন, যাঁর আছে দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব, গভীর দার্শনিক প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক বাচনভঙ্গি। হাঁ, বেশ কথা, আর একটি ইনটারেসটিং লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। কিন্তু ব্যাপারটার শেষ এখানেই। সারা বার্নহার্ডের

জীবনে ধর্ম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়,…এবং…ঐকালে তিনি এমন কোনো গুরুতর জীবনসমস্যায় উৎপীড়িত নন যে, ধর্মীয় মানুষের অলৌকিক ক্ষমতার কাছে তাঁকে আশ্রয়ভিখারী হতে হবে। "তাঁর জীবনীকারদের মতে, ধর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছিল কেবল বাল্যে ও কৈশোরে, যখন তিনি ফ্রান্সে এক কনভেন্টে কয়েক বছর ছিলেন। সেখানে এগার বছর বয়সে তিনি ব্যাপটাইজড্ হন এবং কিছু সময় একান্তভাবে ভেবেছিলেন নান্ হবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এক বন্ধুকে বলেন, 'সারাজীবন আমার পক্ষে সন্ন্যাসিনী হয়ে কাটানো সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। আমি কখনই খাঁটি ধর্মীয় মানুষ নই। সন্ন্যাসিনীর চতুর্দিকে যে গরিমা, রহস্য, সর্বোপরি প্রশান্তি ঘিরে থাকে, তারই প্রতি ছিল আমার আকর্ষণ। যদি সন্ন্যাসিনী হতাম, তাহলে মাসকয়েক কাটার আগেই কনভেন্ট ছেড়ে পলায়ন করতাম'।"

"সারা বার্নহার্ড যদি কোনো জিনিসকে নিজ জীবনে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, তা হলো প্রশান্তি," বিবেকানন্দের বিখ্যাত জীবনীকার লুইস বার্ক লিখেছেন, "তিনি ভালবাসতেন উত্তেজনা, জন-সম্পর্ক, জয়বাদ্য।…শিল্প ও কর্মজীবনের সাফল্য নিয়েই তিনি পুরো ব্যাপৃত ছিলেন—ঐ দুটি জিনিসই তাঁর প্রধান ভালবাসার বস্তু।"

বিবেকানন্দের সঙ্গে নিউইয়র্কে যদি সারা দেখা করতে চেয়ে থাকেন, সে স্বামীজীর বিরাট মহান বিস্ময়কর উপস্থিতি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েই, জীবনের কোনো সংকট মোচনের জন্য নয়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে যখন আবার বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হলো তখনও সারার সেই একই মনের রূপ—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেই পুরাতন কৌতূহল, রহস্যভরা দেশটি ও তার মানুষদের দেখার জন্য আগ্রহ—কিন্তু আগ্রহ অতিরিক্ত না হওয়ায় সে ইচ্ছা স্থগিত।

"বার্নহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর। [স্বামীজী আরও লিখেছেন—] আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ 'ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে'—অতি প্রাচীন অতি সুসভ্য। বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মঁ র‍্যাভ, সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্নহার্ড বললেন—সে দেশে যেতে গেলে দেড় লাখ, দু'লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—লা দিভিন্ সারা !!—দৈবী সারা—তাঁর আবার টাকার অভাব কি?—যাঁর স্পেশাল ট্রেন ভিন্ন গতায়াত নেই!—সে ধূম-বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজা-রাজড়া পারে না; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নেই, তবে সারা বার্নহার্ড বেজায় খরচে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।"

বিবেকানন্দ ও বার্নহার্ডকে পাশাপাশি রেখে দেখার চেষ্টা করেছেন ক্রিস্টোফার ইশারউড। স্বামীজীর মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

'এই কয়েকটি ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক ছদ্মগম্ভীর বাক্যের মধ্যে সহানুভূতি

ও পছন্দের তাপ অনুভব করা যায়। উক্ত ক্ষুদ্রাকার সেমিটিক ফরাসি নারীর সামনে স্বামীজী বসে আছেন—ছবিটি কল্পনায় দেখে নেওয়া যেতে পারে—বৃহৎ আকারের মানুষ তিনি, উৎফুল্ল, মজা-লাগা চোখে ঐশ্বর্য আড়ম্বরভরা পরিবেশটি দেখে নিচ্ছেন—ঝলমলে মণিমাণিক্য, ঝকঝকে আয়না, রেশমী সজ্জা, অপূর্ব পোশাক, প্রসাধন দ্রব্যের সমাহার। এখানেও তিনি, যেমন সর্বত্র করেন, নারীকে নিজ কন্যা, ভগিনী, মাতা বলে নমস্কার করেছেন। এখানেও, যেমন সর্বদা করেন, সেই নিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রণত হয়েছেন, যিনি বিচিত্র এক ছদ্মবেশ ধরে উপস্থিত আছেন, যা আত্মোপলব্ধির পথে যাত্রাকালে আমাদের বিভ্রান্ত করে। এখানে অধিকন্তু তিনি নিশ্চয় সেই বিশেষ গুণটির অনন্যসাধারণ প্রকাশকে লক্ষ্য করেছিলেন যাকে অত্যুচ্চ সমাদর করতেন—সা-হ-স! প্রচণ্ড রকমের বিপরীত এই দুই চরিত্রের মধ্যে সাহসই বোধহয় একমাত্র সাধারণ গুণ। সাহস—যা বিবেকানন্দকে তাঁর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক জীবনঝঞ্ঝার প্রহরে রক্ষা করেছিল, রক্ষা করেছিল তাঁর আচার্যের দেহান্তের পরে; তারপরে রামকৃষ্ণ সংঘের আদিপর্বের সংঘাত ও সংকটের মধ্যে; তা তাঁকে কখনো ত্যাগ করেনি—গহন অরণ্যে, পর্বত-শীর্ষে কিংবা কোটিপতি আমেরিকানদের ড্রইংরুমে, যেখানেই তিনি থাকুন। সাহস—সাহসই সারা বার্নহার্ডকে শক্তি দিয়েছিল নিজ শিশুর অধিকাররক্ষার সংগ্রামের সময়ে, কিংবা প্যারিস অবরোধের কালে, বা ড্রেফ্যুস-এর পক্ষ সমর্থনের কালে, কিংবা ডান পা কেটে বাদ দেবার পরেও ৭২ বছর বয়সে মঞ্চে প্রত্যাবর্তনের কালে। স্বামীজী নিশ্চয় এসব বিষয়ে অবহিত ছিলেন, এবং এই কারণে তাঁকে পছন্দ করেছিলেন।

"আর বার্নহার্ড স্বামীজীর বিষয়ে কী ভেবেছিলেন? হয়ত বিচিত্র শোনাবে, তবু মনে হয়—নিজের এক ধরনের সহকর্মী। বিবেকানন্দও কি তাঁরই মতো সর্বসমক্ষে জয়ধ্বনির মধ্যে আবির্ভূত হন নি? অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী, জোয়ান অব আর্ক-এর সাজে স্বয়ং সারাও, সেণ্টদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং পাদপ্রদীপের অপরদিকে উপবিষ্ট দর্শকদের খুশি করেছেন। স্বামীজী অপরপক্ষে তাঁর অতুলনীয় অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব এবং গভীর নিনাদিত কণ্ঠস্বরের জন্য বিরাট অভিনেতা বলে গৃহীত হতে পারতেন।

"এই পর্বের একটি ফটোগ্রাফে আমরা দেখি, ভক্তি ও সংশয়ের মিশ্র অগ্নিতে জ্বলন্ত তরুণ সন্ন্যাসীর দুই চোখ এখন কোমল ও গভীর রূপ নিয়েছে পরিণত একটি মানুষের আননে। বিস্তৃত ওষ্ঠে এবং স্ফীত নাসারন্ধ্র থেকে ছড়িয়ে-পড়া গভীর রেখাগুলিতে উন্মুখ হাসি—না, তাতে বিদ্রূপ, তিক্ততা কিংবা আত্মসমর্পণ নেই—আছে শুধু বিশাল স্থির শান্তি, তা যেন সমুদ্রের, নিশ্চয়তা ঘনিয়েছে যার উপরে, অনন্তের সূর্যোদয়ের জন্যে। 'আপনি কি কখনো গম্ভীর হবেন না স্বামীজী?' কিছুটা

তিরস্কারের ভাষায় একজন প্রশ্ন করেছিল। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয় তা হব, যখন পেট কামড়াবে।' তাও ঠিক নয়, এই ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের সহাস্য কৌতুকপ্রবণ বিবেকানন্দ ইতিমধ্যেই গভীরভাবে অসুস্থ।"

সারা বার্নহার্ডের কোনো জীবনীতে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ নেই। সেই অনুল্লেখের গভীর অর্থ ইশারউড উন্মোচন করেছেন :

"বার্নহার্ডের যে আধ ডজন জীবনীর পৃষ্ঠা আমি ওল্টাতে পেরেছি, তার কোনোটিতে বিবেকানন্দের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত উভয়ের সাক্ষাৎ খুবই সংক্ষিপ্ত ঘটনা, তাতে রীতিমাফিক অল্প-কিছু কথাবার্তা এবং ভদ্রতা-বিনিময় হয়েছিল, সেটা গুরুতর কোনো ব্যাপার নয়। আর সেটাই ঘটনাটিকে এত চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কবি বা রাজনীতিকেরা একত্র হলে আমরা কথার ফুলঝুরি আশা করি, কারণ কথাই তাঁদের অভিব্যক্তির মাধ্যম। কিন্তু জ্যোতির তনয়ের ক্ষেত্রে কথা মুখ্য বাহন নয়। তাঁদের প্রবেশ আরও সরাসরি, সূক্ষ্ম এবং অন্তর্ভেদী। আমাদের প্রতিদিনের জাগ্রত মনের অগোচরে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি প্রিন্স অব ওয়েলসের বিষয়ে কথা বলছেন, কিংবা ঈশ্বরের বিষয়ে, কিংবা কিছু বলছেন না শুধু হাসছেন—সেই মুহূর্ত থেকে নিশ্চয় তোমার সমগ্র জীবন কোনো না কোনোভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

"সেই কারণেই, বার্নহার্ডের জীবনীকারদের নীরবতা সত্ত্বেও, এবং উভয়ের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক আলোচনা হয়েছিল, এই সংবাদ না থাকলেও, নিঃসংশয়ে বলতে পারি না যে, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সারার জীবনে বৃহৎ কিংবা স্থায়ী কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। ইতিহাসের সন্ধানী আলোকরেখা মানুষের বহির্গত কর্মের ক্ষুদ্র একটি অংশকে তীব্র আলোকিত করে—তা কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে সমর্থ নয়। এখানে এইটুকুই আমরা বলতে পারি : জগতের সমক্ষে দুই মানব-রহস্যরূপে আবির্ভূত বার্নহার্ড ও বিবেকানন্দ—একদিন মিলিত হয়েছিলেন, উভয়ে বিনিময় করেছিলেন কিছু সংকেত, যাদের অর্থ আমরা জানি না—তারপর তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন—কেন, তাও জানি না। কেবল এইটুকু জানি, তাঁদের এই সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অপর সকল ঘটনার মতোই অকারণে ঘটেনি।"

অবিস্মরণীয় তীর্থযাত্রা…

কালভে-কাহিনী থেকে বার্নহার্ড-কাহিনীতে সরে গিয়েছিলাম, ইচ্ছা করেই।

তৎকালীন পৃথিবীর প্রধানা অভিনেত্রী ও প্রধানা গায়িকা—উভয়েই স্বামীজীকে দেখেছেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, সারা বার্নহার্ডের কাছে স্বামীজী আপাতত আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নন। বার্নহার্ড ভারতবর্ষে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অনেক কৌতূহলী ইচ্ছার মতো সে ইচ্ছাও উৎসাহের অভাবে অপূর্ণ থেকে যায়। ভারতবর্ষ বার্নহার্ডকে গভীরে ডাক দেয় নি, কিন্তু ডেকেছিল কালভেকে, কেননা ধর্ম তাঁর জীবনে নিত্যস্রোত, আর বিবেকানন্দ তারই আধার-পুরুষ। বিবেকানন্দ যখন কালভের অতিথি হয়ে গ্রীস, তুরস্ক ও মিশর ভ্রমণ করতে রাজি হলেন তখন কালভে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করেছিলেন। দলে আরও ছিলেন—জুল বোয়া, পিয়ের হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্নী, এবং মিস ম্যাকলাউড। কালভের কাছে এ হলো আত্মার তীর্থযাত্রা। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর কাছে দারুণ রসালো সংবাদ, কারণ গায়িকা-সম্রাজ্ঞী ভ্রমণে বেরিয়েছেন অপরিচিত রহস্যময় দেশের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

এই ভ্রমণ তৎকালীন সামাজিক জীবনে কোন্ দারুণ চাঞ্চল্য ও কানাকানির বিষয় হয়েছিল তা দেখা যায় নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্ পত্রিকার ১১ নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যায়। একেবারে পাতাজোড়া উত্তেজিত বিবরণ, তা অধিকন্তু সচিত্র। কার্টুন-ছবিতে দেখি, কালভে মরুভূমির মধ্য দিয়ে উটের পিঠে চলেছেন, উটের লাগাম ধরে মরুবাসী আরব বেদুইন। উপরে ডান দিকে ফ্রেমের মধ্যে কালভের এবং নীচে বাঁ দিকে স্বামীজীর ছবি।

দূর নিউইয়র্কের উন্মুখ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য রবিবারের ওয়াল্ড্ পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা যে-মুখরোচক চানাচুরী সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তাতে টক নুন ঝাল যথেষ্টই ছিল এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যার অদ্ভুত মিশাল। সংবাদের সূচনাটা এইরকম:

STRANGEST OF PILGRIMAGES—CALVE'S
FLIGHT FOR HEALTH TO THE MYSTIST
Brilliant Singer Abandons Her Stage Career
And Seeks The Shrine Of Buddha
With Mrs. Francis H Leggett Of New York
And Princess Demidoff Under Charge
Swami Vivekananda, Whose Occult Soirees
At Paris House Of The Leggetts
Have Been A Social Sensation.

অর্থাৎ—

বিচিত্রতম তীর্থযাত্রা। স্বাস্থ্যোদ্ধার বাসনায় কালভের মিস্টিকদের কবলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। অসাধারণ গায়িকা তাঁর মঞ্চজীবন ত্যাগ করে

বুদ্ধের মঠে আশ্রয়প্রার্থিনী। সঙ্গে আছেন নিউইয়র্কের মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট এবং রাশিয়ার প্রিন্সেস ডেমিডফ। পরিচালক স্বামী বিবেকানন্দ, লেগেটদের প্যারিসভবনে যাঁর রহস্যচর্চার জমায়েতগুলি সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার।

ব্যাপারটা চাঞ্চল্যকর হতেই পারে কারণ অন্য কেউ নন, এমা কালভে প্রাচ্য-'গুরুর সঙ্গে ধর্মযাত্রায় যাচ্ছেন !! কালভে—সেকালে কী ছিলেন ?—

"সার্জনের ছুরিই ছিল [কালভের পক্ষে] একমাত্র নিরাময়ের অস্ত্র। অপেরা-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্মেন কালভে, বহু বৎসর ধরে ভয়ানক মৃত্যুর সম্ভাবনা যাঁর জীবনকে কালো করে রেখেছে—সার্জনের ছুরি থেকে তিনি ছিটকে বেরিয়েছেন নিজ স্বভাবের প্রচণ্ড আবেগের উষ্ণ শক্তিতে—আশ্রয় নিয়েছেন এবং পরিত্রাণ চাইছেন প্রাচ্যের রহস্যশক্তির কাছে। পালতোলা নৌকায় যাচ্ছেন স্মার্নায়। সুলতানের সামনে গাইতে পারেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি অতিক্রম করবেন তিনি। তারপর দীর্ঘ বিচিত্র যাত্রার শেষে পৌঁছবেন হিমালয়ের তুষাররাজ্যে। প্রত্যেক পর্যায়ের উপযোগী সাজপোশাক তাঁর সঙ্গেই আছে।"

পুনশ্চ :

"সার্জনের ছুরিকা থেকে পলাতকা মাদাম কালভে প্রাচ্যরহস্যের মধ্যে নিমজ্জিত হবার জন্য তাঁর অপেরার সকল চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এবং খ্রীস্টান-জগতের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন।

"কার্মেন ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মঞ্চমধ্যে বাসনার মহাদেবী, দক্ষিণ ফ্রান্সের উত্তপ্ত রক্ত এবং শিল্পীস্বভাবের তীব্র আবেগে আলোড়িত কালভে, শারীরিক যন্ত্রণা ও সম্ভাব্য মৃত্যুর আতঙ্ক তাঁকে পৃথিবীর সুদূর নানা স্থানে তাড়িত করে নিয়ে যাচ্ছে, গুপ্ত রহস্যবিদ্যার কাছে তিনি পরিত্রাণ চাইছেন, যে-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তাঁকে সার্জনের ছুরি ছাড়া অন্য কোনো বিধান দিতে সমর্থ নয়।

"কালভে আবেগ-কন্যা, রক্তমাংসের মানবী, বেপরোয়া বোহিসেবী, জিপসী-স্বভাব গায়িকা, যাঁতে বাসনা শুধু বাসনা আর উত্তেজনা, কার্মেনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—কারণ স্বয়ং কার্মেন। কিন্তু এখন আর বেপরোয়া নন তিনি। এখন ভাগ্যহত, জর্জরিত, আতঙ্কিত। জীবনের সকল উল্লাস এখন সার্জনের ছুরির চিন্তায় শিহরিত। তাঁর বিপুল প্রাণশক্তি, আত্মশাসনে অসামর্থ্য—তাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর প্রধান শত্রু। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন অস্ত্রোপচার ব্যাপারটিকে অকল্পনীয় ভীতির ঘোরবর্ণে তাঁর কাছে চিত্রিত করেছে।

"এই চমকপ্রদ অভিযানে তাঁর দিশারী, দার্শনিক, ও বন্ধু হলেন পণ্ডিত ও সুদর্শন হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি এই দেশে [আমেরিকায়] বিশ্বমেলার বছরে বক্তৃতা করে অনেককে স্বমতে এনেছিলেন।

"এই লেখা যখন পঠিত হবে তখন নিঃসন্দেহে আত্মনির্বাসিত গায়িকা-প্রধানা এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ শিক্ষক উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্মার্না থেকে জেরুজালেম যাবার জন্য মরুভূমির উপর দিয়ে চলেছেন। অবশ্যই ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের সর্ববিধ আয়োজন সেই সঙ্গে থাকবে, যা আধুনিক 'কুইন অব সেবা'-এর যোগ্য। বিচিত্র পরিকল্পনা এই রকমই।

"কালভে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে থাকবেন রাশিয়ার প্রিন্সেস ডেমিডফ, নিউইয়র্কের মিসেস ফ্রান্সিস এইচ লেগেট ও তাঁর বোন মিস ম্যাকলাউড। এর থেকে অদ্ভুত মনুষ্য-সমাবেশ সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ-নামক কাণ্ড, লেগেটদের উপর তাঁর প্রভাব, লেগেটরা কিভাবে প্রিন্সেস ডেমিডফের মতো সোসাইটিতে প্রচণ্ড প্রতিপত্তিশালিনী নারীর সংস্পর্শে এলেন তার কাহিনী, সেই সঙ্গে কালভের মতো সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণ—আধুনিক প্যারিসের এই কথাকাহিনীর ক্লাইম্যাক্সে আছে, উটের গলায় ঝোলানো ঘণ্টার শব্দ—একেবারে বালজাকের যোগ্য রচনা যেন।"

সত্যের বিচিত্র মূর্তি এবং ভাগ্যের পরিহাস। সাংবাদিকদের কাছে পাঠকই প্রভু। পাঠকের রুচির প্রয়োজনে এঁরা যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন প্রায় সর্বদাই। তাই এই বিকট অন্যায় কাজটি এঁরা বারে বারে করেছেন—গুপ্ত রহস্যবাদের প্রধান শত্রুকে গুপ্ত রহস্যবাদী বলে দায়িত্বহীন প্রচার। স্বামীজী গুপ্ত রহস্যবাদকে পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা কুসংস্কার মনে করতেন। "যে লোক টাকার পিছনে কেবল ছোটে সে ইতর ; কিন্তু যে লোক রহস্যবাদী গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের পিছনে ছোটে সে ডবল ইতর। ও-জিনিসটা নোংরা। কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁতে নেই"—স্বামীজী বলেছেন।

কালভেকে তাই স্বামীজী-প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলতে হয়েছিল—তিনি উত্তোলন করতেন চরিত্রের তেজে, পবিত্রতার শক্তিতে। শিশুর মতো পবিত্র মানুষটিকে নিয়েও নীচ কণ্ঠ কানাকানি করেছে—কালভে ঘৃণায় বেদনায় শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক বুদ্ধিজীবীর আমোদ ঘটে লঘু কৌতূহলে, কূট সন্দেহে। অবিশ্বাসের তারিয়ে-চাখা সুখে তৃপ্ত তারা। এই ভ্রমণে স্বামীজীর অন্যতম সঙ্গী ফরাসী সাহিত্যিক জুল বোয়া (যাঁর কিছু কথা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি)—স্বামীজীর প্রতি যাঁর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না, স্বামীজী যাঁর কাছে "এক দেহে মার্কাস অরেলিয়াস, এপিকটেটাস ও বুদ্ধ"—তিনিও বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্য কালভেকে উস্কানি দিয়েছিলেন, কেননা নিজের সাহিত্যিক স্বভাবে হয়ত বিশ্বাস করেছিলেন, উর্বশী উপস্থিত হলে 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয়

পদে তপস্যার ফল।' জ্যুল বোয়ার প্ররোচনায় কালভে চমকে শিউরে বলেছিলেন —"না না, বিবেকানন্দের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তাঁকে নমস্কার করি আমি।"

ব্যর্থ জ্যুল বোয়া স্বামীজীকে প্রণতি জানিয়েছেন কবিতায়—'এক ঋষির উদ্দেশে।'

"তোমার ললাটে অনন্ত জ্ঞানের এমনই দ্যুতি যে
ঈর্ষায় সরে যায় ভিনসি-র দেবদূতেরা,
নয়নে তোমার ধ্যানলীন পবিত্রতা, নির্বোধ যেখানে দ্যাখে শুধু উন্মত্ততা,
জীবনের কদর্যের স্বাদ নাওনি কখনো,
জনতার মধ্য দিয়ে পথ হাঁটো কিন্তু সংক্রামিত হওনা,
পাপের কল্পনা আনো শুধু পদানত করতে তাকে,
হে মোর দীক্ষাদাতা, তুমি ঘন সন্ধ্যার মধুরিমা,
সঞ্জীবনী ঘ্রাণের উত্তাপ, হে ভ্রাতঃ আমার আচার্য,
প্রত্যাদিষ্ট পুরুষসত্তম, শুদ্ধ আদর্শের বার্তাবহ,
ধন্য তুমি, নাও আমার কৃতজ্ঞ সত্তার নমস্কার,
কেননা তোমার আকাশভরা হৃদয় হতে,
তোমার অপূর্ব সঙ্গীত ও মহাবীর্যের উৎস থেকে
পেয়েছি শক্তি—ঘৃণা করতে সংসারকে, কিন্তু ভালবাসতে পৃথিবীকে।"

বেলুড়ে বিবেকানন্দকে দর্শনের পরে ইনি লিখেছেন :

"এই প্রায় কৃষ্ণবর্ণ মানুষটি ছয় হাজার বছর পূর্বের আর্যদের মতো পোশাকে আবৃত, আমার জগতের বহু দূরে জাত, ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন দেবতার পূজক—ইনিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।...ইনি এঁর প্রতিভা ও ভয়ঙ্কর উন্মাদনার শক্তিতে আমার কাছে মূর্ত করে তুলেছিলেন ভারতবর্ষকে—যা আমার স্বপ্নের পিতৃভূমি, চিরজাগ্রত আদর্শের স্বর্গোদ্যান।...এই হিন্দু নিজ জীবনকে আদর্শের মাপে নির্মাণ করেছেন, পরিব্রাজকের জীবন নিয়েছেন, মানুষ যেসব জিনিসে আনন্দিত ও গর্বিত সেই প্রেম, পরিবার, এমন-কি লেখক ও শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষাকেও পরিহার করেছেন। সন্ন্যাসী তিনি, তাঁর সম্বন্ধে এমার্সন বলতে পারতেন—ওই জীবনের প্রতিনিধি-পুরুষ তিনি। গৃহের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রথম যেকথা তিনি বললেন তা হলো : 'বন্ধু, এখন আমি স্বাধীন, মুক্ত। সবকিছু ছেড়েছি। টাকাগুলো শিকলের মতো ভার হয়ে ঝুলছিল—সব দিয়ে দিয়েছি। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের দরিদ্রতম মানুষ আমি। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভবন তৈরী হয়ে গেছে—তাঁর ভাবসন্ততিদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হয়েছে।"

এক সন্ন্যাসী, এক ঋষি এবং এক ধর্মযাজক…

একটু আগে উদ্ধৃত নিউইয়র্কের 'ওয়ার্লড্' পত্রিকার বিবরণে মাদাম কালভের সঙ্গে 'বিচিত্র তীর্থযাত্রায়' স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন বলে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে মিসেস লেগেট বা প্রিন্সেস ডেমিডফ বস্তুত ওই দলে ছিলেন না, অথচ সত্যই যাঁরা ছিলেন, যেমন ফরাসি সাহিত্যিক জুল বোয়া বা সমগ্র ইউরোপে বিখ্যাত ধর্মযাজক পিয়ের হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্নীর নাম করা হয় নি, অবশ্যই এই কারণে যে, তা করলে মজার সংবাদপত্রের মজাদারির অংশ কিছুটা ফিকে হয়ে যেত। বিবেকানন্দ ও হিয়াসান্থ, এই দুইজনের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনার মধ্যে আরও এক অনুপস্থিত ব্যক্তি প্রবেশ করে গিয়েছিলেন, সাহিত্যিক ও আচার্য-ঋষি বলে তখন যাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি—কাউন্ট লিও টলস্টয়। এই তিন বৃহৎ মানুষের জীবনদৃষ্টির ঐক্য ও পার্থক্য মানবসম্পর্কের উপর বিচিত্র রশ্মিপাত করেছে।

টলস্টয় সম্পর্কে বিবেকানন্দের মনোভাব কী ছিল সে-বিষয়ে রোমা রোলাঁ মিস ম্যাকলাউডকে প্রশ্ন করেছিলেন। মিস ম্যাকলাউড বিবেকানন্দ ও হিয়াসান্থের মধ্যে আলোচনাকালে টলস্টয়-প্রসঙ্গ শুনেছেন। এ-বিষয়ে তিনি মাদাম কালভের কাছ থেকে যাচাই করে নিয়ে রোলাঁকে যে-সংবাদ দেন তার মধ্যে টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' বই সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাবের উল্লেখ আছে। সেই সংক্ষিপ্ত সংবাদের মধ্যে অনেকখানি গভীর কথা ঘন আকারে বর্তমান। সে-প্রসঙ্গে আসার আগে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের এক রচনা থেকে দেখে নিতে পারি, সমকালের ইউরোপে পিয়ের হিয়াসান্থ কী ছিলেন। বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার মার্চ ১৯৭১ সংখ্যায় হিয়াসান্থের সাড়া-জাগানো জীবন বিষয়ে বেশ কিছু খবর দিয়েছেন।

চার্লস লয়জন রূপে হিয়াসান্থের জন্ম ১৮২৭ সালে, এক বিশিষ্ট পরিবারে। তাঁর কাকা শক্তিশালী লেখক। তাঁর পিতা লুইস লয়জনের হিসাবহারা উদারতার বিদিত খ্যাতি। অনুমান করা হয় ভিক্তর হ্যুগো তাঁর 'লা মিজারেবল' উপন্যাসে বিশপ মিরিয়েলের চরিত্র সম্ভবত ওঁর আদলেই তৈরি করেছিলেন। চার্লস লয়জন যৌবনে কঠোরতপা 'কারমেলাইট ব্রাদারহুড্'-এ যোগ দিয়ে পিয়ের হিয়াসান্থ নাম গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ সালে তিনি প্যারিসের নোতরদাম ক্যাথিড্রলের প্রচারক পদে নিযুক্ত হন। অসাধারণ বাগ্মিতার শক্তি, সেইসঙ্গে ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে সমসাময়িক সমস্যা ও প্রয়োজনাদিকে টেনে আনার প্রবণতা —এই সব কারণে অচিরে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নারীর সামাজিক মর্যাদা, শ্রমিকের দুর্দশা, দরিদ্রের উন্নয়ন, পারিবারিক জীবনে উন্নত নীতি, ইত্যাদির উপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। সর্বোপরি কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন রোমান ক্যাথলিক চার্চ সম্বন্ধে—যা অর্থসম্পদের বেষ্টনীতে নিজেকে আবদ্ধ রেখে ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তাঁর এই জেহাদে চার্চ-কর্তাদের টনক নড়ে। তাঁরা ১৮৬৬ সালে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে সতর্ক করেন ;

তিন বছর পরে স্বয়ং পোপ তাঁকে অনুরোধ ও তিরস্কার দুইই করেন। হিয়াসান্থ কিন্তু অনমনীয়। ১৮৬৯ সালে ভাটিকান কাউন্সিলে 'পোপের অভ্রান্ততা' বিষয়ক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। তা এমন-কি ক্যাথলিক জগতেও হৈ-চৈ সৃষ্টি করে। হিয়াসান্থ ওই মতের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সংঘ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। রোমান চার্চ তাঁকে বহিষ্কারও করে। তিনি মনে করতে থাকেন, তিনিই খ্রীস্টের খাঁটি মত প্রচার করছেন।

হিয়াসান্থের মনোজগতে ইতিমধ্যে দিগ্-প্রদর্শক নব তারকার উদয় হয়েছে। ১৮৬৮ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এমিলি মেরিম্যান নামক এক পুত্রবতী সদ্য-বিধবা আমেরিক মহিলার। মেরিম্যান ছিলেন প্রোটেস্টান্ট, বয়স ৩৫। "তপস্বী হিয়াসান্থের" বয়স ৪১। মেরিম্যান হিয়াসান্থের কাছে আধ্যাত্মিক আশ্রয় চেয়ে তা পেলেন, ক্যাথলিক মত নিলেন। অপরদিকে হিয়াসান্থও উক্ত মহিলার মধ্যে পেলেন প্রাণের আরাম। শেষপর্যন্ত কে কাকে সত্যকার প্রভাবিত করলেন তা প্রশ্নের বিষয়। হিয়াসান্থের জীবনীকার অ্যালবার্ট হাউটিন বলেছেন, বস্তুতপক্ষে শিষ্যাই ধর্মান্তরিত করেছিলেন গুরুকে। হিয়াসান্থ ১৮৭২ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে মেরিম্যানকে বিয়ে করেন। তিনি তখন হলেন ফাদার লয়জন। (এর পরে তিনি এই নামেই উল্লিখিত হবেন)। মেরিম্যান নিজেকে বিশেষরকম ধর্মপ্রেরণায় চালিত চরিত্ররূপে কল্পনা করেছিলেন। পত্নীর দ্বারা অনুপ্রাণিত লয়জন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় পত্নীকে 'প্রত্যাদিষ্ট নারী' রূপেই দেখেছেন। ১৮৭৩ সালে এঁদের পুত্রসন্তান হয়। সন্তানটির মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া দেখতে ব্যাকুল দম্পতি তার নাম দিয়েছিলেন পল এমানুয়েল। সে আশার সমাধি ঘটে—পুত্র ধর্মপ্রচারক হিসাবে নয়, নাট্যকার রূপেই সাফল্য অর্জন করেন।

স্বামী সম্বন্ধে মেরিম্যানের আশাও ফলপ্রসূ হয় নি—লয়জন ধর্মজগতে বৈপ্লবিক শক্তি হয়ে উঠতে পারেন নি। তবু পত্নীর নাছোড় স্বপ্নের তাগিদে লয়জনকে বৃদ্ধ বয়সে ছুটতে হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে—কেননা ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলমান, এই তিন সেমেটিক ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের মেসায়া তাঁর না হলেই নয়! "পৃথিবীকে রক্ষা করতেই হবে"—মেরিম্যানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—আর সেই মহৎ কাজ করবেন তিনি ও তাঁর স্বামী। ১৯০০ সালে তেমনই এক উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক ফাদার লয়জনের কনস্টানটিনোপল যাত্রা—সেই যাত্রায় তিনি স্বামীজীর সঙ্গী।

মেরিম্যান মারা যান ১৯০৯ সালে; লয়জন ১৯১২ সালে, যখন তাঁর বয়স ৮৫।

'পরিব্রাজক' বইয়ে স্বামীজী পেয়র হিয়াসান্থের যে-বর্ণনা করেছেন তাতে দেখা যায়, সন্ন্যাস আদর্শের মহিমা ঘোষণা করেও, বিচ্যুতির ক্ষেত্রকে তিনি সস্নেহ সহিষ্ণুতায় দর্শন করতে চেয়েছেন। কঠোর তপস্বী হিয়াসান্থের ব্রত-ভঙ্গের কাহিনী লিখেছেন কৌতুক ও বিষাদ মিশিয়ে।

স্বামীজী লিখেছেন:

"কনস্টানটিনোপল পর্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি—পেয়র হিয়াসান্থ এবং তাঁর সহধর্মিণী। পেয়র (অর্থাৎ পিতা) হিয়াসান্থ ছিলেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক কঠোর তপস্বি-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতাগুণে এবং তপস্যার প্রভাবে ফরাসি দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এঁর অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসি ভাষার প্রশংসা করতেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। [বিদ্যাত্মানন্দের অনুমান, হ্যুগো সম্ভবত এঁর কাকার রচনার প্রশংসাকারী ছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁর অনুমানই]। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ একজন আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে তাকে করে ফেললেন বে—মহা হুলস্থূল পড়ে গেল ; অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ করলে। শুধু-পা, আলখাল্লা-পরা তপস্বি-বেশ ফেলে, পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট কোট বুট পরে হলেন—মঁসিয়ু লয়জন্। আমি কিন্তু তাঁকে পূর্বের নামেই ডাকি। সে অনেক দিনের কথা, ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম। প্রোটেস্টান্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো।"

কিন্তু স্বামীজী কি সত্যই হিয়াসান্থের প্রেরণাদাত্রী নারী-মোহিনী সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূর করতে পেরেছিলেন ?

"পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে বললেন, 'তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাকো (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না), কিন্তু রোমান চার্চ ত্যাগ করো না।' কিন্তু লয়জন-গেহিনী তাঁকে টেনে-হিচঁড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হলো। এখন অতি স্থবির লয়জন্ জেরুসালেমে চলেছেন—ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয় সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধহয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন্-বা দ্বিতীয় মার্টিন লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে-বা ফেলে দেয় ভূমধ্যসাগরে! সে সব তো কিছুই হলো না ; হলো—ফরাসিরা বলে, 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ'। কিন্তু মাদাম লয়জনের—সে নানা দিবাস্বপ্ন চলেছে !!"

উক্ত মহিলাও স্বামীজীকে সুচক্ষে দেখেন নি—কারণ স্বামীজী যে, কথাবার্তার মধ্যে ফাদার লয়জনের মনের কাছে এনে দিচ্ছিলেন তাঁর হিয়াসান্থ-জীবনের হারানো স্বপ্ন :

"বৃদ্ধ লয়জন অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধহয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ বৈরাগ্য সন্ন্যাসের চর্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে—আর গিন্নির বোধহয় গা কস্‌-কস্‌ করে। তার উপর মেয়ে-মদ্দ সমস্ত ফরাসিরা যত দোষ গিন্নীর উপর ফেলে; বলে, 'ও মাগী আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট করে দিয়েছে' !! গিন্নির কিছু বিপদ বই-কি—আবার বাস হচ্ছে প্যারিসে, ক্যাথলিকদের দেশে। বে-করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ-ছেলে নিয়ে ধর্মপ্রচার এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁঝ আছে কিনা? একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, তুমি বড় খারাপ।' সে অভিনেত্রী ঝট্‌ জবাব দিলে, 'আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি, আইনমতো বে না-হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে !! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিল, তা না-হয় সাধুর সেবাদাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে করে, গৃহস্থ করে, তাকে উৎসন্ন কেন দিলে' ?"

ফাদার লয়জনের আলিঙ্গনে পেয়র হিয়াসান্থের পুরো মরণ ঘটে নি। পূর্বোক্ত ভ্রমণকালে অন্যতম সঙ্গী মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে শুনে রোমা রোলাঁ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন:

"ফাদার লয়জন সর্বদাই কিছুটা কুণ্ঠিত বিধ্বস্ত থাকতেন। সর্বদাই অস্বস্তিতে। সঠিক কাজ করেছেন কিনা সে-বিষয়ে যেন নিশ্চয়তা নেই। সমর্থন চেয়ে বারবার বলতেন, 'আমি কি ঠিক করি নি? যদি আমার পুত্র বিশেষ রকম পৃথক চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি সঠিক কাজ করেছি, এটা কি প্রমাণ হয়ে যাবে না? আপনি কি বলেন?"

স্বামীজী সবই শুনেছেন, জেনেছেন। ফাদার লয়জনের সম্পর্কে তাঁর শেষ কথাগুলিতে মানবচরিত্রজ্ঞান ও নিরপেক্ষ বিচার—এবং করুণা—সবই আছে:

"যাক, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা—বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক আর শান্ত; সে খুশি আছে তার মাগ-ছেলে নিয়ে; দেশসুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নিটি একটু শান্ত হলেই বোধহয় সব মিটে যায়। তবে কি জানো ভায়া, আমি দেখছি যে, পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার ও বিচার করবার রাস্তা আলাদা।

পুরুষ একদিক দিয়ে বুঝবে, মেয়েমানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে। পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়েমানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।"

তবু সন্ন্যাসীর পতন দেখে সন্ন্যাসীর দীর্ঘশ্বাস কি বিবেকানন্দ দমন করতে পেরেছেন? কালভের চোখে সেই একান্ত বেদনা ধরা পড়েছিল:

"পিয়ের হিয়াসান্থের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজীর চোখে-মুখে সব সময়েই কী-যে বেদনার, কী করুণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠত—এবং যে-হতভাগিনী স্ত্রী নিজের গর্ব ও অহঙ্কারের জন্য তাঁকে ব্রতচ্যুত করেছিলেন তাঁর প্রতি তাঁর কী গোপন অবজ্ঞা ছিল—ভুলতে পারা যায় না।"

বিবেকানন্দ ও লয়জনের মধ্যে আলোচনাকালে মাঝে-মধ্যে মাদাম কালভে উপস্থিত থাকতেন। লয়জনের ডায়েরিতে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার একাধিক উল্লেখ আছে। স্বামীজীর সামাজিক মত তিনি সমাদরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ৩১ অক্টোবর ১৯০০ তারিখের ডায়েরিতে লিখেছেন: "স্বামীজী ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের বিষয়ে কঠোর কিন্তু সঙ্গত কঠিন বিচার জানালেন!" স্বামীজী বলেছিলেন:

"ইউরোপী ও আমেরিকরা হলো পুরো বেনিয়ার জাত। আমেরিকরা বিশ্বাস করে শুধু ডলার-ভগবানে। এশিয়াবাসীর হৃদয় ইংরাজ অপেক্ষা রুশদের দিকেই বেশি ঝুঁকে আছে। রুশরা এশিয়াবাসী।...গত কয়েকশো বছর আগে পৃথিবীর কাছে ইউরোপের অস্তিত্বই ছিল না। বাষ্প আবিষ্কার করতে না পারলে এখনও তারা একই অবস্থায় থাকত। তার আগে পর্যন্ত তারা ভূমণ্ডলের এক বর্বর কোণের অধিবাসী। আমেরিকার চার্চে পর্যন্ত সাদা কালোর জাতিভেদ —অথচ চার্চের কাজ নাকি সকলকে মিলিত করা। ইসলাম মানুষকে এক করেছে। জাতি-সমন্বয়ের বিচারে কনস্টানটিনোপলের পথে বা মসজিদে যা দেখা যায় তা সত্যই সুন্দর। তুর্কীরা মানবসমাজের ভ্রাতৃত্বকে কার্যকর করতে সচেষ্ট। ভারতে আছে চার জাতি—পুরোহিত, যোদ্ধা, বণিক ও শ্রমিক—ইতিহাসের চার পর্যায়ের স্মারক। ইউরোপ ও আমেরিকা এখন সবচেয়ে ঘৃণ্য বণিক জাতির অন্তর্গত—যারা কোনো কিছু উৎপাদন করে না, চুরি-জোচ্চুরি আর মিথ্যাকথা বেচে খায়। এদের সরিয়ে শ্রমজীবীর রাজত্ব আসবে, তার চেহারা সম্ভবত ভয়ঙ্কর। তারপর আসবে সামাজিক সমন্বয়। চারি জাতির মিশ্রণ ঘটবে তখন।"

ফাদার লয়জন তাঁর ডায়েরিতে স্বামীজীর আরও অনেক কথা উদ্ধৃত

করেছেন, যাদের মধ্যে তাঁর পছন্দসই ছিল স্বামীজীর নিম্নের কথাগুলি :

"জাতিসমূহের মিশ্রণের দ্বারা ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে এক বিশ্বধর্মের, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সকল শক্তিকে মিলিত করবে প্রাচীন জাতিসমূহের ভাব-বাসনার সঙ্গে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তা ঘটবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যদিও পার্থক্য প্রায় নেই তবু সংকীর্ণ দেশপ্রেমের জন্য তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত—সেই সংকীর্ণ দেশপ্রেমই বিভিন্ন ভাব ও জাতির মিশ্রণে বাধা দিচ্ছে। ধর্মের সার্বভৌমিকতায় এই ভেদ নেই। ওই প্রকার ভাবী মিলন বা মিশ্রণ কি বিশ্বব্যাপী কোনো বিরাট সাম্রাজ্যের দ্বারা সংগঠিত হবে—বৃটিশ সাম্রাজ্য ? চীন সাম্রাজ্য ? কিংবা খুবই সম্ভব চীন-রুশ সাম্রাজ্য ?"

আগেই বলেছি, স্বামীজীর সঙ্গে ফাদার লয়জনের কথাবার্তার মধ্যে টলস্টয়ের প্রসঙ্গ এসেছিল। তা আসতেই পারে, কারণ ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে টলস্টয়ের 'রেজারেকসন' উপন্যাসটি চাঞ্চল্যকর—বলা চলে বৈপ্লবিক। উপন্যাসটির সম্বন্ধে স্বামীজী ও লয়জনের মধ্যে ধারণা-ভেদ ঘটেছিল, একথা কালভে-সূত্রে জেনেছি।

স্বামীজী যখন খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে টলস্টয়ের ওই উপন্যাসটির বিষয়ে কনস্টান্টিনোপলে থাকাকালে কথা বলছিলেন তখন ফাদার লয়জন তাতে সায় দেন নি। কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিলেন : "টলস্টয়ের ধর্মে বনিয়াদী বস্তু নেই।"

স্বামীজী নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর মধুরভাবে বলেছিলেন, "টলস্টয়ের ধর্ম সম্বন্ধে বলবার মতো বনিয়াদ কি আমাদের আছে ?"

কালভে-প্রদত্ত এই কথাগুলি রোলাঁ তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন।

কথাগুলি আপাতত আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে মানবচিন্তার বৃহৎ ইতিহাস।

১৯০০ সালে যখন এইসব আলোচনা হচ্ছে তখন বিবেকানন্দের বয়স ৩৭, লয়জনের ৭৩, এবং টলস্টয়ের ৭২।

বিবেকানন্দ ১৯০০ সালেই 'রেজারেকশন' পড়েছেন ধরে নিতে পারি। বইটি টলস্টয় দশ বছরের বেশি সময় ধরে (১৮৮৯-১৮৯৯) লেখেন। ১৮৯৯-এ প্রকাশিত হওয়া-মাত্র তা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে। "১৮৯৯-১৯০০ সালের মধ্যে ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং আরও বহু দেশে উপন্যাসটির অসংখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়।" বইটির রচনাকালের মাঝামাঝি সময়ে, ১৮৯৬ সালে, টলস্টয় বিবেকানন্দের রাজযোগ পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন :

"অসাধারণ এই বই। এর থেকে বহু শিক্ষা আমি নিয়েছি। এই গ্রন্থে মানুষের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে যৈসব যথার্থ, সমুচ্চ এবং সুস্পষ্ট বোধের কথা রয়েছে, মানবসমাজ প্রায়শ তার থেকে পশ্চাদ্‌গামী হয়েছে, কিন্তু কদাপি তাকে অতিক্রম করতে পারে নি।"

টলস্টয় এই সময়ে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার ভাবে ও রসে কতখানি নিমজ্জিত ছিলেন তার আলোচনা অন্যত্র করেছি। ('সমকালীন', ২য়—৩০-৩৮; ৭ম—২১-৩২)। বিবেকানন্দ টলস্টয়ের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বের প্রধান চিন্তানায়কদের একজন এবং "বর্তমানকালের সর্বপ্রধান ভারতীয় চিন্তাবিদ্।"

১৯০০ সালের আগে লিও টলস্টয় জীবনের দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে এসেছেন। সমকালের পৃথিবীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতে তিনি সর্বাধিক খ্যাত পুরুষ। অভিজাত বংশে জন্ম; যৌবনে চরম উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, জয়াড়ি, কদর্য রোগাক্রান্ত এবং অবৈধ সন্তানের জনক; আচরণে রূঢ়, অসহিষ্ণু, অহঙ্কারী, আত্মস্বতন্ত্র, কটুভাষী, ধৈর্যহীন এবং অবিরাম স্ব-বিরোধী; চৌত্রিশ বৎসর বয়সে আঠারো বৎসরের এক কন্যাকে বিবাহের পরে ১৩টি সন্তানের জনক; বৃত্তিতে গোড়ার দিকে সৈনিক, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; পরে বিরাট ভূসম্পত্তি অর্জনকারী; অশ্বারোহণে ও শিকারে আসক্ত; পত্নীর প্রতি ভালবাসা থাকলেও উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, অবিরাম কুশ্রী কলহ। এই টলস্টয়। এবং এই টলস্টয়— 'অ্যানা কারেনিনা', 'ওয়ার অ্যান্ড পীস্' ইত্যাদি কয়েকটি সর্বোত্তম উপন্যাসের স্রষ্টা হিসাবে বিশ্ববন্দিত।

পঞ্চাশ বছরে পা দিয়ে টলস্টয় জীবনের অপর মুখ দেখলেন। যে-মৃত্যু-ভয় তাঁর শৈশবসঙ্গী, তা এখন করাল মুখ বাড়িয়ে তাঁকে যেন গ্রাস করতে চাইল। অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল জীবনগতি। ছুরির ফলার মতো কয়েকটি প্রশ্ন বুক চিরে জাগল—এ জীবন কেন? কিসের জন্য? এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমার পায়ের তলায় যে জমি নেই। কী সর্বনাশ। আমার এই সুখ সম্পদ গৌরব এবং শারীরিক সামর্থ্যে ভরা জীবন—এ সবকিছুই তাহলে অন্য কোনো একজনের বোকাটে তামাশা ভিন্ন আর কিছু নয়!!!

কাউন্ট টলস্টয়ের মধ্যে জন্ম হলো ঋষি টলস্টয়ের।

টলস্টয় বাল্যকাল থেকে ধর্মবিশ্বাসহীন। এখন খ্রীস্টধর্মে আস্থা এল। গোড়ায় রাশিয়ার 'অর্থডক্স গ্রীক চার্চ'-এর দিকে ঝোঁকেন। সেখানে কথা ও কাজের ব্যবধান দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। অভিজ্ঞতার ফলে অনুভব করতে থাকেন, জনসাধারণের মধ্যে কুসংস্কার থাকলেও রয়েছে খাঁটি বিশ্বাস, যা জীবনকে অর্থদান করে, এবং দান করে জীবনবহনের শক্তি। খ্রীস্টীয় 'স্যাক্রামেণ্ট'কে অগ্রাহ্য করলেন, যেহেতু তা সত্যকে ঢেকে রাখে। সিদ্ধান্ত করলেন, খ্রীস্টান জগতের শাস্ত্রবচনের উপরে নির্ভর করার চেয়ে অপমানকর বস্তু আর নেই। সরাসরি উপস্থিত হতে হবে খ্রীস্টের কাছে, বহন করতে হবে তাঁর বাণীর ক্রুশ। পাপের প্রতিরোধ করো না, হিংসা ত্যাগ করো, ঈশ্বরের নামে শপথ করো না, শত্রুকে ভালবাসো, অভিশাপ যে দেয় তাকে আশীর্বাদ করো।

সত্যকে নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত ক'রে, অভিজাত ধনী মানী টলস্টয় নিজের হাতে জুতো তৈরি করতে, কাঠ কাটতে, ক্ষেতে

কাজ করতে, শুরু করলেন। শিকার মদ ধূমপান ছাড়লেন। অর্থ পাপ—এই জ্ঞানে নিজের সম্পত্তি জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে গেলেন—তখন কিন্তু পত্নী ও পুত্ররা বেঁকে দাঁড়ালেন। টলস্টয় অগত্যা তাঁর সম্পত্তি পত্নী ও পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

নবমত গ্রহণের পরে টলস্টয় ৩০ বছর বেঁচেছিলেন। এই পর্বে লেখক, নীতিবাদী, আচার্য, ঋষি হিসাবে তাঁর বিশ্ব-পরিচয়। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে শান্তি পান নি। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে অর্থসম্পদের ব্যাপারে কঠিন সংঘাত তো ছিলই, সেইসঙ্গে যন্ত্রণা পেয়েছেন নিজের ভক্তদের কাছ থেকেও, যারা তাঁকে তাঁর বাণীর পূর্ণ প্রতিভূ দেখার উদগ্র বাসনায় কেবলই তাগিদ দিয়ে গেছে—সকল স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ক'রে একেবারে সর্বহারা হয়ে পড়তে—আর সেই নাটকীয় ত্যাগ দেখতে না পেয়ে ভণ্ড বলে নিষ্ঠুর গঞ্জনা দিয়েছে। "নিজ বাণীর ক্রীতদাস" তখন তিনি, সামান্য গাফিলতিতে ভক্ত-প্রভুদের তিরস্কারের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত।

'রেজারেকশন' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আক্ষরিকভাবে খ্রীস্টের 'পুনরুত্থান' নয়, মানুষের পুনরুত্থান—কিংবা মানুষের রূপান্তরিত জীবনের মধ্যে খ্রীস্টের পুনরুত্থান। উপন্যাসে দেখি, অভিজাত সমাজের একটি মানুষ (প্রিন্স নেখ্‌লিউদভ) এক নীচু পর্যায়ের নারীর (মাস্‌লভা) সম্বন্ধে ঘোর অন্যায় ক'রে পরে তীব্র আত্মগ্লানি বোধ করেন; সেজন্য পুরনো জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে, নব জীবনবোধে উদ্দীপিত হয়ে, জনসাধারণের সেবায় নেমে পড়েন। খ্রীস্টের পুনরুত্থান এই মানুষটির মধ্যে হয়েছিল। জীবনের পিচ্ছিল পথ থেকে মাস্‌লভাও ফিরে এসেছিল। উপন্যাসে জার-শাসিত রাশিয়ার নিষ্ঠুর শোষণ, অগণিত মানুষের কারাবাস, নির্বাসন, সেখানকার বীভৎস অবস্থা, ধর্মের নামে পাদরীকুলের ভণ্ডামী, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিকণা—এ সকলই আছে। আর আছে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে খ্রীস্টের মূল বাণীর কাছে উপনীত হওয়ার প্রয়াস।

একদা ক্যাথলিক সন্ন্যাসী পিয়ের হিয়াসান্থ, ফাদার লয়জন হয়ে, বিয়ে ক'রে, নতুন পথে চলার কালেও খ্রীস্টান শাস্ত্রবিধির নিগড় পুরো কাটাতে পারেন নি, তাই তাঁর কাছে শাস্ত্রবিধির বাইরে সাক্ষাৎ খ্রীস্টলাভের জন্য টলস্টয়ের প্রয়াস "বনিয়াদহীন।" অপরপক্ষে বিবেকানন্দ ধর্মধ্বজীদের জমানো জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভে সংগ্রামী—স্বতঃই তিনি টলস্টয়ের বইটিকে পছন্দ করেছিলেন—এবং লয়জনের এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে হেসেছিলেন—ক্যাথলিক শাস্ত্রবিধির বনিয়াদকে যিনি ভাঙতে ব্যস্ত তিনিই কিনা অর্ধপথে থেমে টলস্টয়ের মতে বনিয়াদ নেই বলে অভিযোগকাতর !!

'রেজারেকশন' উপন্যাসের পরতে-পরতে যীশুখ্রীস্ট ও খ্রীস্টধর্মের কথা। বইটির শেষ অধ্যায়টি তো খ্রীস্টের সুসমাচারবাণীর নির্বাচিত সংকলন—এবং

উপন্যাসের নায়ক প্রিন্স নেখ্‌লিউদভ তাঁর নবজীবনে কিভাবে ওই বাণীকে গ্রহণ করেছেন তারই বিবরণ।

আমি অল্প কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খ্রীস্টধর্মের সুপ্রচলিত অনুষ্ঠান—প্রার্থনাকালে রুটি ও মদ্য গ্রহণ—যা খ্রীস্টের মাংস ও রক্তের প্রতীক। প্রার্থনাভাষণে যাজকরা নানা অলৌকিক ঘটনার কথাও বলেন। টলস্টয় এই 'রুটি ও মদ্য' এবং অলৌকিক কাণ্ডকারখানাকে অত্যন্ত বিতৃষ্ণার চোখে দেখতেন—উপন্যাসে ও-সবের ব্যঙ্গাত্মক ছবিও এঁকেছেন। যাজক কিভাবে থালায় রাখা রুটিকে টুকরো করে কাটেন, প্রার্থনা-মন্ত্র বলতে-বলতে মদের পাত্রে রুটির টুকরো ফেলেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রার্থনায় একই কথা বারবার বলার সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বর কী অদ্ভুতরকম বিকৃত শোনায়, কত হাস্যকর দেখায় তাঁর অঙ্গভঙ্গি—তার বিস্তৃত বর্ণনা পাই। "সমগ্র প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের মূল ব্যাপারটিই কল্পিত বা আরোপিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।" টলস্টয়ের ঘৃণার ছবি এই :

"…পুরোহিত রুটির টুকরোগুলির মাঝখানে রাখা একটা রুটি চারটি খণ্ডে কেটে নিয়ে একটি খণ্ড প্রথমে মদের পাত্রে ডোবালেন, তারপর সেই মদে ভেজা খণ্ডটি মুখে পুরে দিলেন। তার অর্থ হলো, তিনি ঈশ্বরের এক খণ্ড মাংসের সঙ্গে পান করলেন এক ঢোক ঈশ্বরের রক্ত।…পুরোহিত [উপস্থিত] শিশুদের প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞাসা করে সন্তর্পণে একটি চামচে করে এক-এক খণ্ড মদে-সিক্ত রুটির টুকরো তাদের মুখের ভিতরে পুরে দিলেন।… পুরোহিতের যাজক-সহকারী প্রত্যেকটি শিশুর মুখ মুছতে-মুছতে প্রফুল্ল কণ্ঠে গান গাইতে-গাইতে বললেন, তারা সবাই খাচ্ছে ঈশ্বরের মাংস, পান করছে ঈশ্বরের রক্ত। অতঃপর পুরোহিত পাত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন পার্টিশনের পিছনে এবং স্বয়ং ঈশ্বরের অবশিষ্ট রক্ত পান করলেন, অবশিষ্ট মাংস আহার করলেন। সযত্নে গোঁপ চেটে মুখ ও পাত্র মুছে নিলেন।"

মূল উপাসনা-অনুষ্ঠানের পরে পুরোহিত "হতভাগ্য জেল-বন্দীদের প্রতি অনুকম্পাবশত" এক বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান করেছিলেন। তখন "অদ্ভুত বিকৃত কণ্ঠে" গান গেয়েছেন, এবং দীর্ঘ প্রার্থনার মধ্যে যখনই 'যীশু' নামটি উচ্চারণ করেছেন তখনই "আবেগে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ" হয়েছে। তারপর যখন প্রার্থনা শেষ হল তখন—

"কয়েদীরা নতজানু হয়, উঠে দাঁড়ায়, মাথায় যতটুকু চুল অবশিষ্ট ছিল ঝাঁকানি দিয়ে উপরদিকে তুলে নেয়, ওদের রোগা-রোগা পায়ে শিকল ও বেড়ি ঘষা খায়, ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে ওঠে।"

ব্যঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়ে নয় শুধু, টলস্টয় সরাসরি ধিক্কারও জানিয়েছেন :

"এই ধর্মোপাসনায় উপস্থিত ছিলেন যাঁরা—পুরোহিত, ইনস্‌পেক্টর থেকে শুরু করে মাস্‌লভা পর্যন্ত কারোরই খেয়াল হলো না যে, যে-যীশুর নাম

পুরোহিত বারবার উচ্চারণ করলেন, অদ্ভুত-অদ্ভুত সম্ভাষণে যাঁর বন্দনা করলেন, সেই যীশু স্বয়ং কিন্তু তাঁর ভজনালয়ে যা-কিছু অনুষ্ঠান আজ হল সবই বারণ করে গিয়েছিলেন।...স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলে গিয়েছিলেন, মানুষ যেন মানুষকে প্রভু না বলে, যেন কেউ মন্দিরে উপাসনা না করে, মন্দির নির্মাণ না করে। বলেছিলেন, মন্দির ভেঙে ফেলার জন্যই তাঁর আসা, কারণ তিনি চেয়েছিলেন, সবাই নির্জনে সত্যভাবে নিজেদের নিভৃত অন্তরে পরমেশ্বরের পুজা-বন্দনাদি করে। আর যেটা তিনি বারণ করে গিয়েছিলেন তা হলো এই যে, মানুষ যেন মানুষের বিচার করতে না বসে, যেন কেউ কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ না করে, অত্যাচার উৎপীড়ন না করে, প্রাণহরণ না করে।...বলেছিলেন, যেসব মানুষ মানুষের হাতে বন্দী তাদের বন্ধনদশা ঘুচিয়ে দিতেই তাঁর আগমন।

"উপস্থিতবর্গের মধ্যে কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝল না যে, খ্রীস্টের নামে এই যেসব অনুষ্ঠান হলো, তার সবকিছুই তাঁর প্রতি চরম ধৃষ্টতাপ্রদর্শন, পরিহাস। কারো মনে এ-উপলব্ধি জাগল না যে, মিনে-করা পদকখচিত সোনার পাতে মোড়া যে-ক্রুশখানি চুম্বনের জন্য পুরোহিত সকলের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি আর কিছু নয়—এই গির্জাঘরে যা-যা অনুষ্ঠিত হলো তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে খ্রীস্ট যে-ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করেছিলেন—তারই প্রতীক। কারো মাথায় এল না, পুরোহিত যখন কল্পনা করলেন, রুটি আর মদের মধ্যে তিনি খ্রীস্টের রক্তমাংস ভক্ষণ করছেন তখন সত্যই তিনি খ্রীস্টের রক্তমাংস ভক্ষণ করছিলেন—তবে রুটির টুকরো আর মদের মধ্যে নয়—তার অর্থ এই যে, তিনি অসত্য ও কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে ফেললেন 'সুকুমারমতি শিশুদের', যাদের সঙ্গে যীশু নিজেকে একাত্ম বলে মনে করতেন।"

গ্রন্থের অন্যত্রও যাজকদের সাজানো চোখের জল, চাকরির খাতিরে ধর্মের ব্যবসায়, কিংবা লোকহিতের প্রয়োজনে অল্পস্বল্প ছলনার আশ্রয় নিতে প্রস্তুত এমন কিছু উপকারী মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনার অনেক কথা আছে। এক বিচিত্র নিষ্ঠুরতার কথাও পাই। কিছু সরল কৃষক যখন একত্র হয়ে খ্রীস্টের সুসমাচার পাঠ করার ব্যবস্থা করে তখন তাদের সশ্রম কারাদণ্ড বা নির্বাসন দেওয়া হয়, কেননা সুসমাচার পড়বার সময়ে হয়ত কেউ চার্চের অনুশাসন-মাফিক নয় এমন ভাবে খ্রীস্টবাণীর ব্যাখ্যাও তো করে বসতে পারে!!

মুক্ত ধর্মের একটি মানুষের চমৎকার কথাচিত্র উপন্যাসে পাই—একটু অদল-বদল করলে তা ধর্মগণ্ডীর বাইরে অবস্থিত কিন্তু নিত্যধর্মে স্থিত কোনো বৈদান্তিক বা বাউল-সন্ন্যাসীর ছবি হয়ে উঠতে পারে।—

> নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়ে ছিল নৌকার ধার ঘেঁষে; দেখছিল প্রশস্ত খরস্রোতা নদীটির দিকে।...
>
> বিশাল কাঁসার ঘণ্টার অনুনাদ ও কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ শহর থেকে নদীর বুকের উপর ভেসে আসছে। নেখ্‌লিউদভের গাড়োয়ান ও অন্যান্য

যাত্রীরা, যারা নেখ্‌লিউদভের ধারে-কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই তারা টুপি খুলে বুকের কাছে ক্রুশচিহ্ন আঁকল—কেবল একটি বেঁটেখাটো উসকো-খুসকো চেহারার বুড়ো ছাড়া। এ লোকটিও রেলিঙের ধারে সকলের চেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এতক্ষণ নেখ্‌লিউদভ একে লক্ষ্য করেনি। বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে রইল নেখ্‌লিউদভের দিকে। ওর পরনে চাষীদের তালিমারা লম্বা কোর্তা, বনাতের প্যান্ট, এবং পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া তালিমারা একজোড়া জুতো। ওর পিঠে একটা ছোট থলে, মাথায় উঁচু-দেখতে একটি জীর্ণ পুরাতন লোমের টুপি।

নেখ্‌লিউদভের গাড়োয়ান টুপিটা মাথায় পরে, ঠিক করতে-করতে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "প্রার্থনা করো না কেন, বুড়ো ? তোমার বুঝি দীক্ষা হয়নি ?"

ছেঁড়াখোড়া জামাকাপড়-পরা বুড়োটি চট ক'রে ঝগড়াটে সুরে দৃঢ়-ভাবে প্রত্যেকটি কথা পৃথকভাবে উচ্চারণ করে প্রশ্ন করল, "প্রার্থনা জানাব কাকে ?"

"কাকে আবার ? ভগবানকে," বিদ্রূপের সুরে গাড়োয়ান বলল।

"একটিবার দেখিয়ে দাও দিকি কোথায় আছেন তোমার এই ভগবান ?"

বুড়োর চোখে-মুখে এমন একটা দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের ছাপ ছিল যে, গাড়োয়ানের বুঝতে বেগ পেতে হল না সে শক্ত মানুষের পাল্লায় পড়েছে। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে, কিন্তু ভাবটা চেপেই রাখল, যে-সমস্ত লোক ওদের কথাবার্তা শুনছিল তাদের সামনে মাথা কাটা যাচ্ছে ভেবে চুপচাপ থাকাটাও সমীচীন বোধ করল না। তাই ঝট্‌পট্‌ জবাব দিল, "কোথায় থাকেন আবার ? স্বর্গে।"

"তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি ?"

"যাই আর না-যাই, সবাই জানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।"

বুড়োও কঠিন ভ্রূকুটি করে আগের মতোই দ্রুতোচ্চারণে বলল, "কেউই ভগবানকে কোথাও দেখেনি। ভগবান থেকে জাত তাঁর একমাত্র সন্তান, যিনি পিতার অন্তরঙ্গ, তিনিই তাঁর পিতার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন।"

গাড়োয়ান তার চাবুকের হাতলটা কোমরবন্ধে গুঁজতে-গুঁজতে, একটি ঘোড়ার সাজ ঠিক করতে-করতে বলল, "বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি খ্রীস্টান নও, তুমি হলে ছিদ্রপূজারী, শূন্য ফুটোর কাছে প্রার্থনা জানাও।"

কে একজন হেসে উঠল।

এক প্রৌঢ় ব্যক্তি তার গাড়িটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, বুড়োর কাছাকাছি। সে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা দাদু, কী তাহলে তোমার ধর্মবিশ্বাস ?"

আগেকার মতো নির্দ্বিধায় ত্বরিতে বুড়ো জবাব দিল, "আমার কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, কারণ আমি কাউকে বিশ্বাস করি না—এক নিজেকে ছাড়া।"

নেখ্‌লিউদভও বুড়োর সঙ্গে আলাপে যোগ দিতে গিয়ে বলল, "নিজেকে বিশ্বাস করা যায় কী করে ? ভুলও তো হতে পারে।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ে জবাব দিল, "ভুল আমি জীবনে কখনো করিনি।"

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে এতগুলি ধর্মমত আছে কেন ?"

"বিভিন্ন ধর্মমত আছে যেহেতু মানুষ নিজেকে বিশ্বাস না করে অন্যদের বিশ্বাস করে। আমিও এককালে অন্যদের বিশ্বাস করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম—যেভাবে মানুষ হারিয়ে যায় জলাভূমিতে। এমন-ভাবে হারিয়েছিলাম যে, কোনোদিন বেরোবার রাস্তা খুঁজে পাব বলে আশা করিনি।...ধর্মমত অনেক, কিন্তু আত্মা একটাই। সে আত্মা যেমন আমার মধ্যে আছে তেমনি আপনার মধ্যে, তেমনি আর সকলের মধ্যে। সুতরাং নিজের আত্মার প্রতি যদি বিশ্বাস রাখা যায় তাহলে সকলের মধ্যে ঐক্য আসে, অনেকের মধ্যে একে পাওয়া যায়, এবং একের মধ্যে অনেককে।"

বৃদ্ধ তার বক্তব্য বলল গলা ছেড়ে, চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে, মনে হলো তার ইচ্ছা সবাই তার কথা অবধান করে।

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বহুকাল যাবৎ এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন ?"

"আমার কথা বলছেন ? হাঁ, তা বহুকাল বৈকি। আমায় ওরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গত তেইশ বছর ধরে।"

"তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কি রকম ?"

"খ্রীস্টকে যেমন করত আমাকেও তেমনি করে। ওরা আমায় ধরে-বেঁধে নিয়ে যায় বিচারালয়ে, নিয়ে যায় পুরোহিতদের কাছে, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ও আচার্যের কাছে। পাগলাগারদেও পুরেছিল। কিন্তু আমার ক্ষতি কী করবে ? আমি স্বাধীন। ওরা জিজ্ঞেস করে, 'কী তোমার নাম ?' ভাবে, আমি বুঝি নিজের উপর কোনো নাম আরোপ করব। আমি নিজেকে কোনো নামই দিইনি। আমি সব ছেড়েছি। আমার নাম নেই, ধাম নেই, দেশ নেই, কিছুই নেই। আমি কেবল আমি। 'কী নাম ?' আমি বলি, 'মানুষ।' 'কত তোমার বয়স ?' আমি বলি, 'বছর দিয়ে বয়স গুনি না, গুনতে পারিও না, কারণ আমি চিরকাল ছিলাম, চিরকাল থাকব।' 'কারা তোমার বাবা মা ?' আমি বলি, 'আমার পিতামাতা নেই—আছেন ঈশ্বর আর বসুন্ধরা। ঈশ্বর—পিতা, বসুন্ধরা—মাতা।' 'আচ্ছা, জার ? জারকে তুমি মানো তো ?' আমি বলি, 'মানব না কেন ? উনি ওঁর নিজের জার, আর আমি আমার নিজের।' ওরা বলে, 'নাঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানেই হয় না।' আমি বলি, 'আমি তো বলিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে।' এইভাবে ওরা আমাকে ক্রমাগত নির্যাতন করে।"

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞাসা করল, "এখন আপনি চলেছেন কোথায় ?"

"ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন। কাজ যখন পাই কাজ করি, যখন পাই না ভিক্ষা করি।"

ফেরী-নৌকা এবার ওদিককার ঘাটে লাগছে দেখে বৃদ্ধ কথা শেষ করল, বিজয়দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকাল শ্রোতাদের সকলের দিকে।

ফেরী-নৌকা ঘাটে এসে ভিড়তে নেখ্‌লিউদভ পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে কিছু টাকা দিতে চাইল বৃদ্ধকে। কিন্তু টাকা প্রত্যাখ্যান করে বৃদ্ধ বলল, "আমি টাকা-পয়সা নিই না, কেবল রুটি নিই।"

"আমায় মাপ করবেন তাহলে।"

"মাপ করবার কিছু নেই। তুমি আমায় অপমান করো নি। তাছাড়া আমায় অপমান করা সম্ভবও নয়।"

এই বলে বৃদ্ধ তার থলেটা আবার পিঠের উপর তুলে নিল।

ইতিমধ্যে ডাকের গাড়িখানা ডাঙায় নামানো হয়েছে, তিনটে ঘোড়াও জোতা হয়ে গেছে।

শক্ত পেশল মাঝিমাল্লাদের বকশিস দেবার পর নেখ্‌লিউদভ যখন গাড়িতে আবার চেপে বসল, গাড়োয়ান তাকে বলল, "কর্তা, আপনার সাধও হল কথা বলার! লোকটা নেহাতই একটা অপদার্থ ভবঘুরে।"

'রেজারেকশন' লেখার সময়ে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়ে টলস্টয় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, একথা প্রসঙ্গের গোড়ায় বলেছি। সেই 'রাজযোগ' গ্রন্থের মধ্যে এবং ১৮৯৫-৯৯ কালপর্বের মধ্যে স্বামীজীর চিঠিপত্রে যেসব কথা আছে তা টলস্টয়ের অনেক চিন্তারই অনুরূপ—তবে পার্থক্যও আছে। টলস্টয় ঔপন্যাসিক, জীবনের মধ্যপর্বে পৌঁছে তিনি ধর্মমধ্যে প্রবিষ্ট, তারপর যীশু-খ্রীস্টের কিছু সত্যনীতিকে রচনায় ও কার্যে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট। যীশুর 'সুসমাচার' তাঁর অবলম্বন। আর বিবেকানন্দ আযৌবন সন্ন্যাসী, তাঁর পটভূমিকায় আছে রামকৃষ্ণ এবং বহু সহস্র বৎসরের ভারতীয় ধর্মসাধনা। ফলে ধর্মপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের কথায় গভীরতা ও দ্যুতি অনেক বেশি। তবু টলস্টয়ের কাঙ্ক্ষিত এক আলোকিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অবশ্যই হতে পারেন।

বিবেকানন্দের রাজযোগের সারাৎসার এই :

Each soul is potentially divine.

The goal is to manifest the divine within, by controlling nature, external and internal.

Do this either by work, or worship, or psychic control or philosophy—by one, or more, or all of these—and be free.

This is the whole of religion. Doctrines, or dogmas, or rituals, or books, or temples, or forms, are but secondary details.

আত্মা মাত্রেই স্বরূপত দিব্য।

বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে এই অন্তর্নিহিত দিব্যতার বিকাশই জীবনের পরম লক্ষ্য।

"কর্ম, উপাসনা, যোগ, অথবা জ্ঞান—এর এক, একাধিক বা সকল কিছুর দ্বারা সেই দিব্যতাকে বিকশিত করো—এবং মুক্ত হও।

"এই হলো ধর্মের পূর্ণ রূপ। মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র, ধর্ম-স্থান, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ—এ সকলই ধর্মের গৌণ খণ্ড-রূপ।"

রাজযোগ-এর ভূমিকায় আছে, মানুষই অনন্ত শক্তির উৎস ; অলৌকিকতায় বিশ্বাস আত্মশক্তির হানিকর :

"রাজযোগের এই বাণী : মানবজাতির মধ্যে আছে জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র, আর প্রতিটি মানুষ তারই নির্গমন-প্রণালী। রাজযোগ শিক্ষা দেয়, মানুষের মধ্যে যেমন আছে আকাঙ্ক্ষা ও অভাববোধ, তেমনি তা মোচন করার শক্তিও আছে মানুষেরই মধ্যে। যখন যেখানে কোনো আকাঙ্ক্ষা, অভাব বা প্রার্থনা পূরণ হয়, তখন বুঝতে হবে তা হয়েছে ওই অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার থেকে, কোনো অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়। অতিপ্রাকৃত পুরুষ সম্বন্ধে বিশ্বাস মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করতে পারে বটে, কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও ঘটে। তা পরনির্ভরতা, ভীতি ও কুসংস্কারের সৃষ্টি করে। তা শেষপর্যন্ত এই বিকট বিশ্বাসের সৃষ্টি করে—মানুষ স্বভাবত দুর্বল। যোগী বলেন, অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই, তবে প্রকৃতি-জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিকাশাদি আছে বটে।"

ধর্ম মানে উপলব্ধি। প্রত্যক্ষ অনুভূতির চেষ্টা না করে, পূর্বে সংঘটিত ঘটনার স্মরণ-মনন বা নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজনকে ধর্ম বললে ধর্ম নামের অপব্যবহার করা হয় :

"স্পষ্টই বোঝা যায়, জগতের সকল ধর্মই আমাদের জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি যে প্রত্যক্ষানুভূতি, তারই উপর নির্মিত। সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বর-দর্শন করেছেন ; তাঁরা সকলেই আত্মদর্শন করেছেন ; সকলেই দেখেছেন নিজেদের পরিণতি এবং অনন্ত স্বরূপ। তাঁরা যা দেখেছেন তাই প্রচার করেছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু, প্রায় সকল ধর্মের পক্ষে, (বিশেষত আধুনিক কালে) এই অদ্ভুত দাবি উপস্থিত করা হয় যে, বর্তমানে ওই সকল অনুভূতি অসম্ভব ; যাঁরা ধর্মসংস্থাপক এবং যাঁদের নামে ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে, কেবল তাঁদেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছিল ; যেহেতু আজকাল ওইরকম অনুভূতি সম্ভব নয় তাই বিশ্বাসের উপর ভর করে মানুষকে অগ্রসর হতে হবে। এ কথা আমি পুরো

অগ্রাহ্য করি। যদি জগতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে কেউ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহলে আমরা এই সর্বাত্মক ধারণায় উপনীত হতে পারি যে, পূর্বে লক্ষ-লক্ষ বার তেমন অভিজ্ঞতা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল এবং ভবিষ্যতে অনন্তবার তেমন ঘটার সম্ভাবনা আছে। একরূপতাই প্রকৃতির সুদৃঢ় নিয়ম। একবার যা ঘটেছে তা সর্বদাই ঘটতে পারে।

"যোগ-বিজ্ঞানের আচার্যগণ তাই বলেন, ধর্ম প্রাচীনকালের অনুভূতির উপর স্থাপিত, এই কথা যথেষ্ট নয়, বস্তুত পক্ষে কোনো মানুষই ধার্মিক নন যদি-না তিনি স্বয়ং অনুভূতিসম্পন্ন হন। আর 'যোগ' অনুভূতিলাভের পথ প্রদর্শনের বিজ্ঞান। অনুভূতি না ঘটলে ধর্মের কথা বলা বৃথা। ঈশ্বরের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ এবং কলহের কারণ কি? ঈশ্বরের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, এমন আর কিছুতে হয়নি। কেন? কারণ, মানুষ ধর্মের মূল উৎসে যায়নি। তারা কেবল পূর্বপুরুষদের আচারাদির প্রতি সমর্থন জানিয়ে চেয়েছে যে, অন্যরাও তাই করুক। মানুষের এ কথা বলার কোন্ অধিকার আছে যে, তার আত্মা আছে—যদি-না সে আত্মানুভূতি লাভ করে? ঈশ্বর আছে বলার কোন্ অধিকার আছে যদি-না সে ঈশ্বরদর্শন করে? ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁকে দর্শন করতেই হবে; আত্মা যদি থাকে তা অনুভব করতেই হবে। নচেৎ ও-সবের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করাই ভালো। ভণ্ড হওয়ার চেয়ে স্পষ্টবাদী নাস্তিক হওয়া ভালো।"

"অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। আমরা সারাজীবন তর্কবিচার করতে পারি, কিন্তু নিজেরা উপলব্ধি না করলে সত্যের কণামাত্র বুঝতে পারব না। কয়েকটি বই পড়তে দিয়ে কাউকে অস্ত্রচিকিৎসক করা যায় না। একখানা মানচিত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে কোনো দেশ সম্বন্ধে কারো কৌতূহল মেটানো যায় না। মানচিত্র বড় জোর পূর্ণতর জ্ঞানলাভের জন্য ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া তার কোনো মূল্য নেই। শুধু বই আঁকড়ে থাকলে মানুষের মনের ক্রমপতন ঘটে। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল জ্ঞান কেবল এই বই বা সেই বইয়ে আবদ্ধ, একথা বলার চেয়ে জঘন্য ঈশ্বরনিন্দা সম্ভব? কী স্পর্ধা মানুষের—সে ঈশ্বরকে অনন্ত বলবে অথচ তাঁকে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে বেঁধে রাখতে চাইবে? লক্ষ-লক্ষ লোক খুন হয়েছে যেহেতু তারা 'কোনো একখানি গ্রন্থের মধ্যে সকল প্রকার ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ', একথা বিশ্বাস করতে চায়নি। তেমন নিধনের যুগ অবশ্য এখন নেই; তাহলেও মানুষ এখনও গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসের শিকলে বাঁধা রয়েছে।"

রাজযোগ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-উৎস উন্মোচনের পথ দেখায়। এর পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, এমন-কি নাস্তিকতাও প্রতিবন্ধক নয়:

"জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা।...প্রকৃতির দ্বারদেশে কিভাবে আঘাত

করতে হয় তা জানলে, এবং আঘাত করলে, বিশ্বপ্রকৃতি নিজ রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা থেকে।…রাজযোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য—কিভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, কিভাবে মনের গভীরতম অংশ আবিষ্কার করা যায়, তারপর সেইসকল আবিষ্কৃত ভাবগুলির মধ্যে সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় ক'রে কিভাবে নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এইজন্য রাজযোগ জিজ্ঞাসা করে না—তোমার ধর্ম কি? তুমি আস্তিক বা নাস্তিক, খ্রীস্টান, ইহুদী বা বৌদ্ধ যাই হও, কিছু এসে যায় না। আমরা মানুষ, তাই যথেষ্ট।"

রাজযোগ আত্মশক্তির শাস্ত্র, অথচ এর চর্চাকারীরা অনেক সময়ে অলৌকিকতা, রহস্যপ্রিয়তার ফাঁদে পড়েন:

"এইসব যোগ-প্রণালীতে যেসব গোপন বা রহস্যময় বস্তু আছে তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। যা-কিছু বলপ্রদ তাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়ের মতো ধর্মেও দুর্বলকর বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো। গুপ্ত রহস্যবাদ মানবমস্তিষ্ক দুর্বল ক'রে ফেলে। তারই জন্য মহত্তম এক বিজ্ঞান এই যোগশাস্ত্র নষ্ট হতে বসেছে।"

প্রয়োজন যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি—অন্তর্জগতের বিষয়েও:

"অন্যপ্রকার বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে যা করা হয় অতীন্দ্রিয় অবস্থার পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ভিত্তিস্থাপন করতে হবে যুক্তির উপরে; যুক্তি যতদূর নিয়ে যায় ততদূর অগ্রসর হতে হবে; তারপর যুক্তি যখন আর এগোতে পারবে না তখন যুক্তিই দেখিয়ে দেবে সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ কী। তাই যখন কাউকে বলতে শুনবে, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ', অথচ একই সঙ্গে তিনি যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলছেন—তৎক্ষণাৎ তাঁর কথা বাতিল করে দেবে।"

মানবমহিমার ঘোষণা:

"বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ, আর মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। সকল জীবজন্তু অপেক্ষা, দেবতাদের অপেক্ষাও, মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। দেবতাদেরও মানবশরীরে অবতরণ করে মুক্তিলাভ করতে হয়। দেবতারা নন, একমাত্র মানুষই পূর্ণত্ব লাভের অধিকারী। ইহুদী ও মুসলমানদের মতে, ঈশ্বর দেবদূত ও অন্যান্যদের সৃষ্টি করার পরে মানুষ সৃষ্টি করেন; তারপর দেবদূতদের ডেকে মানুষকে নমস্কার করতে বলেন। ইবলিশ ছাড়া সকলে সে-কাজ করেন। সেজন্য ঈশ্বর ইবলিশকে অভিশাপ দেন এবং সে 'শয়তানে'

পরিণত হয়। রূপকের আবরণে এখানে এই বিরাট সত্য লুকিয়ে আছে—জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম।"

শক্তি উন্মোচনের এক শ্রেষ্ঠ উপায় প্রেম: যোগশিক্ষার শুরুতে দিকে-দিগন্তরে প্রেমচেতনা বিস্তারের নির্দেশ:

"সর্বপ্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করে দাও। মনে মনে বলো, 'সকলে সুখী হোক, সকলে শান্তিলাভ করুক, সকলে ধন্য হোক আনন্দে।' এইভাবে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে পবিত্র চিন্তা ছড়িয়ে দাও। যতই এমন করবে ততই নিজে ভালো বোধ করবে। শেষে দেখতে পাবে, 'অপরে সুস্থ হোক', এই ভাবনাই স্বাস্থ্যলাভের সহজতম উপায়; 'অপরে সুখী হোক', এই ভাবনাই সুখলাভ করার সহজতম উপায়।"

রাজযোগ গ্রন্থের সর্বত্র বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ আছে। তবে গ্রন্থ-চরিত্র অনুযায়ী সেখানে তাঁর ব্যক্তিপ্রকাশ সংবৃত আকারে। সে বাধা ছিল না চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে। সেখানে অবাধ আত্ম-উন্মোচন। এখানে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে চাইব—১৮৯৯ সাল, অর্থাৎ টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' উপন্যাস প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত, বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে তাঁর মনের কোন্ রূপ ফুটেছে যাদের সঙ্গে 'রেজারেকশনের' ভাবসাম্য আছে। এই ধরনের অজস্র কথা স্বামীজীর পত্রাবলীতে আছে, আমি কয়েকটি মাত্র তুলে আনব। যাঁরা যত্ন করে রেজারেশন পড়বেন তাঁরা বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে টলস্টয়ের চিন্তার ঐক্য দেখে বিস্মিত হবেন।

সত্যের পক্ষে বিদ্রোহী আচার্য—টলস্টয়। আর বিবেকানন্দে আছে সত্যের অগ্নিস্তোত্র:

"'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। যাঁরা মনে করে কিঞ্চিৎ মিথ্যার শর্করা-প্রলেপ দিয়ে দিলে সত্যপ্রচার সহজ হয় তাঁরা ভ্রান্ত। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বুঝতে পারবেন, একবিন্দু বিষ পুরো দেবভোগ নষ্ট করে দিতে পারে। পবিত্র যে, সাহসী যে, সেই সব কাজ করতে পারে।" [১৮৯৫]

" সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ।···ঈশ্বরের সন্তান আমি। একটি সত্য আমার দেবার আছে। যিনি আমাকে সেই সত্য দিয়েছেন তিনি আমাকে সহকর্মী দেবেন—পৃথিবীতে যারা শ্রেষ্ঠ আর সাহসী।" [অগস্ট ১৮৯৫]

সত্যের পক্ষে স্বামীজীর কঠিন সংগ্রাম—তাঁর ছিন্ন দেহ, রক্তাক্ত হৃদয়। আমেরিকায় প্রতি মুহূর্তে সংঘাতের মধ্যে ছিলেন। স্থূল মূঢ় অহঙ্কৃত এবং

স্বার্থনাশের আশঙ্কায় বিচলিত পাদরীকুল তাঁকে আক্রমণ করেছেন, তিনি উপযুক্ত উত্তর ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মার্কিন বন্ধুরা কিল খেয়ে কিল চুরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাতে নাকি ভবিষ্যৎ প্রচারের সুবিধা হবে। এমনই এক পরিস্থিতিতে লেখা স্বামীজীর এই চিঠি :

"সাংসারিক লোক মধুরভাষী হোক, তাদের উন্নতি হোক, আমি তাই চাই! তারা আপস করুক, সেই তাদের পথ। আমি চেষ্টা করেছি মিথ্যার সঙ্গে আপস করতে, তা পারিনি, হায়। সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর হল তাদের সমাজ, সেই ঈশ্বরের সেবক তারা। কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ নন সুগম পথের পথিক। তাঁরা সমাজের দাস নন, প্রভু। তাঁরা নিজের পথে সমাজকে সবলে আকর্ষণ করেন। তাঁরা একাকী—উত্থিত। সত্যের তনয় চলেন কণ্টকপথে, রক্ত ঝরে, তবু তাঁরা চিরজীবী। আর সমাজ-দাসের কুসুম-বিছানো পথ, অচিরে দেখা যায়, মৃত্যুরই পথ।"

স্বামীজী উন্মোচন ক'রে চললেন নিজ হৃদয়। সত্যের অগ্নিশয্যার উপর আসীন মানুষের আলোকিত ও আর্ত কণ্ঠস্বর তাঁর :

"মিথ্যার সঙ্গে মধুর মুখে আপস করতে চেয়েছি—পারিনি। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হতে দেবেন না। জেগে উঠুক আমার মধ্যে যা অন্তলীন। আমি যেন বিশ্বস্ত থাকি কেবল আমারি সত্যের কাছে। হে সত্যরূপী ঈশ্বর! তুমিই হও আমার অনন্য নিয়ন্তা। সৌন্দর্য ও যৌবন নশ্বর, জীবন-ধন-মান নশ্বর, বন্ধুত্ব ও প্রেম অচিরস্থায়ী—চিরস্থায়ী শুধু ঈশ্বর। হে সন্ন্যাসী! নির্ভয়ে ত্যাগ করো দোকানদারি; শত্রুমিত্রে ভেদ না রেখে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হও সত্যে। আমার ধনের কামনা নেই, যশের বা ভোগের কামনা নেই, আমি কেন আমার হৃদয়ের সত্যে কর্ণপাত করব না। না, আমি ভীত নই, ভয়ই সবচেয়ে গুরুতর পাপ।

"একাকী বিচরণ করো, একাকী বিচরণ করো, হে সন্ন্যাসী! তুমি জানো, বন্ধুত্ব ও প্রেম হলো বন্ধন। নারীর বন্ধুত্বে কেবল দেহি দেহি। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও! জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। সত্য কেবল ঈশ্বর। হৃদয়, ভয়শূন্য হও। পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে, আমায় শীঘ্র ঘরে ফিরতে হবে। স্বপ্ন দেখো না, হৃদয় স্বপ্ন দেখো না।"

বেপরোয়া কণ্ঠস্বর এর পর :

"এ জগৎকে আমার কিছু দেবার আছে, তা দেব নির্ভয়ে। নির্বোধ জগৎ, তার কথায় চলব? সহস্র মৃত্যুও শ্রেয় তার চেয়ে। না, এ জগতে আমার কোনো দায় নেই—শুধু আছে কিছু বলার, তা বলব নিজের ভাবে, ঢালাই করব

নিজের ছাঁচে। মুক্তি আমার ধর্ম। দূর হোক সবকিছু যা প্রতিরোধ করে মুক্তির।

"যাজককুলের মনস্তুষ্টি করব আমি? তাই করতে বলছ আমাকে? হায়, তোমরা শিশু ছাড়া কিছু নও। তোমরা এখনো সেই উৎসের সন্ধান পাওনি যা হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, জগৎকে শূন্য করে, মানুষকে করে দেবতা। যদি সাহস আর শক্তি থাকে তাহলে বেরিয়ে এসো—ছিঁড়ে ফেলো জগৎ-নামক মূর্খতার বন্ধন, চূর্ণ করো আভিজাত্য-নামক ঝুটা ঈশ্বরকে, পদদলিত করো কপটতাকে। বেরিয়ে এসো।

"আমি ঘৃণা করি এই জগৎকে আর তার স্বপ্নকে, গির্জা ও তার প্রবঞ্চনাকে, শাস্ত্র ও তার বদমাইশিকে, মিষ্ট মুখ ও কপট হৃদয়কে, ধর্মধ্বজিতার আস্ফালনকে, সর্বোপরি ধর্মের নামে দোকানদারিকে। কি, সংসারের ক্রীতদাসরা বিচার করবে আমাকে?—ধিক্—যে-আমি সত্যের—সত্যই যার ঈশ্বর!" [১. ২. ১৮৯৫]

ধর্ম চাই জীবনে—নিছক বাক্যে নয়। অখণ্ডের বোধ যদি আসে—ভেঙে যায় দেশ-সীমার সংকীর্ণ বন্ধন। তখন প্রতিষ্ঠিত হয় মহত্তম মানবতা :

"সংখ্যার আধিক্য, শক্তির আধিক্য, ধনসম্পদ, পাণ্ডিত্য বা বাগ্মিতা, এগুলি বা অনুরূপ অন্য-কিছু, পৃথিবীতে স্থায়ী হবে না; স্থায়ী শুধু—পবিত্রতা, সৎজীবন এবং অনুভূতি। যদি প্রত্যেক দেশে দশ-বারটি মাত্র ওহেন সিংহহৃদয় মানুষ থাকেন, যাঁরা নিজেদের শিকল ছিঁড়েছেন, অসীমের স্পর্শ পেয়েছেন, যাঁরা ব্রহ্মনিমগ্ন, নাম যশ অর্থ সম্বন্ধে যাঁদের মোহ নেই—শুধু সেই কয়েকটি মাত্র মানুষই জগৎকে তোলপাড় করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।...জগতে বহু মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, লক্ষ-লক্ষ পুস্তক লেখা হয়েছে, কিন্তু হায়, যদি কেউ সামান্যমাত্রও তা কর্মে পরিণত করার চেষ্টা করত!...

"আমি জীবনে যত বাধা পেয়েছি, ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হয়েছে। একটুকরো রুটির জন্য গৃহ থেকে গৃহান্তরে বিতাড়িত হয়েছি, আবার বহুভাবে পূজিত হয়েছি রাজা-মহারাজাদের দ্বারা। বিষয়ীলোক ও পুরোহিতকুল সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করেছে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়। ভগবান তাদের কল্যাণ করুন—তারা সকলেই যে আমারই আত্মা।...

"নিঃসন্দেহে ভারতকে আমি ভালবাসি। কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে, স্পষ্টতর হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে ভারত বা কি, ইংলণ্ড বা কি, আমেরিকা বা কি! ভ্রান্তিবশত যাদের 'মানুষ' বলা হয়, আমরা সে-ই ঈশ্বরের সেবক।... কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রে যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে—এইটুকু জানা—আমি ও আমার ভ্রাতা একই।" [৯. ৮. ১৮৯৫]

"জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি; দেশের জন্য—যার কাছ

থেকে পেয়েছি ভাবরাজি ; এবং মনুষ্যজাতির জন্য—যার একজন বলে নিজেকে অনুভব করি ; —আমি কিছু করবার চেষ্টা করব।” [অগস্ট, ১৮৯৫]

কুসংস্কার, অলৌকিকতায় বিশ্বাস—নিত্যধর্মের ঘোর শত্রু। এক্ষেত্রে কোনো আপস নয়। আবর্জনা দূর করতেই হবে জীবনের নির্মলতার জন্য :

“জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক এবং আকাশের সিংহাসনে আসীন শাসনকর্তার গল্প শোনানো হয়, শেখানো হয় নানা কুসংস্কার—উদ্দেশ্য একটাই —তাদের ভুলিয়ে আত্মসমর্পণের পথে নিয়ে আসা। ···কিন্তু দেখা যায়, ওই স্থূল স্বর্গ বা মিলেনিয়াম (সুখের হাজার বছর) রয়েছে কেবল কল্পনায়, অথচ উপলব্ধির স্বর্গ রয়েছে আমাদের হৃদয়েই। কস্তুরীমৃগ, গন্ধের হেতু অনুসন্ধানে বৃথা ছোটাছুটির পরে, শেষে জানতে পারে, তা আছে তার নিজের শরীরেই।” [১. ৯. ১৮৯৬]

“আমি চাই নূতনকে, সম্পূর্ণ নূতন। পুরাতনের ধ্বংসাবশেষ, ইতিহাসের স্তূপ, আর যত অতীত মানুষের কাহিনী—এদের চারদিক ঘিরে অলস ভ্রমণ আর দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে আমি রাজি নই। আমার যা রক্তের জোর তাতে ও-কাজ করা সম্ভব নয়। আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোর পক্ষপাতী হয়ে উঠেছি। থসথসে জেলি-মাছের মতো ভারতবর্ষটাকে যদি পারি নাড়া দেব, প্রাচীন সংস্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুরু করব নূতনকে নিয়ে—সরল, সবল, সতেজ, নূতন।···

“সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান, ঈশ্বর বিষয়ে প্রাচীন ধারণা—ওগুলো কুসংস্কার, ওদের বাঁচিয়ে রাখা কেন ? পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জীবন ও সত্যের নদী—তৃষ্ণার্তদের পান করতে দেব নর্দমার জল ?” [মে ১৮৯৬]

সোনার শিকলও শিকল। যাঁর মতে সন্ন্যাসীরা ‘ডিভাইন নিহিলিস্ট’, তিনি বলেছেন :

“আমি পারিবারিক বন্ধনের লোহার শিকল ছিঁড়েছি, এখন ধর্মসংঘের সোনার শিকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদাই মুক্ত থাকব।”

[২৩. ৮. ১৮৯৬]

প্রেমই সারাৎসার—আর অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত মানুষই কেবল সেই চরম প্রেমের অধিকার পান। সেই প্রেমই তাঁর চোখে মানুষকে উপাস্য নারায়ণ করে তোলে :

“নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপী যে-ভগবান বিদ্যমান, একমাত্র যে-ভগবানে আমি বিশ্বাস করি—সেই ভগবানের পূজার জন্য আমি যেন বার-বার জন্ম-

গ্রহণ করি, সহস্র-সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি। আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ...

"হে মূর্খগণ! জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে পূর্ণ জগৎ। তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পিছনে ছুটছ! উপাসনা করো সেই প্রত্যক্ষদেবতার, অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেলো।" [৯. ৭. ১৮৯৭]

সে প্রেম পৌঁছয় পঙ্কতলে পর্যন্ত :

"পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।... আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধ-বনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার।...প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত-শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার।" [২৩. ৮. ১৮৯৬]

"বিশ বছর বয়সে আমি এমন কঠোর গোঁড়া আর সহানুভূতিহীন ছিলাম যে, কলকাতার যে-ফুটপাথে থিয়েটার সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের ধিক্কার দেবার কথা মনে একবারও ওঠে না। এ কী আমার পতন? না কি আমি বিস্তারিত হয়ে সর্বজনীন প্রেমে উপনীত—যার নাম স্বয়ং ঈশ্বর! লোকে বলে শুনতে পাই, কেউ যদি তার চতুর্দিকে পাপ অমঙ্গল না দেখতে পায় তাহলে সে কোনো ভালো কাজ করতে পারে না, সে একপ্রকার অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে। কই, আমি তো তা দেখছি না! অপরপক্ষে আমার কাজের শক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে, এবং তা প্রভূত পরিমাণে ফলদায়ী হচ্ছে। কোনো-কোনোদিন আমার এক ধরনের ভাবাবেশ হয়। তখন মনে হয়, জগতের সবাইকে, সবকিছুকে ভালবাসি, আলিঙ্গন করি। তখন দেখি, যাকে মন্দ বলি তা ভ্রান্তিমাত্র! প্রিয় ফ্রান্সিস, আমি এখন সেইরকম ভাবের ঘোরে আছি। তুমি আর মিসেস লেগেট আমাকে কত ভালোবাসো, কত সহৃদয়তা দেখাও—তাই ভেবে সত্যসত্যই অশ্রুবিসর্জন করছি। আশীর্বাদ করি সেই দিনটিকে যেদিন জন্মেছি। এ জগতে কতই সহৃদয়তা আর ভালবাসা পেলাম! আর যে-অনন্ত প্রেমস্বরূপ থেকে আমার আবির্ভাব তিনিই আমার ভালো-মন্দ সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করছেন। 'মন্দ' কথাটিতে ভয় পেয়ো না—তাঁর হাতের পুতুল আমি কখন ছিলাম না, বা কখন নই বলো? তাঁর সেবায় দিয়েছি সর্বস্ব, ত্যাগ করেছি প্রিয়জনদের, আমার আনন্দকে এবং জীবনকে। তিনি আমার খেলার রাজা, প্রিয়তম, আমি তাঁর খেলার সাথী। এ জগতের কাণ্ডকারখানার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণে বাঁধা নেই তিনি—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল-খুশি। তিনি খেলছেন আমাদের হাসি নিয়ে, কান্না নিয়ে, সবকিছু নিয়ে। জো যেমন বলে, ভারি মজা, ভারি মজা!" [৬. ৭. ১৮৯৬]

স্বামীজীর সমূহ বিতৃষ্ণা ছিল আত্মপ্রচারশীল বাগাড়ম্বর প্রেমিকদের সম্বন্ধে—যাঁরা মনে করেন ঘৃণার সম্মার্জনীতে পরিষ্কার করা যা... পাপের জঞ্জাল, দোষীদের অবিরাম তিরস্কার করলে প্রমাণিত হয়ে যায় নিজেদের নিপাট সাধুত্ব।—

"ভয় পেয়ো না, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জীবন অনন্ত নয়। আমি তার জন্য খুব কৃতজ্ঞ। জগতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই তাঁদের বিধিলিপি।...কাউকে না কাউকে এ-জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে। আমি খুশি যে, প্রকৃতির কাছে যাঁরা বলিপ্রদত্ত, আমি তাঁদের একজন।" [১.১.১৮৯৯]

"যখনই কোনো মহাপুরুষ মানবজাতির অবস্থা দেখে ব্যথিত হন তখনই তাঁর মুখ ভার হয়ে গাল ঝুলে পড়ে, তিনি বুক চাপড়াতে থাকেন, সকলকে তিক্ত-কষায় নানা বস্তু খেতে বলেন। বলেন—'কয়লা চিবিয়ে, গায়ে ছাই মেখে, গোবরের গাদায় বসে থাকো, আর কথা বলো চোখের জল ও গোঙানি মিশিয়ে।'...

"না না। যদি সত্যিই জগতের বোঝা কাঁধে নিতে রাজি থাকো তা অবশ্যই নাও, কিন্তু সেজন্য তোমার বিলাপ আর অভিশাপ যেন শুনতে না হয়। তোমার দুঃখ-যন্ত্রণার কাঁদুনি শুনে আমরা যেন আতঙ্কে না ভাবি যে, নিজের কষ্টের বোঝা নিয়ে ভালোই ছিলাম—এ আবার কি উৎপাত!

"যিনি সত্যিই জগতের দায় তুলে নেন তিনি জগৎকে আশীর্বাদ জানিয়ে চলে যান নিজের পথে। তাঁর কণ্ঠে কোনো নিন্দা সমালোচনা থাকে না। তার মানে নয় কোনো পাপ নেই। তার মানে—তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে কাঁধে বোঝা তুলে নিয়েছেন। পরিত্রাতা পথে চলেন পরম আনন্দে।

"দুঃখভার জর্জরিত যে যেখানে আছো সব এসো, তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে দাও, তোমরা সুখী হয়। আর ভুলে যাও—আমি কোনো একদিন ছিলাম।" [৬. ১২. ১৮৯৯]

বলিদানের মহামন্ত্র ধ্রুপদী ছন্দে বেজেছে বিবেকানন্দের কণ্ঠে :

"কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই পৃথিবী। যে-উৎপীড়িত—নর বা নারী—তার প্রতি করুণা আমার। আর যে উৎপীড়নকারী, সে আরও করুণার পাত্র।...

"জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য। হায়, যুগ-যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সবচেয়ে সাহসী আর বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত-শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

"জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের

এখন একান্ত প্রয়োজন—চরিত্র। জগৎ তাঁদের চায় যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী ক'রে তুলবে।…

"আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী, তারও চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ! ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?"

[৭. ৬. ১৮৯৬]

বিবেকানন্দের বেদান্তে সবই ছিল—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত। পিয়ের হিয়াসান্থ বিবেকানন্দের অদ্বৈতকে ডরাতেন। সেই তিনিও কয়েক মাস বিবেকানন্দের সাহচর্যের পরে তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছিলেন, আমরা তা আগে দেখেছি। টলস্টয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। নাস্তিকতা থেকে খ্রীস্টে প্রত্যাবর্তন করার পরে তিনি খ্রীস্টের সুসমাচারের কয়েকটি নীতিকে অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ বা মুক্তিতত্ত্ব তাঁর পছন্দ ছিল না। তাঁর মনে তখন 'আত্মশক্তি' এবং 'পরিত্রাণ'—এই দুইয়ের টানাপোড়েন। কিন্তু জীবনপ্রান্তে পৌঁছে ঝুঁকলেন বিবেকানন্দের সত্য-তত্ত্বের দিকে। ২৬, ৬, ১৯০৮ তারিখের ডায়েরিতে লিখলেন:

"এই সর্বপ্রথম বিবেকানন্দ যেকথা বলেছেন তার সত্যতার সম্ভাবনা উপলব্ধি করলাম। তা হলো—'আমি' সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে 'তুমি'-তে। উপলব্ধি করলাম—আত্মবিলয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নয়, সত্যজ্ঞানের কারণেই তা ঘটতে পারে।…মানুষ তার অহং-এর, তার আমি-র, যে-বিকট প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, তার থেকে অব্যাহতি নিরতিশয় কঠিন—অথচ নিরতিশয় প্রয়োজনীয়। আমি এখন মৃত্যুর পূর্বে ওইপ্রকার আমি-র পরিহারের সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে শুরু করেছি।"

জীবনের সকল প্রাপ্তির মধ্যেও সুখের সন্ধান পাননি টলস্টয়। সংসার থেকে, স্ত্রীর কাছ থেকে, পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেই তাঁর শেষ যাত্রা হয়ে দাঁড়ায়। পথে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হন। আশ্রয় নেন এক স্টেশন-মাস্টারের ঘরে। চারিদিকে খবর রটে যায়। তাঁর খ্যাতির টানে অজস্র মানুষ ছুটে আসে। চতুর্দিকে ভিড়। অব্যাহতি তাঁর ভাগ্যে নেই। ঘনিয়ে আসে মৃত্যু।

"সারাজীবন তিনি মৃত্যুকে ভয় করেছেন। কিন্তু সে ভয় এখন নেই। বললেন, 'শেষ সময় এসে গেছে। তাতে কি এসে যায়।' অবস্থা ক্রমে মন্দ। বিকারের ঘোরে চীৎকার করতে থাকেন, 'মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!'…৭ নভেম্বর ১৯০০, রবিবার, সকাল ৬টার কয়েক মিনিট পরে তাঁর মৃত্যু হলো।"

জীবনে তাঁর 'পুনরুত্থান' হয়েছিল—মৃত্যুতে কি হলো 'মুক্তি'?

তীর্থের শেষ অধ্যায়…

টলস্টয় বিবেকানন্দকে জেনেছিলেন কেবল রচনায়। আর কালভে তাঁকে জেনেছেন মাসখানেকের ভ্রমণ-সান্নিধ্যে। ১৯০০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের এই ভ্রমণ কালভের জীবনে "অবিস্মরণীয়"। "তা আমার জীবনের সর্বোত্তম কাল", কালভে লিখেছেন। স্বামীজীর যেসব উক্তি অল্প আগে সংকলন করেছি, সেই ধরনের কথা সরাসরি স্বামীজীর মুখে শুনবার সৌভাগ্য কালভের হয়েছিল—সেই বাণীর বিগ্রহরূপেও স্বামীজীকে তিনি দেখেছেন।

"স্বামীজীর নিকটে থাকার অর্থ [কালভে লিখেছেন] অবিরাম প্রেরণার মধ্যে থাকা। ওইকালে আমরা গভীর তীব্র আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেছি। যে-কোনো ব্যাপার তাঁর মুখে এনে দিত কথাগল্প, নীতি-কাহিনী এবং নানা উদ্ধৃতি—যা হিন্দুপুরাণ থেকে শুরু করে গভীরতম দর্শন পর্যন্ত সকল শাস্ত্র হতে সংগৃহীত। কখনো-কখনো তিনি অত্যন্ত স্ফূর্তিতে থাকতেন, কৌতুকের শেষ থাকত না, ধারালো উত্তর দ্রুত ঝলসে উঠত। একেবারে শিশুর মতো হাসিতে খুশিতে লুটোপুটি। কণ্ঠস্বর চেলো-বাদ্যের [বেহালা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র] মতো—নীচু পর্দার তরঙ্গ বক্তৃতাসভার শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি হৃদয়কে পূর্ণ করে দিত। সে-জিনিস ভোলা সম্ভব নয়।…কিংবা ব্যারিটোন-গায়কের তুল্য তাঁর কণ্ঠস্বর, তা স্পন্দিত হতো চীনা ঘণ্টা-ধ্বনির মতো।"

কালভে পুনশ্চ লিখেছেন :

"সে কী তীর্থযাত্রা! বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাসের কোনো রহস্যই স্বামীজীর কাছে গোপন নয়।…চমৎকৃত হয়ে দেখেছি, ফাদার হিয়াসান্থের মতো খ্যাতনামা ধর্মতাত্ত্বিকও যেখানে সঠিকভাবে একটি চার্চ-কাউন্সিলের তারিখ বলতে পারলেন না, সেখানে স্বামীজী মূল দলিল অবিকল মুখস্থ বলে গেলেন।

"গ্রীসে থাকাকালে আমরা ইউলিসিস দর্শন করলাম। স্বামীজী আমাদের কাছে তার রহস্য ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের নিয়ে গেলেন এক বেদী থেকে অন্য এক বেদীতে, এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে। কোথায় কোন্ ধর্মীয় শোভাযাত্রা হতো, ব্যাখ্যা করলেন। প্রাচীন প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করে শোনালেন। দেখালেন পুরোহিতগণের পূজাপ্রণালী।

"তারপরে এক অবিস্মরণীয় রাত্রিতে মিশরের মৌন স্ফিংকসের ছায়াতলে বসে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন সুদূর অতীতে—আলোড়িত রহস্যময়

ভাষায় উদ্‌ঘাটন করলেন, কত ইতিবৃত্ত।”

স্বামীজীর ‘যাদুকণ্ঠ’ সম্মোহিত করে রাখত শ্রোতাদের। স্টেশন-ওয়েটিং-রুমে বসে তাঁর কথা শুনতে-শুনতে সময়বোধ হারিয়ে যেত, কতবার তাঁরা এই-ভাবে ট্রেন মিস্‌ করেছেন ঠিক নেই।

এমনই এক আত্মহারা ক্ষণে মাদাম কালভে দেখেছিলেন স্বয়ং আবির্ভূত পরিত্রাতাকে।

> “একদিন কায়রোয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয়, খুবই মগ্ন হয়ে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। যেভাবেই তা ঘটুক, আমরা সচেতন হয়ে দেখলাম, একটি নোংরা, কটুগন্ধ পথে হাজির হয়েছি, যেখানে অর্ধ-নগ্ন নারীদের কেউ জানলা থেকে উঁকি দিচ্ছে, কেউ-বা দরজা-গোড়ায় হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে বসে আছে।
>
> “স্বামীজী পরিবেশ বিশেষ লক্ষ্য করেন নি, যতক্ষণ-না একটা জীর্ণ বাড়ির ছায়ায় বসে-থাকা একদল অত্যন্ত প্রগল্‌ভ নারী খিলখিল হেসে তাঁকে ডাকাডাকি করেছিল। আমাদের দলের জনৈক মহিলা তাড়াতাড়ি ওখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু স্বামীজী মৃদুভাবে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বেঞ্চে বসে-থাকা মেয়েগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন।
>
> “ ‘হায় হতভাগিনীরা! হতভাগ্য সন্তানেরা! এরা নিজেদের ঈশ্বরত্বকে টেনে নামিয়েছে দেহের রূপে! দেখো একবার এদের!’
>
> “তিনি কাঁদতে লাগলেন—যে কান্না প্রভু যীশুও কাঁদতে পারতেন ব্যভিচারিণী নারীদের সামনে।
>
> “মেয়েগুলি স্তব্ধ হয়ে গেল, অত্যন্ত অপ্রতিভ। তাদের একজন নতজানু হয়ে তাঁর বসনপ্রান্ত চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্প্যানিশে অস্ফুটে বলতে লাগল, ‘ঈশ্বরপুত্র! ঈশ্বরপুত্র!’ অন্য একজন সহসা লজ্জায় আতঙ্কে অভিভূত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। সে যেন ঐ পবিত্র আঁখির দীপ্তি থেকে নিজের সংকুচিত আত্মাকে ঢেকে রাখতে চাইছিল।”

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে…

কালভে-কাহিনী শুরু করেছিলুম যেখান থেকে সেখানে আবার পাঠকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। বলেছিলুম, স্বয়ং ভাইসরয়ের দ্বারা সংবর্ধিত কালভে পরাধীন দেশের এক সন্ন্যাসীর সমাধির সন্ধানে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। সে সন্ন্যাসী যে স্বামী বিবেকানন্দ তা এখন আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

ইংলিশম্যান কাগজের ২৩শে নভেম্বর, ১৯১০ সংখ্যার সাক্ষাৎকার বিবরণেই

কালভের বিবেকানন্দ-ভক্তির কথা ছিল। উন্নাসিক ইংরাজ সাংবাদিক শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন, কালভের মতো বিশ্ববন্দিত ফরাসি গায়িকা একজন কালা সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার ভাষায় কথা বলছেন! তিনি শুনলেন, এই আশাভরসাহীন হতভাগ্য দেশের সম্বন্ধে গায়িকা-প্রধানার মনে গভীর ঔৎসুক্য জাগাতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বাণীর প্রতি তাঁর এমনই অনুরাগ যে, স্বামীজীর একটি বই ফরাসীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন—'নিজ জাতির জন্য'। ইংরাজ সাংবাদিক সবিস্ময়ে শুনলেন, সঙ্গীতরাণী তাঁর গানের গুরুর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম এক নিঃশ্বাসে বলছেন।

> How did the idea of visiting India enter her [Mdme. Calve's] mind ?
>
> "I wanted to see the country. I am very much interested in the religions of India and in her customs. [Then in French] I wanted to see the country for myself."
>
> Strange as it may sound Madame Calve is visiting India for, a change for rest. The three months which she has set aside for her tour in the East are to be passed in doing nothing, with the exception of a few concerts here and there. Her curiosity about the Land of Regrets was aroused by Swami Vivekananda when he visited the Congress of Religions at Paris [America]. She again met the Swami in America [Paris.] He made a great impression on Madame Calve, who was instrumental in having one of his works translated into French—'for my nation, the French people', as Madame puts it. How much the great artiste thinks of Swami Vivekananda, can be imagined, when she thinks his name with that of her teacher, Rossina Ladorde."

ইংলিশম্যানের রচনাটি পড়ে কিছু ভারতীয়ও চমকিত হলেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যরাও ছিলেন। তাঁদের কয়েকজন তৎপর হয়ে গ্রান্ড হোটেলে হাজির হলেন, কালভেকে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ দর্শনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তারপর কী ঘটল তার চমৎকার বিবরণ পাই প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের লেখায়। তার অংশ :

> "আমরা সকলেই ['প্রাসাদোপম গ্রান্ড হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে'] মাদামের আগমন প্রতীক্ষায় রইলাম। অবিলম্বে দুটি ভদ্রলোককে সঙ্গে

করে ভিতরের কক্ষ থেকে মাদাম কালভে আমাদের সম্মুখে হাস্যমুখে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা যখন সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলাম, তখন তিনি আমাদের অভিবাদন করে ওষ্ঠে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে বললেন, 'নথ্ ইংলিশ।' মাদামের সঙ্গী দুজনের মধ্যে একজন··· বললেন, 'মাদাম ইংরাজি জানেন না, এইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করছেন, তাঁর মনের ভাব তিনি আপনাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। আমি দোভাষী হয়ে আপনাদের কথা তাঁকে জানাব এবং তাঁর কথা আপনাদের জানাব।' আমাদের মুখপাত্রস্বরূপ পূর্ণবাবু [শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ] কথা আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ফটোগুলি মাদামকে উপহার দিলেন। মাদাম সহাস্যবদনে সেগুলি নিজের হাতে গ্রহণ করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো দেখে অতি শ্রদ্ধাভরে মস্তকে স্পর্শ করলেন। পরে টেবিলের উপরে রাখলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো দেখে তিনি যেন আনন্দের বেগে আত্মহারা হয়ে গেলেন। স্বামীজীর ফটো তিনি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। মুখে চোখে সর্বশরীরে আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙা ইংরাজিতে বললেন, Oh ! I am very very happy।' তাবপর অনর্গল ফরাসি বলতে লাগলেন এবং আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। সেই দৃষ্টি যেন স্পষ্ট করে বলল, কি দুঃখ! আমার এই মনের ভাবগুলি তোমাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। দোভাষী, মাদামের ভাবগুলি যেন ব্যক্ত করতে অক্ষম—তিনিও শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বললেন, 'মাদাম ভাবে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পুরণো স্মৃতি সব জেগে উঠছে। স্বামীজীর এই ছবি দেখে মাদাম স্বামীজীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।' দোভাষীর কথা শেষ হতে না হতে মাদাম অনর্গল ফরাসি ভাষায় তাঁর মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে লাগলেন। তখনো তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ফটো বক্ষে চেপে রেখেছেন। দোভাষী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন। মাদাম কালভে নিজেই মনের আবেগে ভাঙা ইংরাজিতে বলতে লাগলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ যীশুখ্রীস্টের মতো ছিলেন। যীশুর ন্যায় তাঁর সরলতা ছিল। যীশুর মতো তাঁর জীবন প্রেমপূর্ণ পবিত্র সরস ছিল।' কথা বলতে বলতে আবার ফরাসি ভাষায় বলতে লাগলেন। দোভাষী বললেন, মাদাম বলছেন, তাঁর জীবনের শুভ মুহূর্তে তিনি স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। তিনি পাঁচ বছরের ছেলের মতো পবিত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও লোক পবিত্র হত। ভগবৎশক্তির প্রকাশমূর্তি বিবেকানন্দ ছিলেন। তাঁর কী প্রবল আকর্ষণ ছিল, সে রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কোথাও বোধ করিনি। কতদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে এত তন্ময় হয়ে গেছি যে, কখন আমার স্পেশাল ট্রেন এল, কখন চলে গেল, কিছু লক্ষ্য ছিলনা। তাঁর পবিত্র সঙ্গের জন্য এই-

ভাবে শুধু একবার নয়, বহুবার আমাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু তা আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি। কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়! কি অদ্ভুত পবিত্রতা! কি মোহন আকর্ষণ! কি মর্মস্পর্শী বাণী! কি অপূর্ব তেজঃপুঞ্জ মূর্তি! কি সুন্দর বিশাল আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু!' দোভাষীরও চক্ষু সজল হয়ে উঠল। মাদাম আবার ফরাসি ভাষায় তাঁর আকুল আকূতি, আনন্দের আবেগ জানালেন। যদিও ভাষা আমাদের অবোধ্য… কিন্তু গভীর ভাবোচ্ছ্বাস…শ্রোতাদের…অন্তরের সুরে-সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।—সেই বিলাসসজ্জিত কক্ষ তখন শ্রদ্ধা ও পূজার বিরাট আবহাওয়ায় ভরে গিয়েছিল।"

মাদাম কালভে স্বতঃই বেলুড়ে স্বামীজীর সমাধিমন্দির দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন ফরাসি-ফরাসিনীর সঙ্গে কালভে মঠে যান। ২ ডিসেম্বর ১৯১০, অপরাহ্ণে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মঠের কর্মাধ্যক্ষ স্বামী সারদানন্দ, তাঁর সঙ্গে কালভের ঈষৎ পূর্বপরিচয় ছিল। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতরাণীকে ভারতীয় সঙ্গীত শোনাবেন বলে সারদানন্দ পূর্বাহ্ণে 'সুপ্রসিদ্ধ বংশীবাদক' হাবু দত্তকে সদলে মঠে আনিয়েছিলেন।

"মাদাম সর্বাগ্রে স্বামীজীর সমাধিস্থান দেখতে চাইলেন। স্বামী সারদানন্দ স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বললেন—'এই স্থান।' মাদাম কালভে অতি শ্রদ্ধাভরে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন [মন্দির তখন নির্মীয়মাণ]। অপর সাহেব মেমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করে পাঁচ মিনিট পরে বাইরে এলেন, কিন্তু মাদাম ভিতরে রইলেন। আমরা বাইরে থেকে দেখতে পেলাম, মাদাম স্বামীজীর প্রস্তরমূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে রয়েছেন। সকলেই নীরব।…দেখতে-দেখতে পনর মিনিট চলে গেল, মাদাম সেইভাবে নতজানু হয়ে রয়েছেন—চোখে মুখে গণ্ডে পবিত্র অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছে।…পরে মাদাম ধীরে-ধীরে সে মন্দির থেকে বাইরে এলেন। স্বামী সারদানন্দ-মহারাজকে অগ্রণী করে মাদাম ফরাসি মহিলা ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরঘরে গেলেন।…সেখানে মাদাম কালভে যখন নতজানু হলেন তখন তাঁর সে গাম্ভীর্য নেই, তখন তিনি হাস্যময়ী আনন্দোৎফুল্লা। স্বামী সারদানন্দজীকে বললেন, 'স্বামীজী একটি বৈদিক প্রার্থনা বলতেন, তার মানে, অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকময় পথে নিয়ে চলো—যদি সেটি জানেন তবে সেই প্রার্থনা এখানে বলুন। আমার অত্যন্ত শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।' স্বামী সারদানন্দ তাঁর সুমধুর গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সকলেই মুহূর্তে যেন স্বতঃই ধ্যানস্থ হলেন। পরে পূজনীয় সারদানন্দ-স্বামী মাদাম কালভেকে সম্বোধন করে বললেন, 'মাদাম! ঠাকুরকে আপনি এখানে গান শোনাবেন না?' মাদাম শ্রদ্ধানত হয়ে হাস্যমুখে স্বামী সারদানন্দজীর আদেশ গ্রহণ করলেন··কলকণ্ঠে ফরাসি সঙ্গীত গাইলেন। যদিও সে সঙ্গীতের অর্থ আমাদের অবোধ্য, কিন্তু কি মধুর স্বরলহরী, যেন হঠাৎ হাজার বুলবুল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,···যেন সেই স্বরলহরী মঠের স্নিগ্ধ-গম্ভীর বায়ুস্তরকে কম্পিত করে, আন্দোলিত করে, এক আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করলে। মাদাম পরপর দুটি গান গাইলেন।"

ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসার পরে সকলে সামনের প্রাঙ্গণে বসেছিলেন। মঠের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাবু দত্তের এস্‌রাজ ও ক্ল্যারিওনেট শুনে তিনি খুব তারিফ করেন। দেশী গৎ শুনে সেগুলি ইংরাজি নোটেশনে পাবার ইচ্ছা করেছিলেন, যাতে পরবর্তী লন্ডন মরশুমে তা গাইতে পারেন। হাবু দত্তকে তিনি 'গ্রেট আর্টিস্ট' আখ্যায় অভিহিত করেন। মঠেই স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখেন ও তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিদায়কালে কুমুদবন্ধু ও মহেন্দ্রনাথকে পরদিন তাঁর কনসার্টে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যান।

কালভের সেই সঙ্গীতের আসর কিন্তু হয়নি। মঠ থেকে ফেরার পথে ঠান্ডা লেগে তাঁর সর্দি হয় এবং অসুস্থতার জন্য অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। গ্রান্ড হোটেলে কুমুদবন্ধুরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন শয্যাশায়িত মাদাম কালভে বেরিয়ে এসে দেখা করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অনুরোধে এঁরা শয়নকক্ষে গিয়ে দেখা করেন।

"আমরা ধীরে-ধীরে মাদাম কালভের শয্যাগৃহে প্রবেশ করলাম। একটি পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে তিনি শায়িত ছিলেন। আমরা নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়ালাম। তিনি মহীনবাবুকে দেখে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজিতে বললেন, 'আপনি এসেছেন, বড় সুখী হলাম। মঠ থেকে ফিরে আসবার সময়ে ঠান্ডা লেগে বড় সর্দি হয়েছে। আজ বম্বে মেলে কলকাতা ত্যাগ করব।' এই বলে অর্ধশায়িতভাবে বালিশে হেলান দিয়ে উঠলেন। সেই সময়ে দেখতে পেলাম, স্বামীজীর ফটোগুলি, যা আমরা বিবেকানন্দ সমিতি থেকে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম, বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। পীড়িত অবস্থায় তিনি তাঁর নির্জন শয্যাকক্ষে ছবিগুলি বক্ষের উপর রেখে দিয়েছিলেন—তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।···মাদাম কালভে ধীরে-ধীরে সেই ছবিগুলি একে একে দেখে আবার তাঁর বক্ষের উপর রাখলেন, পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি আনন্দে কাল বেলুড় মঠে কাটালাম। বড় আনন্দ পেয়েছি

—কালকে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন ছিল, কখনো ভুলতে পারব না।' আমি বললাম, 'মাদাম, যদি কাল একটু আগে আসতেন তবে বোধহয় এই অসুখ হত না।' মাদাম বললেন, 'এই সর্দিতে আমি কিছু-মাত্র দুঃখিত হই নি। কাল মঠে যেন একটি সঙ্গীতের সুরের মতো, কবিতার কাব্যলোকের মতো কেটেছে। স্বামীজীর সমাধিস্থান দর্শন করেছি। মঠের স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের দর্শন করেছি । কি পবিত্র শান্তিময় স্থান।…স্বামীজীর কথা আর কি বলব—তাঁর ধ্যানে, তাঁর বাণীতে, মানুষ নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারে। জগতের পতিত দুর্বল পদদলিত দরিদ্র ব্যথিতদের জন্য কী অগাধ প্রেম। বর্তমানকালে তিনি খ্রীস্টের মতো মানবজাতির পরিত্রাতা।"

বেলুড় মঠ দর্শন কালভের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আত্ম-জীবনীতে দিনটির স্মরণ করে লিখেছেন :

"স্বামীজীর সংঘের সন্ন্যাসীরা আমাদের সহজ সহৃদয় আতিথ্য দান করেছিলেন। তৃণাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে স্নিগ্ধ বৃক্ষছায়ার নীচে টেবিল পাতা ছিল—সেখানে আমাদের তাঁরা ফুল উপহার দেন, ফলমূল খেতে দেন। সামনে প্রবাহিত ছিল বিশাল গঙ্গা। বাদ্যকরেরা বিচিত্র যন্ত্রে রহস্যময় সকরুণ সুর বাজিয়েছিলেন, হৃদয়-গভীরকে স্পর্শ করেছিল তা। স্বামীজীর স্মরণে জনৈক কবি আবৃত্তি করলেন স্বরচিত আর্ত কবিতা। অপরাহ্ণ অতিবাহিত হলো প্রসারিত ধ্যানশান্তির মধ্যে।

"এইসব প্রশান্ত সাধুদের সঙ্গে যে কয়েক দণ্ড কাটিয়েছিলাম, তারা আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে স্বতন্ত্র কাল-খণ্ড রূপে। এই মানুষগুলি পবিত্র, সুন্দর, সুদূর, যেন অন্য কোনো জগতের, কোনো শুভতর শ্রেয়তর জগতের।"

আমি শুধু মাতা…

স্বামী বিবেকানন্দ মাদাম কালভে সম্বন্ধে লিখেছেন :

"মাদ্মোয়াজেল কালভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা।… অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এসব একত্র সংযোগে কালভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে।"

স্বামীজী আরও বলেছেন :

"কালভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়, বিদ্যা যথেষ্ট; দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়।...শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, যার সঙ্গে দিবারাত্র যুদ্ধ করে কালভের এই বিজয়লাভ—সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।"

আমরা দেখেছি, কালভের সংগ্রাম শুধু বাইরের বিরোধিতার সঙ্গে নয়—নিজের সঙ্গেও। বাইরের দুর্বিপাকের সঙ্গে লড়াই করে তিনি জয়ী হয়েছেন, 'রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী', কিন্তু নিজের কাছে পরাজয় ঘটেছে বারবার। রাজা-বাদশার সম্মানও তাঁর হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করতে পারে নি। প্রেমে ব্যর্থ তিনি। চেয়েছিলেন, মঞ্চের অত্যুজ্জ্বল আলোক থেকে সরে গিয়ে যখন ঘরে পৌঁছবেন, সেখানে থাকবে স্নিগ্ধ দীপালোকিত শান্তির সংসার—না, তা পান নি। নিজের গ্রাম-দেশে শৈশবস্বপ্নের দুর্গপ্রাসাদটি কিনেছিলেন এই আশা নিয়ে—সঙ্গীত মরশুমের শেষে সেখানে ফিরে গিয়ে পাবেন আলোড়নের জীবনের অন্তে স্নেহের আশ্রয়। "আমার দেশকে আমার চাই, আমার ঘরকে। ...ঐ দুর্গভবনটি আমার জীবনের অংশ।" অবসর নিয়ে যখন সঙ্গীত-শিক্ষিকার জীবনকে গ্রহণ করেছেন, তখন ছাত্রীদের দ্বারা ভরে থাকত এই দুর্গপ্রাসাদ, কত আনন্দের সঙ্গে সেকথা বলেছেন, কিন্তু বলেন নি—তা সত্ত্বেও সে ভবন কতখানি শূন্য ছিল। ঐ প্রাসাদে ছিল না কালভের পুত্র বা কন্যা, যে একটি-দুটি মানুষ বিশাল ভবনকে ভরিয়ে রাখতে পারে।

কন্যা—কন্যাই ছিল কালভের সর্বস্ব। সন্তানহারা জননীর দুঃখের চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই। তাই যেখানেই সন্তানের কথা এসেছে—কালভে বেজেছেন গভীর সুরে।

আমি মাতা—হাহাকার করে বলেছে তাঁর অন্তরাত্মা। যখনই দেখেছেন, কোথাও মা কাঁদছে লুটিয়ে—সেখানে গেছেন ব্যথাভরা হৃদয় নিয়ে—যদি সহানুভূতিতে শোষণ করে নেওয়া যায় শোকের কিছুটা।

তেমনি দু' একটি কাহিনী—

ইংলন্ডের উইন্ডসর ক্যাসলে ফ্রান্সের একদা-সম্রাজ্ঞী ইউজেনীকে মাদাম কালভে দেখেছিলেন। আর তখনি ইতিহাস কানাকানি করে উঠেছিল।

বৃদ্ধা বিধবস্তা এই নারী—একদিন সমস্ত ইউরোপের মুগ্ধ দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত ছিলেন। বেশ কিছু বছর ধরে এঁর স্বামী এবং ইনি ইউরোপের রাজ্যগুলির ভাগ্য নিয়ে খেলা করেছিলেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভাইপো লুই নেপোলিয়ান—'নেপোলিয়ান' নামক বিরাট নাম এবং সংশিলষ্ট বিরাট আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে অনিশ্চিত পদে ইউরোপের ইতিহাসের উপর এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের প্রয়াসে গোড়ায় কয়েকবার ব্যর্থ হলেও পরে গরিষ্ঠসংখ্যক ফরাসি কৃষক-প্রজার

নেপোলিয়ান নামের প্রতি মোহময় সমর্থনের শক্তিতে দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হলেন—পরে রিপাবলিককে চূর্ণ করে সম্রাট হয়েছিলেন ফ্রান্সের—১৮৫২ সালের ২রা ডিসেম্বর—সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অসামান্য এক নারীকে পত্নী নির্বাচিত করেছিলেন। স্পেনের অভিজাত বংশের কন্যা হলেও রাজকুলসম্ভূতা তিনি নন, তথাপি তাঁকেই বিয়ে করেন মন্ত্রিমণ্ডলীর আপত্তি সত্ত্বেও। সম্রাজ্ঞী ইউজেনীর এমনই অপরূপ সৌন্দর্য, আচরণের শালীনতা, মধুর আকর্ষণী শক্তি যে, মুহূর্তে লুঠ করে নিয়েছিলেন ফ্রান্সের হৃদয়, প্রজা-সাধারণ লাখ-লাখ ফ্রাঁ এনে হাজির করল তাঁর রত্নালঙ্কারের জন্য—সে টাকা তিনি দান করে দিলেন শ্রমিক-কল্যাণে।

১৮৫৬ সালে এঁদের পুত্র জন্মাল। লক্ষ-লক্ষ ফরাসি তাদের ভাবী ভাগ্য-বিধাতার উদ্দেশ্যে জয়-জয় দিল, দেশের প্রান্তে-প্রান্তে কামান গর্জন করল। সবাই জানল—নেপোলিয়ান-বংশের রক্তধারা ধমনীতে নিয়ে জন্মেছে রাজপুত্র—প্রিন্স ইম্পিরিয়াল।

তারপর—

তৃতীয় নেপোলিয়নের রথ ছুটেছে, পাশে আছেন সুভগা সুভদ্রা সম্রাজ্ঞী—গৌরব থেকে গৌরবে উত্থিত তিনি। দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজ্যে মর্যাদার আসন তাঁর জন্য পাতা আছে, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে বলীয়ান তিনি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার-যুদ্ধের সফল নায়ক, ইউরোপের প্রধান পুরুষ। আর তাঁর অসামান্য গুণবতী রাণী রচনা করেছেন বিলাসবৈভবে এবং প্রদীপ্ত প্রতিভায় উজ্জ্বল তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজসভা। তৃতীয় নেপোলিয়ন এগিয়ে চলেছেন, থামছেন না, থামা সম্ভব নয়।

তারপর—

শিখর থেকে রথ গড়িয়ে নামছে এবার। পররাজ্যের দিকে তৃতীয় নেপোলিয়নের হাত ক্রমেই দীর্ঘতর। বহু রাজ্যে বিভক্ত ইতালির অখণ্ডতা-বিধানে গোড়ায় সাহায্য করলেও পরে সমর্থনের হাত গুটিয়ে নিলেন, কারণ ভয়—সংঘবদ্ধ ইতালি ফ্রান্সের সাম্রাজ্যস্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক হ'তে পারে। কিন্তু ইতালি তখন জেগেছে—মাৎসিনীর স্বপ্নে, গ্যারিবল্ডির বীর্যে, কাভুরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায়, এবং রাজা দ্বিতীয় ইমানুয়েলের দৃঢ় বিচক্ষণতায়। অভ্যুদয় হয়েছে প্রায় একসঙ্গে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাসিয়ার। তাকে সংযত রাখবার মতো অর্থ বা সামর্থ্য যথাসময়ে ফরাসি সম্রাট নিয়োগ করতে পারেন নি, যেহেতু মেক্সিকোয় প্রভাব বিস্তারের বৃথা পরিকল্পনায় শক্তিক্ষয় করেছেন। এখন ক্ষয়িত মর্যাদার পুনরুদ্ধার এবং ইউরোপের শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে প্রাসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর—

যুদ্ধ বাধল। একদিকে আত্মসন্তুষ্ট অপ্রস্তুত এবং অহঙ্কৃত ফ্রান্স, ভ্রান্ত

রাজনৈতিক বুদ্ধিতে চালিত, অন্যদিকে স্থির প্রতিজ্ঞায় উদ্যত, রণদুর্মদ প্রাসিয়া, রাজনীতিজ্ঞানে ক্ষুরধার।

ফল : ক্রমাগত পরাজয়। শেষে—সম্রাট বন্দী, সম্রাজ্ঞী পলাতক, সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত, সাম্রাজ্য 'ঝড়ের মুখে ভাঙা কুঁড়ের চাল।'

এই ইতিহাস।

অনেক বছর পরের কথা—

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীর সামনে দাঁড়ালেন কালভে। সে নারীর এখন কিছু নেই—রাজ্য নেই, স্বামী নেই, পুত্র নেই। আছে শুধু স্মৃতি—নিয়তির কালো কাপড়-জড়ানো একদা-গৌরবের মূর্তি। স্মৃতির প্রহরী আমি—।

সাম্রাজ্যহারা সম্রাজ্ঞীর জন্য অঞ্জলিতে উপহার নিয়ে কালভে নতজানু।

কী সে উপহার?—এক মুঠো মাটি।

রাজমাতাকে কালভে বললেন : "আমি গিয়েছিলাম তুইলারি প্রাসাদে। সেখানকার দ্রাক্ষাকুঞ্জের তলা থেকে এই ধূলি তুলে এনেছি। ওখানে আমাকে বলল, প্রিন্স ইম্পিরিয়াল শৈশবে এই মাটিতে খেলা করতেন, এতে আঁকা আছে তাঁর পদচিহ্ন। সে মাটি আপনার কাছে বরণীয় হবে মনে করে এক মুষ্টি তুলে এনেছি—এই।"

ধূলিমুষ্টি হাতে নিয়েই শিউরে উঠলেন রাজমাতা। একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বিবর্ণ রক্তশূন্য মুখ। প্রিয় পুত্রের স্মৃতিভরা ধূলি হাতে নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন অন্যের দৃষ্টির বাইরে।

মা কাঁদবেন একান্তে।

মাতা, কিন্তু রাজমাতা। প্রকাশ্যে কাঁদবেন কি করে?

সঙ্গীতজীবনের আদি পর্বে, নেপলসে থাকাকালে কালভেকে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, "তুমি যদি খাঁটি ইতালীয় কণ্ঠস্বর শুনতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে ফনডো থিয়েটারে চলো—সেখানে একজন ভালো টেনর গাইছেন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুর তাগিদে কালভে রাজি হন। কিন্তু গান শুরু হওয়া মাত্র চমকে কেঁপে ওঠেন : "কী অপূর্ব, কী অসাধারণ কণ্ঠস্বর। এত সুন্দর কিছু আমি কখনো শুনেছি কি-না সন্দেহ। এ যে মিরাকল্।"

সগর্বে বন্ধু বলেন, "হুম্। এমন গলা এখানে অঢেল—সমুদ্রের ধারে নুড়ির মতো—গুণে শেষ করতে পারবে না।"

"না না না—এ ছড়ানো নুড়ি নয়—এ একেবারে এক-নম্বর হীরে"—কালভে চেঁচিয়ে ওঠেন—"কে উনি?"

"কারুসো।"

এনরিকো কারুসো। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, "বিশ শতাব্দের সর্বাধিক বন্দিত ইতালীয় টেনর।"

কারুসোর কণ্ঠস্বরের কথা বলতে গিয়ে কালভে উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়েছেন,

"আ-হা ! সেই দৈবী, অনন্য, বন্দিত কণ্ঠস্বর। প্রকৃতির বিশাল শক্তি—অপরূপ শিল্পে নিয়ন্ত্রিত। সুগভীর, আন্দোলিত, উৎফুল্ল—যেন সূর্যকিরণ—বিকিরণ করে সপ্তবর্ণ।"

"কারুসোর হৃদয় তাঁর প্রতিভার মতোই বিরাট।" তার পরিচয় একটি ঘটনায় কালভে খুলে ধরেছেন।

লন্ডনের শহরতলী উইম্বলডনে এক অভিজাত মহিলার বাড়িতে গাইবার জন্য কালভে ও কারুসো যাচ্ছেন। কারুসোকে খুবই উদ্বিগ্ন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

কালভে : "কি ব্যাপার, এত নিস্তেজ বিষণ্ণ কেন ?"

কারুসো : "আমি বড় অসুখী কালভে। তোমার মতো—'গান যে করে সে মোহিত করে রাখে নিজের দুঃখকে'—একেবারে মিথ্যে। আমি তো সব সময়েই গান গাই। কই আমার দুঃখ তো যায় না, বরং বেড়ে যায়।"

"কিন্তু হে বন্ধু ! তুমি তো মোহিত করো দুঃখী মানুষকে। সেকথা ভেবে তোমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত।"

নির্ধারিত স্থানে সময়ের আগেই এঁরা পৌঁছে গেলেন। গৃহকর্ত্রীর বালক-পুত্র অসুস্থ, এঁরা জানতেন। সে পঙ্গু। থাকে বিরাট উদ্যানের একপ্রান্তে, বিশেষভাবে নির্মিত ঘরে। গৃহস্বামিনী বললেন, "সে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। আর দুঃখ করেছে—গান শুনতে পাবে না বলে।"

বেদনায় ভারী হয়ে এল মহিলার কণ্ঠস্বর : "এ পৃথিবীতে ও যদি কিছু ভালোবাসে, তা গান। এমন পঙ্গু হয়ে রইল যে, জীবনের প্রধান আনন্দ থেকে বাছা বঞ্চিত।" মহিলার চোখ জলে ভরে গেল।

কারুসো কালভের দিকে তাকালেন। কালভে তাঁর মনের ভাব বুঝে বললেন, "এখনো তো অতিথিরা আসেন নি। তার আগে ছেলেটিকে একটু গান শুনিয়ে আসা যাক না।"

মহিলার আনন্দের সীমা রইল না। দু'জনকে পুত্রের কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

যেতে-যেতে কারুসো কুণ্ঠিতভাবে কালভেকে বলেন, "কিছু মনে করো না, আমি জানি তুমি খুব ক্লান্ত। বেশি নয়, দু'একটা গান গেয়েই চলে আসব। আহা বেচারা, গান ভালবাসে, অথচ নড়বার সামর্থ্য নেই।"

কারুসো ও কালভে দুজনে সত্যই নিতান্ত ক্লান্ত। কারুসো সবচেয়ে জনপ্রিয় টেনর, অবিরাম গাইতে হচ্ছে। কালভে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে সদ্য ফিরেছেন লন্ডনে।

"এই তো শিল্পীর জীবন"—কালভে ভাবলেন। "আমাদের জন্য মধ্যপথে কোনো সরাইখানা নেই। নির্দিষ্ট ক্ষণে নিজেদের উজাড় করে দিতে হয়—যে-কোনো মূল্যে। ভালো থাকি বা মন্দ থাকি, সুখে থাকি বা দুঃখে থাকি, আশায় বা নৈরাশ্যে—আনন্দ বিতরণের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হয়। ব্যক্তিগত দুঃখে যখন বুক ফেটে যাচ্ছে তখনো সুখী করতে হয় শ্রোতাদের—তাদের উপরে বিছিয়ে দিতে হয় মধুস্বপ্নের জাল—এমন আনন্দের শিহরণ আনতে হয় যার দ্বারা তারা

ভুলে যেতে পারে ধূলি-পৃথিবীর জ্বালাকে, যেন বাস করতে পারে ক্ষণেকের জন্যও নন্দনলোকে।"

ছেলেটির বাসস্থানে পৌঁছে এঁরা দেখলেন—যন্ত্রণার শরশয্যায় শুয়ে আছে সে।

সে দৃশ্য দেখেই কারুসো জীর্ণবস্ত্রের মতো নিজের ক্লান্তি ও দুঃখকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—আর্ত বালকটির উপরে জীবনের তাপ বর্ষণ করতে লাগলেন গানে গানে। একের পর এক গান গেয়ে গেলেন—যা কিছু মনে এল—অবিরাম অনর্গল।

একটি গান শেষ হয় আর রুগ্ন ছেলেটি যেন বিহ্বল উল্লাসে বলে, "এনকোর! এনকোর! আবার আবার।"

তখন কালভে বীণা তুলে নিলেন কণ্ঠে। যত উন্মাদনা উল্লাস আনন্দ মধুরতার ফরাসি ও স্পেনীয় গান তাঁর মনে এল, গেয়ে গেলেন পরপর।

আবেগে ছেলেটির গলা ভেঙে গেছে। ধরা গলায় কেবলই বলছে—"এনকোর! এনকোর!"

কালভে তখন শুরু করলেন কার্মেন-নৃত্য। কত ক্লান্ত তিনি বুঝতে পেরে কারুসো সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কালভের শিখানৃত্যের সঙ্গে দুলতে লাগল কারুসোর স্বর্ণকণ্ঠ। আর কারুসো পা ঠুকে, চঞ্চল আঙুলের তুড়ি দিয়ে, কখনো ক্যাস্টানেটস্-এর (করতাল বিশেষ) বাদ্য তুলতে লাগলেন, কিংবা বাজিয়ে চললেন মুখে কাল্পনিক গিটার। তিনি একাই একশো হয়ে বিনা যন্ত্রে গোটা অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করলেন।

পঙ্গু ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা। নিজের শারীরিক কষ্ট ভুলে গিয়ে "বাহবা বাহবা, আরও, আরও" শব্দে তাগিদ দিতে লাগল।

গৃহস্বামিনী ছুটে এলেন উত্তেজিতভাবে। "আপনারা করছেন কি? অতিথিরা সবাই এসে গেছেন। ড্রইংরুম ভর্তি। তাঁরা এক ঘণ্টার উপর বসে আছেন। একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন—"

"ফুঃ!"—কারুসো উপেক্ষার হাসি হাসলেন—"একটু অপেক্ষা করলে ওঁদের কোনো ক্ষতি হবে না। চেয়ে দেখুন আপনার পুত্রের মুখের দিকে। আঃ কী সুখী ও! ওঁদের সব কয়জনের কাছে গান গাওয়ার যে-মূল্য, তার থেকে এই একজনের কাছে গাওয়ার মূল্য কি বেশি নয়?"

যুদ্ধ!

মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।

কালভে প্রথম মহাযুদ্ধের বহু রক্তঝরা দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। দেশপ্রেমিকা নারী হিসাবে তিনি যুদ্ধকালে নার্সের কাজ করেছেন, শিবিরে শিবিরে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

দেশপ্রেমের অভিমান কালভে অবশ্যই করতে পারেন। তাঁর শিরা-ধমনীতে রুথেনিয়ান উপজাতির অদম্য রক্ত, তাঁর কণ্ঠে মৃতকে প্রাণ দেবার সঞ্জীবনী শক্তি।

নিউইয়র্কে এক রাত্রে 'লা মার্সাই' গেয়ে এক লক্ষ ডলার যোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছেন পীড়িত ফরাসি সৈন্যদের সেবার জন্য।

সে রাত্রে দশ হাজার লোকের সামনে তিনি গেয়েছিলেন। এত বড় সমাবেশে কালভে আগে গান করেন নি, যেন ভয় পেয়েছিলেন। তারপর যেই ধরেছেন সুর, অমনি কোরাস-গায়কদের সঙ্গে সমগ্র জনতা কল্লোলিত হয়েছে এক সুরে, প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো সমষ্টি-কণ্ঠ আছড়ে পড়েছিল, আর কালভে সাইক্লোনে মথিত জাহাজের মতো আথাল-পাথাল করেছিলেন। তারপর বিখ্যাত ট্রাজেডিয়ান মাদাম র‍্যাচেলের মতো করে নতজানু হয়ে শেষের স্তবকগুলি গেয়েছিলেন, কণ্ঠস্বর বারবার ভেঙে পড়েছিল অশ্রুভারে—দেশপ্রেমের অনন্য প্রেরণায় আলোকিত জগতে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—ভাবোন্মত্ত শ্রোতারা তাঁকে কাঁধে করে ঘুরেছিল সমগ্র প্রেক্ষাগারে—সৈনিকের হেলমেট উল্টে তিনি দান সংগ্রহ করেছিলেন—

হ্যাঁ, কালভে দেশপ্রেমিকা—এ দাবি করতে পারেন।

যুদ্ধকালে কালভে একটি হাসপাতালে গান গাইতে গেছেন। এই হাসপাতালটিতে ফরাসিদের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধবন্দীদেরও রাখা হয়েছে। দুই ওয়ার্ডের মধ্যে দরজার ব্যবধান, তা বন্ধ রাখা হয়।

কালভে গান গাইলেন। আহতদের অসহ্য যন্ত্রণার উপর দিয়ে সেই গান প্রাণপ্রবাহের মতো বয়ে গেল।

মোহিত একটি ফরাসি তরুণ কালভেকে বলল, "তুমি অনুমতি দিলে মাঝের দরজাটি খুলে দেওয়া যায়।"

কালভে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন।

"ওধারে যে হতভাগ্যরা আছে, তারা কেন তোমার স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে?"

শুনেই ঘৃণায় রাগে ঝলসে ওঠেন কালভে। দেশপ্রেমিক ফরাসিনী তিনি, শত্রু জার্মানদের গান শোনাবেন?

"না, কদাপি না। আমি কখনো ওদের কাছে গান গাইতে পারব না। ওরা আমাকে নির্মম আঘাত করছে।"

"আমার থেকেও"—তরুণ সৈনিকটি তার স্বচ্ছ দুই চোখ মেলে ধরে বলল—"আমার থেকেও তোমাকে বেশি আঘাত করেছে?"

কালভে এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটিকে—তার ডান হাতখানি নেই।

যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। যারা যুদ্ধে যায়, তাদের অনেকে মরে, বেঁচে থাকে আরও বেশি। যারা বেঁচে থাকে, তাদের অনেকে কিন্তু পুরো মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে না—বিকলাঙ্গ হয়ে কতজন অবশিষ্ট দিনগুলিতে যুদ্ধের ক্রূর স্মৃতিকে বহন করে, কে তার খোঁজ রাখে!

এর মধ্যে অন্ধত্বই বড় অভিশাপ। কারাগারের বাইরে বৃহত্তর কারাগারে তাদের চিরবন্দিত্ব!

অন্ধদের একটি হাসপাতালে কালভে গান করতে গেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছেন—বিস্তৃত অঙ্গনের দিকে তাকালেন যেখানে অন্ধরা দল বেঁধে বসে আছে আর খেলবার চেষ্টা করছে। ছেলেগুলির শরীরে অদ্ভুত স্বাস্থ্য ও শক্তির ঐশ্বর্য, অথচ খেলার জিনিসগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে কাঁপা করুণ হাতে। যৌবনের মধ্যাহ্নদিনে এদের উপর নেমেছে কালো পর্দা। এরা পাবে না প্রেমময়ী পত্নী, আনন্দময় সন্তান। কেন এদের বিয়ে হবে না? এদের ভালো-বেসে বিয়ে করবে, এমন মেয়ে কি কেউ নেই?

হঠাৎ কালভের মনে পড়ে যায়, তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে কথাবার্তার কথা। বান্ধবী এক অনাথালয়ের কর্ত্রী—পরিত্যক্ত শিশুকন্যা এবং পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো বালিকাদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। বিয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ের চেষ্টা করাও হয়। বিয়ে হয়ও মাঝে-মাঝে।

কালভের বান্ধবী বলেছিলেন: "দুঃখের কথা হলো, যেসব মেয়ে কুৎসিত, তারা স্বামী পায় না, তাদের অন্য গুণ যতই থাক। তারা কত অসুখী কি বলব!"

বান্ধবীর কথাগুলি মনে পড়া-মাত্র কালভে হাসপাতালের কর্তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপরে ছুটলেন অনাথালয়ে বান্ধবীর কাছে। বান্ধবীকে নিজের পরিকল্পনার কথা বলতেই তিনি উৎসাহী হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েগুলিকে ডেকে পাঠালেন। একদল লাজুক মেয়ে এল, তাদের পোশাক একরকম, কিন্তু সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিতে তারা কত পৃথক। তাদের কাছে কালভে নিজের হৃদয় খুলে ধরলেন। শেষে বললেন:

"কন্যাগণ! তোমরা কল্পনায় দেখে নাও—গৌরবময় মধ্যদিনের আলোকে পূর্ণ বিরাট প্রাঙ্গণে বসে আছে দলে-দলে অপূর্ব যুবকেরা—তাদের চোখে কিন্তু মধ্যাহ্নের কোনো আলোকরেখা প্রবেশ করতে পারছে না। হতভাগ্যদের সব আছে, তবু কিছু নেই। এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে ওরা নিঃসঙ্গ। ওদের হাত ধরবে কে বলো?

"অথচ ওরাই হবে সেরা স্বামী। ওদের শারীরিক ক্ষতির কারণেই তা হবে ওরা। ওদের কাছে সঙ্গিনীদের বয়স কখনো বাড়বে না। সময় গেলে তোমাদের যৌবন শেষ হয়ে যাবে, রূপ যদি থাকে ঝরে যাবে, ক্রমে কুৎসিত জরাতুর বৃদ্ধা হয়ে উঠবে—কিন্তু ওদের কৃতজ্ঞ কল্পনায় তোমরা চিরদিনই যৌবনের অম্লান দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়ী থাকবে। বলো—তোমরা এগিয়ে আসবে না—ওদের ডেকে নেবে না?"

কালভের কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর করে কাঁপে। এক মহান প্রার্থনা-সঙ্গীতের মতো তা উৎসারিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না।

না, আসছে একজন, একটি মেয়ে নিতান্ত সাদাসিধে চেহারা, খারাপ বলাই ঠিক, কিন্তু দু' চোখে বুদ্ধির আলো। সে এগিয়ে এসে বলল—"আমি রাজি।"

কালভে তাকে নিয়ে তখনি বেরিয়ে পড়লেন।

অনাথালয়ের গেটের কাছে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। "মাদাম, একটি অনুরোধ। সঙ্গী বেছে নেবার স্বাধীনতা আমাকে দিতে হবে। সে আমাকে দেখতে না পাক—আমি তো সারাজীবন তাকে দেখব।"

মেয়েটিকে নিয়ে কালভে যখন হাসপাতালে পেঁৗছলেন, অন্ধ লোকগুলি তখনো চত্বরে বসে আছে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই উত্তেজিত মেয়েটি কালভের হাত টেনে বলে, "ঐ যে—ওকে চাই।"

দেবতার রূপ ছেলেটির, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, সোনালী চুল, সকলের মধ্যে সেরা—তাকেই বেছেছে মেয়েটি।

কালভে এগিয়ে গিয়ে যুবকের হাতের উপরে তুলে দিল মেয়েটির হাত: "এই তরুণী মেয়েটি এসেছে তোমারই জন্য। এ তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসবে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন তোমাদের।"

এক ঘণ্টা পরে তারা ফিরল। বোঝাপড়ায় আসতে দেরি হয় নি।

"অপূর্ব উনি"—মেয়েটি লাজুকভাবে বলল।

অন্ধ যুবকটির মুখে বিস্ময় ও আনন্দের হঠাৎ-পাওয়া আলো। সে কালভের হাত চেপে ধরে আবেগে: "ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাদাম। অপরূপা ও। কী চমৎকার কথা বলে। আর কী সুন্দর চেহারা।"

এক বছর পরে কালভে উক্ত দম্পতিকে দেখতে গেলেন। তারা ঘর বেঁধেছে। একটি ছোট খামার আছে তাদের, একটি সুন্দর কুটীর। পরিচ্ছন্ন জায়গাটিকে ঘিরে আছে সুখ আর শান্তি।

এক ধারে বেঞে বসে আছে অন্ধ যুবকটি দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। তার কোলে একটি নগ্ন শিশু, কী ফুটফুটে। স্ফূর্তিতে হাত-পা ছুঁড়ছে। অন্ধ পিতার সমস্ত শরীর থেকে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে। শিশুটির নরম চুলের মধ্যে নিবিড় সুখে তার আলতো আঙুলগুলি নড়ে বেড়াচ্ছে, মুখে দিব্য আলোক, সমস্ত স্থানটি তাতেই ভরে আছে। কাছে বসে শিশুর মা দোলনা বাঁধছে।

কালভেকে দেখেই সে ছুটে এল। কি আনন্দ! স্বয়ং মাদাম এসেছেন! কি করে যে অভ্যর্থনা জানাবে, ঠিক করতে পারছিল না।

খানিক পরে একান্তে দুজনের কথাবার্তা হতে লাগল—তৃপ্তির, খুশির কত কথা।

তবু কালভের মনে হলো, কোথায় যেন একটা ছায়া রয়েছে। কি যেন মেয়েটিকে কষ্ট দিচ্ছে। মেয়েটি পুরো সুখী নয়। কালভে তখনি তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন না। জানেন, মেয়েটি নিজেই তা বলবে।

শেষকালে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল।—"মাদাম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

কালভে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

"মাদাম, আমি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলতে থাকে, "কী লজ্জা! ওকে আমি বলেছি

আমি সুন্দরী, আমার চুল সোনালী, আমার চোখ নীল। অথচ আমি ডাইনির মতো বীভৎস, বিকট। এখন যদি সত্যকথা বলি, ওর ভালোবাসা থাকবে না। কি হবে তাহলে?"

মেয়েটি হাহাকার করে বলে, "অথচ ও আমার প্রাণ, জীবন, আমার দেবতা। কি করে ওকে প্রবঞ্চনা করে চলি বলুন—বলুন আমাকে—"

কালভে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন। কোমল হাত রাখলেন তার মাথায়।

"ভয় করো না। সত্য বলো। আর বলার সময়ে ওর কোলে তুলে দিও তোমার সন্তানকে।"

নিজের মুখোমুখি…

কে আমি?

সঙ্গীতজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কালভে ফিরে গেছেন নিজের দুর্গ-প্রাসাদ ক্যাব্রিয়ার-এ।

রাত্রি হয়েছে। শয়নের পূর্বে প্রার্থনায় নতজানু।

হে প্রভু, করুণা করো। এ জীবন তোমার। এ কণ্ঠস্বর তোমার। উৎসর্গ করি তোমাকে।

কালভের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কালভে ভাবেন—কি তুচ্ছ আর অগভীর ঐসব মানুষগুলি যারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ করে, আর বলে, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। না, আমরা তা নই—আমরা ধর্ম-বিশ্বাসী!

একজন ছাত্রী কালভেকে বলেছিল, "আপনি সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও শিল্পের অনেক কথাই বললেন। কিন্তু সেরা গায়িকা হতে হলে সর্বোপরি কী চাই?"

"ঈশ্বর-বিশ্বাস"—কালভের সুনিশ্চিত উত্তর।

"আমার দৃঢ় ধারণা, ধর্ম মানুষের জীবনে মূলগত ব্যাপার। অসীম তার গুরুত্ব। সাধারণ কণ্ঠস্বরকে যে-আগ্নেয় শক্তি অতীন্দ্রিয় সুরতরঙ্গ করে তোলে—তা আসে ঊর্ধ্বলোক থেকেই। সেই শক্তির আশীর্বাদ প্রার্থনা করো, যদি সাধারণ গায়কের নৈপুণ্যের উপরে উঠতে চাও।"

কনভেন্টের দিনগুলির কথা কালভের মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা, ঈশ্বরপুত্রের দিব্যজোতিতে যিনি দেখা দিয়েছিলেন।

আমি ঈশ্বরের সেবিকা। ধন্য আমি। কালভে ভাবেন।

প্রভাত হয়। কালভে বিছানা থেকে দ্রুত নামেন। যা হোক একটা পোশাক টেনে গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েন। এখুনি খামারে যেতে না পারলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। কত কাজ সেখানে। দশটা পর্যন্ত বাগানে ও খামারে কাটল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার গেলেন। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে ছড়িয়ে

আছে ক্ষেত ও বাগান। কী সুন্দর। ফুলে ফলে সবজীতে ভর্তি। বাল্যে পিসিমার বাগানের যেসব ফুল ভালোবাসতেন, তাদের এনে লাগিয়েছেন। রূপে গন্ধে আর স্মৃতিতে ভরপুর মন। তারপরেই চোখ যায় সবজী-বাগানের দিকে। কাকে নিয়ে বেশি গর্ব করবেন—সুন্দর ফুল না সতেজ সবজী? ওরা সবাই প্রকৃতির দান। ওরা একত্রে দেহ-মনের তৃপ্তি ও পুষ্টি আনে। কালভে ভাবতে থাকেন।

অপরাহ্ন শেষ। সূর্যাস্তকাল। গগনে ভুবনে রঙের মাতামাতি। নানা ছায়া নিয়ে বিছিয়ে আছে শান্ত উপত্যকা। রাখাল বালকেরা ফিরছে দূর চারণভূমি থেকে, সঙ্গে মেষপাল। পশুগুলির গলায় ঝোলানো ঘণ্টার মধুর শব্দ, পদশব্দ, ঘরের ফেরার ডাক, নীড়সন্ধানী পাখির পাখার ঝাপট, দিনান্ত কাকলি, ক্রমে নিকটে-আসা রাখালদের সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

সুরে সুর তুলে নেন কালভে। তাঁর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে বহু বর্ণাঙ্কিত আকাশে রঙিন পাখির মতো।

কালভে ভাবেন: এই তো আমি, খাঁটি আমি, মাটির মেয়ে। এই উদার আকাশ, সহজ জীবন, মূল প্রাণের স্পর্শ, এই প্রত্যাবর্তন—আদিতে অকৃত্রিমে—এই তো আমি।

কালভে ফিরে আসেন প্রাসাদে। ভিতরে আলো জ্বলেছে এতক্ষণে। সুন্দর সজ্জিত করিডর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একটি ঘরে পোঁছলেন বিশ্রামের জন্য। চোখ পড়ে গেল ঘরের প্রান্তে।

ওখানে ওরা কারা? সাজসজ্জা করে বসে আছে?

না, ওরা মানুষ নয়—পুতুল। কালভে পুতুল ভালোবাসেন। বহু যত্নে পুতুল তৈরি করেছেন নিজের বিভিন্ন ভূমিকার আকারে—কার্মেন, মার্গারিট, জুলিয়েট, ওফেলিয়া, লা নাভার‍্যাইজ, সাফো, সান্‌টুৎসা—! কী জীবন্ত ওরা!

হঠাৎ কালভে হেসে ওঠেন।

মাঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাটির মেয়ে ভাবছিলুম। ঐ যে রাখালের সুর গলায় তুলে নিয়েছিলুম—ওকি রাখালের গলা? রাখালেরা বুঝবে ঐ গান? ও গান পাগল করেছিল কাদের? তারা কি গ্রামের মানুষ?

দপ্‌ দপ্‌ করে পাদপ্রদীপের আলো জ্বলে উঠল। কালভে দেখছেন। দৃশ্য-পট বদলে গেছে। বিরাট শহরে জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগার। পৃথিবীর মহান নগরী-সমূহ—প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় বিস্ফারিত—স্থূল কার্যের মতোই সেখানে রয়েছে শিল্প সঙ্গীত সংস্কৃতির গরিমা। থিয়েটার, মঞ্চের ধূলি, গ্রিজ-পেন্টের গন্ধ, তীব্রোজ্জ্বল গ্যাসের চোখ-ধাঁধানো আলোক, অজস্র জিনিস-ছড়ানো ড্রেসিংরুম, ফুলের ঘন সুরভি, অর্কেস্ট্রা, উন্মুখ দর্শক, উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন—

"কে ঐ অপরিচিত নারী—চিত্রিত মঞ্চে নানা ভঙ্গিতে চলছে ফিরছে—নিজেকে ব্যক্ত করছে!" কালভে বিস্ময়ে ভাবেন, 'ও কে? ঐ সব বিচিত্র পোশাকে—

কখনো জিপসি-মেয়ে, কখনো সম্রাজ্ঞী, কখনো-বা ক্রীতদাসী ? ওরা কি আমি—আমি নয় ?"

ওরা নড়ছে, ডাকছে—সাড়া দেব না ?

"আমি কি আমার শিল্পকে, শিল্পীজীবনকে, ভালোবাসি না ? কে বলে ? তাকে আমি পূজা করি। তা চিরবন্দিত আমার কাছে। কি বলছ ?—আমাকে যদি জীবনসূচনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, অপেরা-জীবনকে আবার বরণ করব কি-না ? নিশ্চয় নিশ্চয় করব। মহান ঐ আহ্বান—সাড়া দেব না, তা কি হয় ? যখন সাফল্য ঘটে তখন আমি যে কোন্ আনন্দতরঙ্গে ডুবে যাই, তা কি করে বোঝাব তোমাদের ? সাফল্য—সার্থকতা—বিজয় ! কী প্রচণ্ড তার অনুভূতি—ভাষাতীত।"

অবসরের জীবনেও চ্যালেঞ্জ এলে কিভাবে ভিতরের ঝিমানো সাপ ফণা ধরে ওঠে, তার ঘটনা কালভের মনে পড়ে যায়।

একদিন এক বান্ধবী এসে কালভেকে বললেন, "এই সব অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের তোমার কাছে এনেছি। আমাদের কালে আমরা যেভাবে তোমাকে পেয়েছি—তার কিছু স্বাদ এদের দিতে পারবে ?"

ছেলেমেয়েগুলির বয়স কুড়িও নয়। তাজা তরুণ মুখ, চকচকে চোখ, জিজ্ঞাসায়, কৌতূহলে কাঁপছে। হঠাৎ কালভের মনে হলো, হায় বয়স হয়েছে আমার—আমি এদের থেকে কত দূরে ! এরা আমার নাম ছাড়া আর কিছু জানে না। আমার কণ্ঠস্বরের দ্বারা এদের মধ্যে কোনো স্মৃতি সাধ সুখ বেদনা জাগাই না। এদের কাছে আমি অপরিচিত নির্বাপিত বিবর্ণ একটি গ্রহ মাত্র।

আমি পারি—এখনো পারি। কালভে ছটফটিয়ে ওঠেন। ওদের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করব। ওদের পিতামাতারা বৃথাই আমার বন্দনা করে নি—দেখিয়ে দেব।

কালভে গান ধরলেন—কণ্ঠে ধরলেন প্রাণ। ওদের মোহিত হর্ষ আমার চাই-ই। ওদের জন্য নয়—আমার জন্য। না, নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি আমি নই—নই চলন্ত মমি।

কালভে গাইলেন—যেমন করে গাইতেন এই ছেলেমেয়েগুলির পিতামাতার কাছে। ওরা আনন্দে উছলে উঠল।

"আর কখনো এত মধুর ঠেকেনি হর্ষধ্বনি, এত উত্তপ্ত ঠেকেনি সমাদরবাক্য—যা এই তরুণ বন্ধুদের কাছ থেকে পেলাম। যেন ফিরে এল পুরনো দিনগুলি, যখন আমি কুড়ি বছরের তরুণী, প্রথম জয় করেছি আমার সামনের অচেনা দর্শকদের। সেই একই শিহরণ, একই উল্লাস—আজও। আমি প্রমাণ করেছি, আমি এখনো সেই একই কালভে।"

"জানি আমি···গৌরব অর্জন করা কঠিন। আবার এলেও তা স্বভাবে পলাতক। বিশেষত অভিনয় ও গানের জীবন যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা নির্মম সত্য। আমাদের সৃষ্টি বাতাসে মিশে যায় কোনো চিহ্ন না রেখে। এই কণ্ঠ থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা ফিরে যায় না সেখানে। অন্য শিল্পীদের

তুলনায় আমাদের জয় হঠাৎ ঘটে, কিন্তু তা হঠাৎ আলোর ঝলকানি, তুলনাগত-ভাবে অবস্তুক, অচিরস্থায়ী। অতীতের কণ্ঠস্বর কার মনে আছে? শুধু স্মৃতি থাকে, রীতি থাকে, শুধু থাকে নাম।"

তবু ঐ আমার জীবন।

মরণের আগে সূর্য চন্দ্র তারকাকে অঙ্গে ধরেছি তো—বুদ্‌বুদ্‌ গর্বে বলে।

বুদ্‌বুদ্‌ ফেটে যায়। এখন শুধু ছল্‌ছল্‌ জল—জলের কান্না। শূন্য ঘর ভরে যায় দীর্ঘশ্বাসে। কী নেই আমার! শুধু সে নেই। কোথায় গেল মেয়েটি আমার। পুড়ে মরল।

সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কালভেকে ঘিরে বসেছে। এই মহান শিল্পীর কাছে তারা ধ্রুববাণী শুনতে চায়। কালভে বললেন:

"তোমরা নবীনা। তোমরা অপেরায় প্রবেশ করতে উৎসুক। মনে রেখো, পাদপ্রদীপের চোখ-ধাঁধানো আলোর জীবনের দারুণ আকর্ষণ আছে সত্য, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি গৌরবময় ভাগ্য সম্ভবপর—দুই তিনজনের একটি ছোট্ট সভাকক্ষের পরিচর্যায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা—যারা তোমাকে সেই চিরমধুর নামে ডাকবে—মা!"

এতক্ষণে শেষ কথা বলা হয়েছে। কালভে তৃপ্তি বোধ করেন।

হয়েছে কি? শেষ কথা কি কেউ নিজের সম্বন্ধে বলতে পারে—পেরেছে?

নচেৎ কালভে কেন আতুর চোখে তাকিয়ে থাকেন সাজানো পুতুলগুলির দিকে? কেন তার মধ্যে তুলে নেন একটি বিশেষ পুতুল—পাগলিনী ওফেলিয়ার পুতুলটিকে?

ওফেলিয়ার পুতুল হাতে নিয়ে কাঁপতে থাকেন। প্রেম—প্রেমের অভিশাপ—উন্মত্ততা—মৃত্যু—।

একের পর এক স্মৃতি আসছে, আর ছিন্ন কণ্ঠ থেকে কাতরোক্তি উঠছে। কী জ্বালা এই দহনজ্বালা, গরলজ্বালা।

সরলা ওফেলিয়া, কোমলা মধুরা, ভালোবেসেছিল হ্যামলেটকে। দর্শন ও কল্পনার জগতের মানুষ হ্যামলেট—নিক্ষিপ্ত হলো বিষাক্ত পরিবেশে যেখানে ব্যভিচারিণী জননী স্বামী-হত্যার পরেই কণ্ঠলগ্ন হয় দেবরের। প্রতিহিংসা নেবার কর্তব্যে তাড়িত, অনিশ্চিত বিবেকের দংশনে উদ্‌ভ্রান্ত হ্যামলেট, হাত বাড়িয়েও যখন ধরবার হাত পায় নি, তখন স্বয়ংকৃত ও যথার্থ উন্মত্ততায় অধীর হয়ে আঘাত করেছিল অপরকে এবং নিজেকে। তার আঘাতের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল ওফেলিয়া। সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার পাগল কান্নার গান:

And will he not come again?
And will he not come again?
No, he is dead···
He never will come again.

সে কি আসবে না? সে কি আসবে না? মৃত—সে তো আসবে না, কভু আসবে না।

পাগলিনী ওফেলিয়া নিজেকে সাজিয়েছিল পত্রপুষ্পে। তার পরে নদীতে টলে পড়েছিল। জলপরীদের মতো ভেসেছিল খানিকক্ষণ। গান গেয়েছিল সেই অবসরে। তারপরে ডুবেছিল—অনন্ত শান্তিতে, মৃত্যুর শীতলতায়।

আমি ওফেলিয়া—হাঁ আমি ওফেলিয়া—

সতীদাহের জ্বলন্ত আত্মা বাতাসের ঝাপটে-ঝাপটে বলে যায়—আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি।

নিজ সমাধির উপরে তাঁর কোন্ মূর্তি থাকবে, তা কালভে পূর্বাহ্ণে স্থির করেছিলেন। সে মূর্তি তাঁর ওফেলিয়া-ভূমিকার। বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর দ্যনি পিউশ সে মূর্তি অপূর্ব দক্ষতায় নির্মাণ করেছেন।

পাগলিনী ওফেলিয়া—তাকেই কালভে তাঁর মরণোত্তর স্মারকরূপে পরবর্তী মানুষের কাছে রেখে যেতে চাইলেন।

ব্যর্থ প্রেমই যদি তাঁর মর্মান্তিক জীবনসত্য না হবে, তাহলে কেন ঐ ইচ্ছা তিনি করেছিলেন?

আমার শেষ—কিন্তু অশেষ বিবেকানন্দ…

ইংরাজিতে প্রকাশিত কালভের আত্মজীবনীর কাহিনী শেষ হয়েছে ১৯২০-এর গোড়ার দিকে। সফলতার সুখের জীবনের মধ্যে তিনি তখন আছেন। তারপরে আরও কুড়ি বছর তিনি বেঁচেছিলেন। সে জীবন বাহ্যত কিন্তু সুখের হয়নি, ক্রমবিলুপ্তির অন্ধকার তাঁকে ধীরে গ্রাস করেছিল। দীর্ঘ আয়ুর রশি তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছিল—পৃথিবীর প্রধান রাজপথ দিয়ে নয়, বিস্মৃতির পরিত্যক্ত বাঁকা-চোরা পথ ধরে। সঞ্চয়েও টান পড়েছিল। অজস্র উপার্জন করেছিলেন, বেহিসেবী খরচও তেমনি। শেষে এমন অবস্থা হলো—ক্যাব্রিয়ার-প্রাসাদকে বেচে না দিয়ে উপায় নেই। 'স্বপ্ন নিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' দুর্গভবনটি—যার প্রতিটি বিন্দুকে চুম্বন করেছে কামনার রক্ত অধর—তাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হলো তাঁকে। প্রাসাদ বিক্রির টাকা নিয়ে কালভে যখন তাঁর নতুন বাসস্থানের দিকে এগোলেন তখন হয়ত অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্থান হাতে আছে, কিন্তু ভিতরে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। প্রাসাদটি কেবল তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, দিয়েছিল আত্মবোধ—ঐ দুর্গ তিনি জয় করেছিলেন—তাঁর কীর্তিস্তম্ভ ওটি—ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হলো!

কী রইল জীবনে! শোক আর শূন্যতা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সতের জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হারিয়েছিলেন। বংশের শেষ সলতে একটি ভাইপো, এলি কালভে, তাকে বড় ভালোবাসতেন, মঞ্চে অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা সে অর্জন

করেছিল, কে জানে কালভে-বংশের রক্ত হয়ত ওকে অবলম্বন করে আবার শিল্প-সৃষ্টির পথে ধাবিত হবে—না, সেও মরে গেল কিছুদিনের মধ্যে, হৃদ্‌রোগে।

নিজের সন্তান—সেও নেই। আঃ—হা—! সেই নিশিদিনের জ্বালা, নিত্য মৃত্যু-সহচরী। মেয়েটি, আমার একমাত্র সন্তান, পুড়ে মরল আমারই অবহেলায়। সেই পাপেই তো আর কোনো সন্তান হলো না।

৫২ বছর বয়সে ইতালীয় সহ-গায়ক সিনর গাস্‌পারিকে বিয়ে করেছিলেন —যদি পুনশ্চ সন্তানলাভ করতে পারেন—হয়নি—ব্যর্থ সবকিছু।

সন্তান হবে আমার? কন্যাকে মেরেছি আমি। নিজের হাতে মারিনি—কিন্তু তাকে মেরেছিল আমারই অপরিমিত খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভ। তাকে একলা পরের ঘরে ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম আলোজ্বলা মঞ্চে হাততালি কুড়োতে। ফিরে গিয়ে আর তাকে পেলাম না। কী অভিমান নিয়ে সে চলে গেল!

কালভের চোখের সামনে নিজের অভিনয়ের একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে। গুনো-র ফাউস্ট-এর মার্গারিট-ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ। মার্গারিট নিজ শিশুকে হত্যার অপরাধে কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় প্রতীক্ষা করছে শেষ শাস্তির জন্য। সে প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে—ত্রাণ করো, এই পাপ থেকে উদ্ধার করো প্রভু, তুমি মঙ্গলময়! আমি তোমারই, ক্ষমা করো, করুণাময়!

God the just, to Thee I abandon myself.
God the good, I am Thine, forgive me.

পাপ? নিজেকে পাপী মনে করলেই পাপ। জাগো জাগো মহাপ্রাণ, অমৃতের সন্তান!

কালভে চমকে শিউরে ওঠেন। স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময় আকার যেন দেখতে পান। উত্তোলিত হস্তে অভয় বরমুদ্রা।

কালভে অবুঝের মতো মাথা নাড়েন। না, আমার অপরাধের সীমা নেই। জীবনে জমিয়েছি কত ভার। কত অন্যায়। কত অকৃতজ্ঞতা।

কালভে হঠাৎ খাড়া হয়ে স্বামীজীর অপার্থিব আকারের দিকে তাকান। থরথরিয়ে বলেন—স্বামীজী! তোমার সম্বন্ধেই কি সব কথা বলে যেতে পেরেছি, বলতে কি পেরেছি মুক্তকণ্ঠে সকলের কাছে—একদা মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছিলাম জীবনে—সে তোমারই করুণায়?

১৯৩০-এর শেষের দিকে মাদাম দ্রিনেত্তি ভার্দিয়ে-র সঙ্গে কালভের কথা হচ্ছিল প্যারিসে কালভের বাসকক্ষে বসে। শীঘ্রই ফরাসিতে কালভের আত্ম-কাহিনী বেরুবে। এর আগে ইংরাজিতে তাঁর আত্মকথা বেরিয়ে গেছে। তাতে স্বামীজীর বিষয়ে একটি পুরো অধ্যায়ে অনেককিছু লিখেছেন। সে বিবরণও কিন্তু কালভের এই অন্তরঙ্গ বান্ধবীর কাছে অপ্রচুর মনে হয়েছে। তিনি আশা করেন, ফরাসি আত্মকথায় কালভে আরও বিস্তারিতভাবে স্বামীজী-প্রসঙ্গে লিখবেন।

মাদাম ভার্দিয়ে বললেন, "কালভে, আশা করি এই বইয়ে তুমি স্বামীজীর

বিষয়ে বড়ো করে একটি অধ্যায় লিখেছ, বিশেষত চিকাগোয় যেভাবে তিনি তোমার জীবনরক্ষা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গটি খুলে বর্ণনা করেছ।"

কালভে উৎসাহের সঙ্গে আত্মজীবনীর কথা বলছিলেন, এখন হঠাৎ তাঁর আবেগের সুর কেটে গেল, অত্যন্ত অপ্রস্তুত আর লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পরে মৃদুস্বরে বললেন :

"দ্রিনেত্তি, কি বলব, স্বামীজীর সম্বন্ধে আমি যা লিখতে চাই তা লিখতে পারি না। জীবনশেষে পৌঁছেছি। আমি ক্যাথলিক। সম্প্রতি আমার গ্রাম অ্যাভেইরঁ-তে কয়েকবার গিয়ে পাদরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। সেখানে গির্জার সমাধিভূমিতে আমার পিতামাতার পাশে ঠাঁই পেতে চাই। শেষজীবনে ঐ আশাটুকু নিয়ে বসে আছি। চাষী-বাড়ির মেয়ে আমি। আমরা তো ঐ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকি—জন্মভূমিতে বাবা-মার পাশে সমাধিস্থ হব।"

কালভে ব্যথাতুর কণ্ঠে বলতে থাকেন :

"স্বামীজী সম্বন্ধে যা লিখতে চাই তা যদি লিখি, তাহলে, গাঁয়ের পাদরী বলেই দিয়েছে, ওখানে সমাধিস্থ হবার অধিকার হারাবো। আমাকে ধর্মচ্যুত করা হবে। না না, দ্রিনেত্তি, তা আমি সহ্য করতে পারব না।"

কালভের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—স্বামীজী! তোমার কাছে অপরাধী আমি—আমার স্বদেশবাসীর জন্য লিখিত আত্মজীবনীতে তোমার সম্বন্ধে সব কথা লিখতে পারি নি। বলতে পারি নি যে, তুমি আমার কাছে শিশু ভগবান। বলতে পারি নি—তুমি পরিত্রাতা। কেন পারি নি তা তুমি জানো। তুমি তো মনের কথা খোলা বইয়ের পৃষ্ঠার মতো পড়ে নিতে পারো। যদি লিখতে না পারি, তোমার কথা তো বলেছি জনে-জনে—যখনই সমভাবনার মানুষ পেয়েছি—

দিলীপকুমার রায় ফ্রান্সে গেছেন ১৯২৭ সালে। 'দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা নীস নগরীতে এক কার্বণ্টেসের' বাড়িতে মাদাম কালভের সঙ্গে দিলীপকুমারের পরিচয় হলো। সেইসময়ে কালভে 'পুণ্যশুভ্র অলোকসামান্য মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ' কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, খোলাখুলি বললেন। শেষে বললেন :

"তাঁর কথা ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত। আর মুগ্ধ হতাম তাঁর মাতৃ-সম্বোধনে—যদিও তখন আমার বয়স কম।···য়ুরোপে আমেরিকায় তিনি দিয়েছেন কত আর্তকে শান্তি, কত অন্ধকে দৃষ্টি। তাঁর কাছে শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।"

১৯৩২ সালে স্বামী বিজয়ানন্দ প্যারিসে গেছেন। সেখানে মিস ম্যাকলাউড তাঁর সঙ্গে আঁরি বের্গসঁ এবং মাদাম কালভের আলাপ করিয়ে দিলেন, বের্গসঁর বাসভবনে। দীর্ঘ সময় ধরে স্বামীজীর কথা তাঁরা আলোচনা করলেন। বের্গসঁ তখন নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে চলাফেরায় অসমর্থ। বারে বারে দুঃখ করে বললেন,

"স্বামীজী যখন প্যারিসে এসেছিলেন তখন আমি আমার দম্ভের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। রোলাঁ তাঁর উপর বই লিখেছেন। তিনি সাহিত্যিক—দর্শন ও অনুভূতি ঠিক তাঁর বিষয় নয়। যদি ভগবান আমাকে একটু সুস্থ রাখেন তাহলে আমি (মাদাম কালভের দিকে দৃষ্টিপাত করে) স্বামীজী যে ভগবানে অধিষ্ঠিত মহাপুরুষ ছিলেন, সেকথা শুনিয়ে দেব।"

এর পরে বের্গসঁর অনুরোধে মাদাম কালভে, তখন তাঁর বয়স ৭৪, তথাপি গেয়েছিলেন 'লা মার্সাই', অপূর্ব কণ্ঠে, যে-গান স্বামীজী অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

দার্শনিক বের্গসঁ রোলাঁর লেখায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরম আধাররূপী বিবেকানন্দের পরিচয় নেই বলে অতৃপ্তি বোধ করতে পারেন, কিন্তু মাদাম কালভে বিবেকানন্দকে যেটুকু জেনেছেন—শিল্পী যেভাবে জানতে চায়—প্রেরণা ও অগ্নিতে পূর্ণ চরিত্র—রোলাঁর লেখায় তাঁকে পেয়ে গিয়েছিলেন। রোলাঁর বই পড়ে সানন্দে স্বীকৃতি জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন: "বিবেকানন্দ আমার কাছে পরিত্রাতা।"

কালভের পত্রের উত্তরে রোলাঁ লিখলেন (৪ এপ্রিল ১৯৩০)—বিবেকানন্দের ত্রাণবাণী সারা বিশ্বের জন্যও বটে।

"মহান বিবেকানন্দকে সাক্ষাতে দেখার সৌভাগ্য যে-নয়নের হয়েছে—পরম ভক্তিতে যে-নয়নে ধরা আছে বিবেকানন্দের ছবি—আমার বই যে তাকে নিরাশ করেনি, একথা জেনে আনন্দের সীমা নেই।"

মানবপ্রেমিকের আর্ত কণ্ঠস্বর:

"প্রতীচীর দিগন্তে ঘনিয়েছে সর্বনাশের কালো ছায়া। আশা করতে চাই, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সুমহান ভাব ও বাণী পাশ্চাত্ত্যের রক্তাক্ত কঠিন সংকুচিত সত্তায় প্রবেশ করবে। গভীর সংকটের এই ক্ষণ। নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে গিয়েও পাশ্চাত্ত্য কোনো শিক্ষা নেয় নি। যদি আত্মসংবিত ফিরে পাবার কোনো চেষ্টা সে না করে তাহলে নামবে আঘাত।"

বিষাদের হাসি নিয়ে রোলাঁ বললেন, "আর তা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিপর্যয় হবে না।" পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ। রোলাঁ বিশ্বাস করতে চেয়েছেন, "সেক্ষেত্রে আত্মার অগ্নিশিখা খুঁজে নেবে বিচরণের অন্য ক্ষেত্র—প্রয়োজনে উপযুক্ত ভূমি সৃষ্টি করে নিতেও পারবে। আত্মার আলো নেভে না।"

কালভে স্বচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখেছেন—রোলাঁ দেখেন নি। তবু শুধু চর্মচক্ষে দেখাই কি একমাত্র দেখা? কালভের সঙ্গে সৌভাগ্য ভাগ করে নিতে চাইলেন রোলাঁ:

"এখন তো আমার মনে হচ্ছে—আমার এই দুই চোখও বিবেকানন্দকে দেখেছে। এই শেষের কয়েক বৎসর ধরে বিবেকানন্দ ও পরমহংসের সঙ্গে আমি এত নিবিড়ভাবে বাস করেছি যে, অনুভব করছি, আমি যেন গঙ্গার ধারে সেই

ছোট ঘরটিতে কাটিয়েছি দিনের পর দিন।”

স্বামীজী বিশ্বের ত্রাণপুরুষ! নিশ্চয়ই রোমা রোলাঁর চিঠি পড়ে কালভে ভাবলেন। সে যাই হোক, তিনি আ-মা-র পরিত্রাতা—এটাই বড় সত্য আমার কাছে।

পরিত্রাতা তুমি, রক্ষাকর্তা! ঘটনাগুলি কালভের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তার একটি—

স্বামীজীর দেহত্যাগের কুড়ি বছর পরের ব্যাপার। কালভের ক্যাব্রিয়ার-প্রাসাদে অনেক অতিথি এসেছেন। প্রাসাদটির স্থাপত্য বোঝাবার জন্য অতিথিদের নিয়ে কালভে ঘুরছেন। প্রাসাদের ঝুল-বারান্দাটি চমৎকার, কালভের গর্বের জিনিস। সেটি দেখাবার জন্য ছাতের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, প্রায় প্রান্তে পৌঁছেছেন, একটু পরেই পাহাড়ের সোজা খাদ—সহসা কালভে স্বামীজীর চাপা কণ্ঠস্বর শুনলেন—'সাবধান।' তারপর কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিল। কালভে বেঁচে গেলেন, কেননা তিনি যেখানে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন সেখানে প্রাচীর ফেটে হাঁ হয়ে আছে, সেই গর্তে পা পড়লেই খাদে আছড়ে পড়তে হতো।

কেবল শারীরিক মৃত্যু থেকে নয়, আত্মিক মৃত্যু থেকেও স্বামীজী কতবার তাঁকে রক্ষা করেছেন। সুখে বা শোকে যখনই প্রাণসত্য ভুলেছেন, তখনই আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। মার্সেই শহরের পথে সুখের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে কালভে হাঁটছেন—কে যেন এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে তাঁর দিকে—চলে গেল পাশ দিয়ে চাপা স্বরে এই কথা বলে—'ভুলো না, মন্ত্র ভুলো না।'

স্বামীজী কয়েকটি মন্ত্র দিয়েছিলেন তাঁকে। সেগুলি স্বামীজীর সুরেই তিনি তাঁর ছাত্রীদের শিখিয়েছিলেন। সেই মন্ত্র কালভের বুকের ভিতরে জ্বলত, আর শিখায়িত হতো কণ্ঠে। তিরিশের দশকের শেষের দিকে কালভে প্যারিসে তাঁর এক বান্ধবীর ঘরে বসে আছেন, মাদাম ভার্দিয়েও আছেন, তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর কথাই হচ্ছে, ভার্দিয়ে কালভেকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন।

> “তখন প্রায় ৬টা বাজে, অপরাহ্ণ শেষ, আগত সন্ধ্যা। কালভে বললেন, ঠিক আছে, গাইব—যেভাবে মন্ত্রটি গাইতাম সেইভাবেই গাইব।
>
> “কালভে এখন একেবারে শান্ত গভীর গম্ভীর। চোখ বুজলেন। তারপর গাইতে শুরু করলেন—ঐশ্বর্যময় পূর্ণ প্রগাঢ় পরম শক্তিশালী কণ্ঠে : ওম্! ওম্! হরি তৎ সৎ!
>
> “সমস্ত ঘরটি থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল, প্রচণ্ড স্পন্দনে শিহরিত হয়ে যেন ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হলো।
>
> “আর কালভে একেবারে মূর্তির মতো, সঘন শ্রদ্ধায় পূর্ণ, যে-পবিত্র কাজ করছেন তারই মহান ভাবে সমাচ্ছন্ন। অপূর্ব তা।”

কালভে আরও একটি মন্ত্র ডায়েরিতে বারবার লিখে রেখেছেন, যার কথা জানি আমরা—'অসতো মা সদ্‌গময়···'

Lead us from the unreal to the Real,
From darkness to light,
From death to immortality.

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

O Rudra, may your face which is gracious protect me for ever.

স্বামীজীর দেওয়া সুরে কালভের ছাত্রছাত্রীরা যখন ঐ মন্ত্রগুলি গাইত—ভারতের অরণ্যভূমে, নদীতটে, গুহা-গহ্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সেই সুপ্রাচীন বেদমন্ত্র যখন একালে অপরিচিত পরিবেশে অভাবিত কণ্ঠে উৎসারিত হতো—তখন কালভের মনে পড়ত স্বামীজীর কথাগুলি—

"জর্ডনের জল গঙ্গাতে মিলতেই পারে। তাদের উৎস তো একই।

"খ্রীস্টকে ভালোবাসো। তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। খ্রীস্টকে অনুসরণ করো।"

স্বামীজী আরও বলেছিলেন—"সাহস, সাহস চাই। সাহস ছাড়া জীবন নেই।"

সাহস কি আমার নেই? কালভে নিজেকে প্রশ্ন করেন। তাহলে জীবনের এতখানি পথ হাঁটলুম কি করে? ৭৬ বৎসর বয়সে রুটির জন্য আমার সাধের প্রাসাদ বেচে দিয়ে বেঁচে আছি কি করে? এখনো তো লড়ছি—লড়াই করেই চলেছি।

হঠাৎ অবুঝ অভিমানে কালভের মন ভরে যায়।—স্বামীজী! আমার এই ভগ্ন শ্রান্ত জীবনে আর তো তোমাকে পাচ্ছি না। আমার জন্য তুমি কিছু করছ না কেন? তোমার শক্তিতে বাঁচাও, আবার জাগাও আমাকে।

১৯৩৮। কালভের বয়স আশি। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছেন। কী এসে যায়। যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ চলব। আবার যাবো আমেরিকায়, সফর করব, দেখাবো—আমার জীর্ণ দেহের পোড়া অঙ্গারের মধ্যে ঢাকা আছে নির্ধূম অগ্নি। কালভে উৎফুল্ল—তাঁকে নিয়ে ফিল্ম তৈরী করা হবে আমেরিকায়—তার তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি সেখানে যাবেন। সেই কল্পনায় জরার আবর্জনা সরিয়ে চির তারুণ্য কালভের দেহকে ঘিরে নৃত্য করে। সবিস্ময়ে কালভের বান্ধবী সে দিকে তাকিয়ে থাকেন।

যাওয়া হল না।

যুদ্ধ বাধল। কামানের গোলায়, বোমার ধাক্কায়, ধুলো হয়ে উড়তে লাগল মানবসভ্যতা। ফরাসির চিরশত্রু জার্মানরা কালভের, মাতৃভূমি অধিকার করে নিল। রুথেনিয়ান উপজাতির চির স্বাধীন রক্তের কন্যা কালভে, দাসত্বের শিকল

গলায় ঝুলিয়ে পড়ে রইলেন। এখন তিনি কী করতে পারেন? অশীতি-উত্তীর্ণা মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধা—আর কি প্রেরণাকে কণ্ঠে নিয়ে ডাক দিতে পারবেন ফরাসি বীর্যকে, পুরনো দিনের মতো?—

ফ্রান্সের সন্তান! হাতিয়ার, তোলো হাতিয়ার!
বীর তুমি মহাবীর! তোলো হাতিয়ার।

মুক্তি চাই। এবার মুক্তি চাই এই জীর্ণ দেহের বন্ধন থেকে। কালভে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসেন। পুরনো খাতাটা টেনে নেন। ধীরে তার পাতা ওল্টাতে থাকেন। প্রতি পাতায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিঠি বা প্রশংসাপত্র আঠা দিয়ে জোড়া আছে। শেষে যেটি খুঁজছিলেন সেই পাতাটি পেয়ে যান, ঝুঁকে পড়েন, পড়তে-পড়তে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে যায়, দৃষ্টি সুদূর উদাস হয়ে হারিয়ে যায় কোথায়। কালভে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন কতক্ষণ।

কালভে স্বামীজীর চিঠি পড়ছিলেন। কালভের পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি ওটি লিখেছিলেন, ১৫মে, ১৯০২। তার পরে স্বামীজী দু'মাসও এই পৃথিবীতে থাকেন নি। কালভে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।—আমার পিতার মৃত্যুতে স্বামীজী সান্ত্বনা দিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন, কে জানে তিনি অধিকন্তু সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কি-না তাঁর নিজের আসন্ন বিদায়ের শোক মোছাতে! স্বামীজী তো নিজের মৃত্যুর কাল জানতেন! তাঁর মুখে তো তা শুনেছি। এ চিঠি তাঁর বিদায় বাণী।

স্বামীজী লিখেছিলেন:

গভীর দুঃখের সঙ্গে তোমার শোকের কথা শুনলাম।

এই সব আঘাত আমাদের সকলের উপরে আসবেই, জগতের তাই নিয়ম, তবু তারা কী অসহনীয় কঠিন!

জীবনের নানা সঙ্গ আর অনুষঙ্গ এই অবাস্তব জগতকে আমাদের কাছে বাস্তব করে তোলে। সঙ্গ ও অনুষঙ্গদের আয়ু যত দীর্ঘ হয় ততই মায়ার ছায়াকে অধিকতর বাস্তব মনে হয়। তারপর এমন দিন আসে যখন অনিত্য চলে যায় অনিত্যে। কিন্তু হায়, অসহ্য সেই বিচ্ছেদবেদনা।

তথাপি আত্মা, যা চিরন্তন, যা আমাতে বর্তমান, তা সর্বত্র-বিরাজিত। সেই ধন্য, যে এই পলাতক ছায়ার জগতে নিত্য সত্যকে দর্শন করতে পেরেছে।···

প্রভু তোমার উপর তাঁর সবসেরা আশীর্বাদগুলি বর্ষণ করুন, বিবেকানন্দের এই প্রার্থনা।

স্বামীজী বলেছিলেন, কালভের মনে পড়ে:

একে একে জন্মের দ্বার খুলে মানুষ এগিয়ে চলে চিরমৃত্যুর দিকে, যার নাম নির্বাণ—মুক্তি। সে মুক্তি কখন, কত জন্মে আসবে, কেউ বলতে পারে না।

মুক্তিবাসনা প্রচণ্ড হলে দ্রুত আসবে তা ; যদি না হয়, তাহলে বহু জন্মের প্রাকার পেরোতে হবে। কত দ্রুত চলতে চাও, সে তোমারই উপর নির্ভর করে। পথ ক্ষুরধারার ন্যায় নিশিত ও দুর্গম। সে পথে চলতে সাহস চাই।

স্বামীজী বলেছিলেন, কালভে মনে মনে আবার উচ্চারণ করেন :

'Go ahead with courage. For life is courage'.

সাহস কালভের আছে। তবু ভরসা যেন হয় না। তখন মনে পড়ে স্বামীজীর আর একটি কথা :

জ্ঞানের পথ দুর্গম মনে হলে ভক্তির পথ নিও। প্রার্থনা করো ঈশ্বর আর তাঁর পুত্রদের কাছে। প্রার্থনা ঐকান্তিক হলে দর্শন পাবে। যদি কোনো জ্যোতির তনয়ের দর্শন পাও, তোমার জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন তুমিই হয়ে যাবে আলোককন্যা।

কালভে ভাবেন, আমার জীবনে তো দুই ধারাই মিলেছে—জ্ঞানের শক্তি ও সাহস, এবং ভক্তির প্রার্থনা। আর···আমি তো পেয়েছি ঈশ্বরপুত্রের সাক্ষাৎ দর্শন।

কালভে ভাবেন—চলতে চলতে আমার মুক্তি।

১৯৪২, ৬ জানুয়ারি। দক্ষিণ ফ্রান্সের মিলাউ-এ কালভে আছেন। বয়স ৮৩। অন্তিম ক্ষণ ঘনিয়েছে। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছে—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। হাসপাতালে পৌঁছবার আগে পথেই শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

কালভে পথে পড়লেন। তবু চললেন।